মানুষ পাথর

সমরজিৎ কর

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষ এবং কর্মরত ভূতাত্ত্বিকদের উদ্দেশ্যে

॥ প্রসঙ্গ কথা ॥

'মানুষ পাথর' একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত। বলতে পারেন, তাৎক্ষণিক ভ্রমণের রোজনামচা।

কলকাতায় জনৈক ভূতাত্ত্বিক-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে আপনারা কাজ করছেন। ভূতাত্ত্বিক সম্পদ অনুসন্ধানের জন্যে আপনারা ঘুরে বেড়ান দেশের সর্বত্র। মরুভূমি থেকে শুরু করে পাহাড়-পর্বত, কোথায় নয়? বিচিত্র আপনাদের জীবন। বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আপনার কি মনে হয় না, সে সব কথা দেশের মানুষও জানুক?

তিনি বললেন, আমরাও তো তাই চাই। বেশ তো. আপনি নিজেই একবার ঘুরে আসুন না ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে? গেলে দেখবেন, আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড এবং মনিপুরের অজস্র নদী-নির্ঝর, পাহাড়-পর্বত অধ্যুষিত এলাকায় দুর্গমতা এবং বিপদ উপেক্ষা করে কিভাবে কাজ করছেন ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক বিভাগের কর্মীরা। অসুবিধে হবে না। শ্রী শম্ভু সেন এখন আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিভাগের ডাইরেকটার জেনারেল। শিলং-এ বসেন। তিনি আপনারও পরিচিত।

বললাম, ভালো কথা। যাবো।

'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষকে ব্যাপারটা বলতেই খুবই আগ্রহ দেখালেন তিনি। বললেন, ঘুরে এসো। তবে শুধু ভূ-তত্ত্ব নয়। সেখানকার মানুষ এবং প্রকৃতিকেও দেখে আসবে।

শ্রীশম্ভু সেনকে চিঠি লিখলাম। তড়িঘড়ি উত্তর এলো। সব প্রস্তুত। পনের দিনের সফর।

'দেশ' পত্রিকার তরফ থেকে ব্যবস্থা করে দিলেন সাগরদা।

অতঃপর যাত্রা।

অনিবার্য কারণে মনিপুরে যেতে পারি নি। তবে আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল এবং নাগাল্যান্ডের পাহাড়-পর্বত ঘুরে যা প্রত্যক্ষ করেছি, এক কথায় আমার কাছে তা রোমাঞ্চকর। দেখেছি, ভূতাত্ত্বিকরা সেখানে অনুসন্ধান চালান নিজেদের প্রাণ হাতে করে। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। দুর্গম এলাকায় সে যেন দুঃসহ জীবন। আরণ্যক শ্বাপদসঙ্কুল পরিবেশ। সেখানে বাস করে অজস্র আদিবাসী। যারা আধুনিক সভ্যতাকে ভয় পায়। সন্দেহ করে। যারা প্রকৃতির মতই সরল,

অনাড়ম্বর। পাথরের মত যাদের প্রত্যয়। বলতে পারেন, 'মানুষ পাথর' তারই 'স্কেচ্'।

'স্কেচ্' যখন, অস্পষ্টতাও কিছুটা থাকবে। হাতে সময় কম। তাই পলক দৃষ্টিতে দেখা। ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কখনও হেঁটে, কখনও জীপে ঘুরে বেড়িয়েছি। কখনও একটানা সারা রাত জীপে। ভূতাত্ত্বিকরা কথা বলেছেন। শুনেছি। শুনেছি সাধারণ মানুষেরও অজস্র কথা। লিখে নিয়েছি রোজনামচায়। স্মৃতি-লিখনের মত। যার মধ্যে কিছুটা অসংলগ্নতা থাকা অসম্ভব নয়। পথ-চলতি মানুষদের কত জন কত কথা বলে। তার সবটাই সত্য অথবা নির্ভরযোগ্য হয় না। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে সব মিলিয়েই তো মানুষের প্রত্যয়? সেটাই বা অস্বীকার করি কি করে? আত্মপ্রত্যয় থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠা। আমার মনে হয়েছে, সেই 'আত্মপ্রত্যয়' জোগানর ব্যাপারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষ অবহেলিত। হয়ত এর জন্যেই, যারা বাইরের মানুষ, তাদের তারা বিশ্বাস করে না। বর্তমান গ্রন্থে নানা ভাবে এই সত্যটিই আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

'মানুষ পাথর' ধারাবাহিকভাবে যখন 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, বহু পাঠক-পাঠিকা আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কিছু কিছু ত্রুটিও ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে ভূতাত্ত্বিক বন্ধু শ্রীসংকর্ষণ রায়কে ধন্যবাদ জানাই। উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফরের ব্যাপারে তিনি নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। ছবির ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বইটির বিষয়বস্তু পাঠক-পাঠিকার ভাল লাগলে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

এক

মানুষ মানুষের রক্তে স্নান করিয়ে সাপের পুজো করে। দেখবেন খাসিয়া পাহাড়ের সেই রিয়াংডে বাজার। যার আধ কিলোমিটার দূরে নগস্টেন। গভীর অরণ্যে চলতে গিয়ে যেখানে সভ্য মানুষ আজও পথ হারায়। এই নগস্টেনের নির্জন পাহাড়ে গেলে আজও দেখা যাবে তিনটি গুহা। না। গুহা না বলে বরং বলি তিনটি টানেল। কবে কে তাদের তৈরি করেছিল সেকথা কেউ বলতে পারে না। এদেরই একটির মধ্যে ঢুকে ১৯২৪ সালে আসামের স্টিল ব্রাদার্স কোম্পানির বেশ কয়েকজন কর্মী বেমালুম লোপাট হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কেউ তাদের হদিশ দিতে পারেনি। এ ঘটনার সাক্ষী স্বয়ং সেখানকার সিয়াম। খাসিয়াদের রাজা।

অথবা নাগাল্যাণ্ডের পুকপুর। হাজার দুই ফুট উঁচু পাহাড়ে গ্রাম। যেখান থেকে দক্ষিণে চাইলে চোখে পড়বে সারামাটি গিরিশৃঙ্গ। প্রায় হাজার তেরো ফুট উঁচু। যার ওপারে বর্মা। এ পারে ভারত। এই পুকপুরেই জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়া সন্ধান পেয়েছে মূল্যবান ধাতুর। ওঁদের ভাষায় যাদের বলা হয় আলট্রা বেসিক মিনারেলস। এই গ্রামে লবণ উপহার দিয়ে বন্ধুত্ব করতে হয় নাগাদের সঙ্গে। সেও যেন আর এক কাহিনী।

শিলং থেকে জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল শাখার ডেপুটি ডাইরেকটার জেনারেল শ্রীশম্ভু সেন চিঠি লিখেছিলেন :

এদিকে আসুন। দেখে যান আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল এবং নাগাল্যাণ্ড। কুমারী কন্যার মত অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। এখানকার বন্য সম্পদ, কঠিন পাথরের বুকে লুকিয়ে থাকা খনিজ সামগ্রী, বেগবতী নদীর সহস্র ধারা, যাদের মুখে বাঁধ বসিয়ে পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাতকে দিনের সূর্যে ভাসিয়ে দেয়া যায়।

"দেশ" সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ বললেন, ঘুরে এসো। আমরা অনেকেই চাঁদের খবর রাখি, কিন্তু প্রতিবেশীর খবর রাখি না।

অতএব।

১২ এপ্রিল। কলকাতা থেকেই সঙ্গী জুটে গেল। জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার স্টাফ ফটোগ্রাফার শ্রীঅজিত ব্যানার্জি। শম্ভুবাবু আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিলেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। কলকাতাতেই মিঃ ব্যানার্জি আপনাকে সব বাতলে দেবেন। গৌহাটি পৌঁছলেই দেখবেন, সমস্ত ব্যবস্থা পাকা।

দমদম বিমান বন্দরে কথাটা বলতেই অজিতবাবু বললেন, ঠিক। পাকা বলতে একেবারেই পাকা। তবে আপনার যা প্রোগ্রাম দেখছি, ধকল সামলাতে পারলেই হয়।

ভদ্রলোক যে রসিক ব্যক্তি, প্রথম পরিচয়েই বোঝা গেল। এবং সতর্কও। জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার বেশ কয়েকটি একসপিডিশনে তিনি ফটোগ্রাফার হিসেবে অংশ গ্রহণ করেছেন। হিমালয়ের দুর্গম হিমবাহ অঞ্চল থেকেও ঘুরে এসেছেন কিছু দিন আগে। ছবি তোলার ব্যাপারে প্রচণ্ড খুঁতখুঁতে।

বললেন, ফিলম্ সাজ-সরঞ্জাম সবই তো নিয়েছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব না পণ্ডশ্রম হয়।

কেন বলুন তো? আমার প্রশ্ন।

মানে মাসটা এপ্রিল কি-না। তাই ভাবছি। এ সময়ে আসাম, অরুণাচল, মেঘালয়ে বর্ষা নামে। আর ওদিকের বর্ষা মানেই সব ভণ্ডুল। ছবি তোলার দফা রফা। ঝির ঝির বৃষ্টি। বৃষ্টির যেন শেষ নেই। অজিতবাবুর উত্তর।

অজিতবাবুব কথা শুনে দমে গেলাম। সত্যিই যদি বর্ষার মুখে পড়ি ছবি তোলা তো দূবেব কথা, ঘরের বাইরে বেরোনোই তো শক্ত হবে। বিশেষ করে মেঘালয় এবং অরুণাচলে। বর্ষা মানেই ওই সব অঞ্চলে বন্যা। তখন পথে ঘাটে পায়ে চলাই শক্ত। গাড়ি তো কোন ছার।

ভাগ্য ভাল। দমদম থেকে যখন প্লেন ছাড়ল, ঘড়িতে তখন সকাল দশটা বেজে দশ। বোয়িং ৭৩৭। নন স্টপ ফ্লাইট। দমদম থেকে গৌহাটি। চৈত্রের শেষ। নববর্ষের তখন আর মাত্র দুদিন বাকি। এ সময়ে সারা আসাম আনন্দে মেতে ওঠে। তখন উৎসব। বিহু উৎসব। পশ্চিমবঙ্গে যেমন দুর্গোৎসব। আসামের প্রতিটি মানুষের কাছে বিহুও ঠিক তেমনি। নতুন কাপড় পরা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা জানান, নাচ, গান। চলে কয়েকদিন। প্লেন যাত্রীতে ঠাসা।

মিনিট পঞ্চাশের ফ্লাইট। গৌহাটি গিয়ে যখন পৌছলাম ঘড়িতে তখন এগারোটা। বিমান বন্দরের লাউঞ্জে হাজির হতেই দেখা হল অমর মজুমদারের সঙ্গে। অমরবাবু জিওলজিস্ট। আগে থেকেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল।

এসেছিলেন ডঃ সুজিত মজুমদার, ডঃ সমরজিৎ চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজন।

অমরবাবু সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওঁরাও জিওলজিস্ট।

অমরবাবু বললেন, আমরা আজ ভোরেই শিলং থেকে রওনা হয়ে, আপনি আসার কিছুক্ষণ আগেই এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছি। আপনার প্রোগ্রামটি নিশ্চয় আপনি দেখে নিয়েছেন ?

বললাম, দেখেছি। শম্ভুবাবু আগেই আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

বড় প্রোগ্রাম। বেশির ভাগ জায়গার পথঘাটই খারাপ। জানি না, সামলাতে পারবেন কী না।

খানিকটা স্মার্টের মতই বললাম, দেখাই যাক না।

সুজিতবাবু বললেন, আমরাও চাই, আমাদের সঙ্গে আপনিও একটু কষ্ট করুন। কী নিদারুণ অবস্থার মধ্যে জিওলজিস্টদের কাজ করতে হয় তাহলে বুঝতে পারবেন।

শিলং সারকেল দেখানর দায়িত্ব সুজিতবাবুর ওপর।

রীতিমত মিলিটারি ব্যবস্থা। চারটে জীপ, একটি ট্রেইলর। ট্রেইলরে নেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত পেট্রল। নেওয়া হয়েছে বিছানা-পত্র, শুকনো খাবার, মায় জ্যান্ত মুর্গি পর্যন্ত।

জ্যান্ত মুর্গি কেন ? এবার আমি রীতিমত অবাক!

ব্যাপারটা বিশদ করলেন সুজিতবাবু। —পাথর সাহেবদের সঙ্গে শুধু ঘুরলেই তো চলবে না, পেটে কিছু দিতেও তো হবে ? আজকের মত রাতে যেখানে আস্তানা নেব, সেখানে কী জুটবে, সে তো আগে থেকে বলা যাচ্ছে না। এসব অভিজ্ঞতায় আমরা পাথর সাহেবরা কিন্তু ওস্তাদ। নো চান্স, মশাই। খাবার আর আস্তানাটা আমরা সঙ্গেই রাখি।

কানের ওপর দু-দুবার যেন হাতুড়ি পড়ল। পাথর সাহেব মানে ?

আমার প্রশ্নে হেসে উঠলেন সুজিতবাবু। —সে কি ? সাধারণ

লোকের কাছে আমাদের পরিচয় কী, জানেন না? পাথর সাহেব। মশায়, স্রেফ পাথর সাহেব। জিওলজিস্ট মানেই তো হাতুড়ি। আর হাতুড়ি মানেই পাথর। পাহাড় পর্বতে যাই। চোখ আমাদের শুধু পাথরের ওপর। তেমন কিছু পেলেই পাহাড়ের গায়ে আমরা হাতুড়ির ঘা বসাই। সংগ্রহ করি টুকরো। পাথর। একটুকরো পাথর আমাদের কাছে কোটি কোটি বছরের ইতিহাস। পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস। সেই ইতিহাসকেই আমরা খুঁজি। তারই সন্ধান করতে গিয়ে আমরা কোথাও পাই লোহা, কোথাও তামা অথবা চুনো পাথরের খনি। আশপাশের যারা দর্শক সেই গ্রাম্য মানুষ—এসব তারা বোঝে না। তারা শুধু দেখে আমরা হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভাঙ্গি। তারা এর ভেতর কোন মানেই খুঁজে পায় না। তাদের কাছে আমাদের পরিচয়—আমরা হাতুড়ি হাতে এক একজন পাথর সাহেব। শুনবেন শুনবেন। সব শুনবেন মশায়। অনেক কিছু চোখেও পড়ে যেতে পারে।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়-পর্বতের গঠন এবং ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস সংগ্রহ করে চলেছেন সুজিতবাবু। দীর্ঘদিন। পাথর তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আর ডাকে বলেই মাঝে কলকাতায় বদলী নিয়েও আবার তিনি ফিরে এসেছেন শিলং-এ। প্রাচীন বরফ যুগে এ অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক কায়দা-কানুনটি কেমন ছিল এই নিয়ে এখন তাঁর মাথা ব্যথা।

ব্যাপারটা সত্যিকারে কী ঘটছে বুঝে নিতে খানিকটা সময় লাগল। তারপর আবিষ্কার করলাম, কোন বিশ্রাম নয়, অলস তত্ত্ব আওড়ানোও নয়। গৌহাটিতে পা দেয়া মানেই প্রোগ্রাম শুরু। বলছিলাম মিলিটারি ব্যবস্থা। ঘটলও তাই।

প্রথম পরিচয়ের পাট চুকতে মিনিট দশেক গেল। বিমান বন্দর থেকে মালপত্র ছাড় করতে গেল আরও মিনিট পনের সময়। ঘড়িতে যখন বারোটা, আবিষ্কার করলাম একটি জীপের সিটে আমি বসে। আমার পাশে সুজিতবাবু। আমাদের জীপ সামনে এগোল। পেছনে আরও তিনটে জীপ।

কোনরকম ভূমিকা না করেই সুজিতবাবু বললেন, গৌহাটি বিমান বন্দর থেকে যাত্রা করে আমরা যাব পলাশবাড়ি। সেখানে আগে ব্রহ্মপুত্রের চরটা দেখুন। আসামের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র একাত্ম।

একাত্ম! হয়ত তাই। এ একাত্মের ভেতর অন্তরঙ্গতা হয়ত আছে। কিন্তু বিভীষিকাও কি নেই? ইদানীং পৃথিবী জুড়ে রব উঠেছে, গেল, গেল। সভ্যমানুষ কল-কারখানা তৈরি করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। বনজঙ্গল কেটে সাফ করে করে ঘটাচ্ছে ভূতাত্ত্বিক অবক্ষয়। কিন্তু এই ভাঙ্গার খেলায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের তুলনা করা চলে কি? কখনও কখনও প্রকৃতি নিজেই তার পরিবেশকে নির্মমভাবে ধ্বংস করে দেয়। এমনভাবে ধ্বংস করে মানুষ যা কল্পনাও করতে পারে না। ব্রহ্মপুত্র তার উদাহরণ।

ভারতের এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠন যেন একটি ত্রিকোণ ফলকের মত। তার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে ব্রহ্মপুত্র। তার দু-পাশে অসংখ্য শাখা নদী। উপনদী। এদের মধ্যে প্রধান উপনদী সিয়াং। সিয়াং মানস সরোবর থেকে বের হয়ে হিমালয়ের গহন অঞ্চল ধরে প্রায় এক হাজার মাইল এগিয়ে গেছে সোজা পুব দিকে। পূর্বাঞ্চলে এসে এরই নাম হয়েছে ডিহং। পূর্ববাহিনী নদী এই ডিহং অরুণাচলের কাছাকাছি এসে হঠাৎ মোড় নিয়েছে দক্ষিণ বরাবর।

তারপর অরুণাচলেরই পাসিঘাটে এর সঙ্গে মিলিত হল আর একটি নদী। লোহিত। ডিহং আর লোহিত মিলিত হয়ে তৈরি করল ব্রহ্মপুত্র।

১৯৫১ সাল থেকে ডিব্রুগড়ের কাছাকাছি হঠাৎই দেখা গেল ব্রহ্মপুত্র কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ডিব্রুগড় শহর এবং তার আশেপাশে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড অবক্ষয়। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পাড় বরাবর। ১৯৫০-এ এই অঞ্চলে যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয় সেই ভূমিকম্পই এর জন্যে দায়ী। ব্রহ্মপুত্রের তারপর থেকেই যেন এক নতুন চেহারা। তার আগ্রাসী থাবা উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ডিব্রুগড় শহরের দিকে বিস্তৃত হতে শুরু করে।

এল সেপটেমবর ১৯৫৪। ১৯৫০ এর সেই ব্যাপক বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর এবার ধ্বংসের উন্মত্ততায় মেতে উঠল ব্রহ্মপুত্র। এর কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড বর্ষা। ছোট বড় শত শত শাখা-প্রশাখা নদী ব্রহ্মপুত্রকে তুলল ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে। মুহুর্মুহু চলল পাড় ভাঙ্গার লীলা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তখন জহরলাল নেহরু। একদিন নিজের চোখে পরিস্থিতিটা দেখার জন্যে তিনি হেলিকপটার চড়ে ডিব্রুগড়ের আকাশে পরিক্রমা শুরু করলেন। আর তখনই। আকাশ থেকে তাঁর চোখের সামনেই ঘটল সেই ঘটনা। শহরের পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ অফিসকে নিয়ে শহরের এক অংশ সমাহিত হল নদী গর্ভে। পুরনো সেই শহর এখন ব্রহ্মপুত্রের কবলিত।

এরপর তৎপর হয়ে উঠলেন ভারত সরকার। যে করে হোক ব্রহ্মপুত্রকে রুখতেই হবে। এলেন বড় বড় ইনজিনিয়ার। এলেন হাইড্রোলজিস্ট এবং ভূতাত্ত্বিক। ১৯৫৫-৫৬ সালে ডিব্রুগড় শহরকে

বাঁচানোর জন্যে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণপাড় বরাবর তৈরি করা হল ছয় মাইল লম্বা বাঁধ।

বাঁধ তো হল। কিন্তু ভয় গেল না। এ-পাড় থেকে ও-পাড় পর্যন্ত নদী-স্রোতের মুখোমুখি বসান হল "লগ"। হাইড্রোলজিস্টরা ভাবলেন এইভাবে নদীর ধারাকে ভেঙ্গে তার প্রবাহকে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে দেবেন। কিন্তু এত করেও খুব যে একটা লাভ হয়েছে বলা চলে না। ১৯৫৬ সালের পর বাঁধটিকে আরও উঁচু করা হয়েছে। যতটা সম্ভব মজবুত করারও চেষ্টা হয়েছে। তবু, প্রতি বছর ব্রহ্মপুত্রে ঢল নামে। বাঁধের কাছে জল যেন উপচে পড়ার মত হয়ে দাঁড়ায়। তখন ধুক ধুক করে বুক কাঁপে ডিব্রুগড় শহরের প্রতিটি মানুষের। গেল। এই বুঝি আবার ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব কিছু। জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে, ডিব্রুগড়ের কাছে ব্রহ্মপুত্রের নিচের ভূস্তর ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠছে। প্রতি বছর বন্যার সময় সেখানে জমে উঠছে পলি এবং বালি। যা ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে আরও বড় রকম বন্যার সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে। খেয়ালি ব্রহ্মপুত্রের কোপে ১৯৫৩ থেকে ১৯৭৬-এর মধ্যেই ওকল্যাণ্ড চা-বাগিচার প্রায় ছয়শো থেকে সাতশো একর জমি পুরোপুরি নদীগর্ভে চলে গেছে। নাগাঘুলি এবং মাথুলা চা-বাগিচার ক্ষেত্রে এই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে আটশো থেকে নয়শো এবং ষোলোশো থেকে সতেরশো একর।

গৌহাটি গোয়ালপাড়া হাইওয়ে দিয়ে আমরা ছুটে চলেছি। পথের দুধারে গাছপালা। এক পাশে মাঠ। আর এক পাশে উঁচু নিচু জমি। ওদিকে ব্রহ্মপুত্র। প্রায় পনের কিলোমিটার এগোতেই সুজিতবাবু বললেন আমরা পলাশবাড়ি এসে গেছি।

এখন যেখানে হাইওয়ে সেটা নতুন জায়গা। এক সময় গোয়াল-

পাড়া যাওয়ার রাজপথ ছিল আরও দক্ষিণে, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণ দিকে মোড় নিতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে আগ্রাসী নদী এক সময়ে পুরনো সেই রাস্তাটি গ্রাস করেও নিল। ফলে, বাধ্য হয়ে রাস্তাটাকেও দূরে সরিয়ে আনতে হল। পলাশ-বাড়ির কাছ বরাবর নদী তার পাড় কাটার কাজ অব্যাহত রেখেছে। সামনে বাঁ পাশে পাহাড়ের সারি, নদীর মাঝ বরাবর দ্বীপের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে একটি পাহাড়। ও-পারে চড়া। নদীর খাড়া পাড়ের গা বরাবর স্তরে স্তরে সাজানো পুরু বালির স্তর। একটি স্তর লালচে। তার ওপর ধূসর মাটির সজ্জা। ভূতাত্ত্বিকরা এই লাল এবং ধূসর স্তর পরীক্ষা করে এই অঞ্চলের পাললিক গঠন সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। এই সব তথ্য শুধু ভূতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাই নয়, বাস্তব প্রয়োজনেও তাদের মূল্য খুবই গুরুত্বপুর্ণ। ব্রহ্মপুত্রের দু-পাশে রয়েছে ছোট বড় শহর এবং গ্রাম। কীভাবে তাদের বিপদের হাত থেকে মুক্ত রাখা যেতে পারে ভূতাত্ত্বিকদের এই অনুসন্ধান সে ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করবে। এছাড়া নতুন শহর এবং সেতুর স্থান নির্বাচনের সময় যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা অপরিহার্য।

গৌহাটি গোয়লাপাড়া হাইওয়ে ধরে বিজয়নগর, ছয়গ্রাম, কুকুরমারা হয়ে পৌঁছলাম বোকো। ঘড়িতে তখন প্রায় দুটো।

সুজিতবাবু বললেন, দুপুরের খাওয়া এখানেই সেরে নিতে হবে আমাদের। এর পর আর কোন খাবার জায়গা পাবেন না। আমার এক বন্ধু দ্বিজেন দাস। এখানকার জে এ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। এখানকার হোটেলে খাবার ব্যবস্থা করার জন্যে তাঁকে চিঠি লিখেছি।

নির্দিষ্ট হোটেলের সামনে যখন জীপ এসে থামল পেটের মধ্যে তখন নেকড়ের খিদে। অকারণে বলব না। কলকাতায় সকালের খাওয়া খেয়েছিলাম আটটা নাগাদ। প্লেনে এক কাপ চা এবং এক টুকরো বিস্কুট। পেটের আর কি দোষ বলুন।

দ্বিজেনবাবু হোটেলের সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন। প্রথম পরিচয়ের পাট চুকতে গেল মিনিট পাঁচেক সময়। তারপর বললেন, ভাত, মাছ প্রস্তুত। আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে বসে যেতে পারেন।

মুখে বললাম, ধন্যবাদ। আর মনে মনে বললাম, সে আর আপনাকে বলতে হবে না। আমরা প্রস্তুত হয়েই আছি।

এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়। কথা কম, কাজ বেশি। ছোটখাটো হোটেল। কাঠের খুঁটির ওপর টিনের চালা। ছোট বড় কয়েকটি ঘর। কাঠের চেয়ার আর টেবিল। সবই বিবর্ণ। হোটেলের মালিক বিহারী। এক সময়ে বাড়ি ছিল ভাগলপুর। কম বয়েসে আসামের এই অঞ্চলে ভাগ্য অন্বেষণে আসেন। তারপর হোটেলের ব্যবসা।

খুবই সাধারণ ব্যবস্থা। তবে প্রয়োজনের কোন কথাই হয়ত ভোলেন নি তিনি। হোটেলের পেছনে একটি উঠোন। সেখানে স্নান করার জায়গা আছে। দরকার হলে স্নান করুন। চাইলে গামছাও পেতে পারেন। তারপর আয়াস করে একটি টেবিলের সামনে বসে যান। ভাত, ডাল, একটি তরকারি এবং মাছ। এই হল মধ্যাহ্ন ভোজন। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। সঙ্গে এক টুকরো লেবু এবং লঙ্কাও পাবেন। খাবার পাতে লেবু এবং লঙ্কা। যা আসামের বৈশিষ্ট্য। ভিড় লেগেই আছে সব সময়। কারণ বোকো তো শুধু একটি শহর নয়, এ যে গঞ্জও। দেশ বিদেশের মানুষের এখানে আনাগোনা।

অদূরে জঙ্গল। সেই জঙ্গলের কাঠ এখান থেকে রপ্তানি হয়। এখান থেকে বাসে যাওয়া যায় শিলং, গৌহাটি, নওগাঁ। সেই বাস চলার পথে বোকোতে এসে বিশ্রাম নেয় তাদের যাত্রী। দু দণ্ড কথা বলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে, যাঁরা ব্যবসার জন্যে ঘুরে বেড়ান আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

পানের দোকানে যান। মিষ্টি হেসে তাম্বুল এগিয়ে দেবে পান বিক্রেতা। দাম পাঁচ পয়সা। আধখানা পান, একটু চুন, আধখানা সুপুরি।

দ্বিজেনবাবু বললেন, তাম্বুল খাওয়া অভ্যেস আছে তো? না থাকলে কিন্তু গা গুলোবে। ঠিক আছে খান। তবে চুনটা কম খাবেন। চুন কাঁচা সুপুরিব সঙ্গে রি-অ্যাকশন করে কি-না! শরীরটা গরম হয়ে যায়।

দারুণ ভাল লাগল। অদ্ভুত মানুষ এখানকার। আস্তে কথা বলে। যথেষ্ঠ কর্মঠ। আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ অনেকেরই মুখে।

দ্বিজেনবাবু বললেন, এখানে কোন বেকার নেই! কোথাও কাজ না পেলে বনে যান। কাঠ কাটার কাজ চলছে সেখানে। একটা কাজ সেখানে পাবেন।

জনৈক সেলস রিপ্রেজেনটেটিভের সঙ্গে কথা হল। ভদ্রলোক কোন একটি বিখ্যাত বিস্কুটের কোম্পানির হয়ে কাজ করছেন। তিনি বললেন, শুধু আসাম কেন, গোটা পূর্বাঞ্চলটাই ব্যবসায়ীদের স্বর্গ-রাজ্য। মুশকিল কি জানেন, বেশির ভাগ ব্যবসাই কিন্তু অন্য দেশের মানুষরা দখল করে রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, পাঞ্জাব, গুজরাটের মানুষই বেশি। সিন্ধিও কিছু আছে। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসী? সংখ্যায় নগণ্য। খাসিয়া, নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচলে যান—দেখবেন

সংখ্যায় তারা আরও নগণ্য।

বোকো থেকে মাইল তিনেক এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে পথ। ডান দিকে চলে গেল গোয়ালপাড়া হাইওয়ে। আর বাঁ দিকের রাস্তা মেঘালয়ের সীমানা বরাবর।

অদ্ভুত। সত্যিই অপূর্ব। দু-পাশে শালবন। শালবনের ভেতর দিয়ে কয়েক মাইল গেলেই হঠাৎ ভেসে উঠবে মেঘালয়ের পার্বত্য অঞ্চল। খাসি হিলস।

খাসি হিলসে ওঠার আগে আধ ঘণ্টার মত বিশ্রাম। জায়গাটার নাম হাহিম।

এবার মনে হল, আমরা যেন এক অপরিচিত জগতে এসে হাজির হয়েছি। অদূরে পর্বতশৃঙ্গ। অপরাহ্নের আলোয় কখনও ভুল হয় পাহাড়, না ঘন কালো মেঘ? আর হাহিম এক স্নিগ্ধ উপত্যকা-শহর। এখানে পুলিস স্টেশন আছে। আছে সেণ্ট্রাল পি ডব্লু ডি-র অফিস। পাহাড় কেটে পথ তৈরির কাজ চলছে। চাই, আরও পথ চাই। কারণ পথই তো সভ্যতায় স্রোতস্বিনী এনে দেয়। পথ মানেই তো চলা! আর যেখানেই চলা, সেখানেই তো জীবনের মুক্তি!

এই হাহিমেই পরিচয় হল ডাঃ মারাকের সঙ্গে। বয়েস ষাটের দশকের মাঝামাঝি। জাতিতে গারো। এক সময়ে ছিলেন সরকারী ডাক্তার। এখন অবসর নিয়ে হাহিমেই প্র্যাকটিস করছেন। এঁর এক ছেলে জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ায় জিওলজিস্টের কাজ করছেন। আছেন শিলং-এ।

পরিচয় হতেই ডাঃ মারাক বললেন আসুন না। আমার কুটিরে বসে একটু চা খেয়ে যান।

উদাত্ত আহ্বান। তবু ইতস্তত করেছিলাম একবার। এখনও

অনেকটা পথ যেতে হবে। সেই সোনা পাহাড়। পুরো পথই পার্বত্য, বন্ধুর। বেশি রাত হলে, বিশেষ করে পথে যদি বৃষ্টি নামে অসুবিধে হওয়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু বৃদ্ধ ডাঃ মারাকের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারি নি শেষ পর্যন্ত। আর পরে মনে হয়েছে, উপেক্ষা করলে ভুলই করতাম। জনৈক বন্ধু বলেছিলেন, খাসি হিলসের গহন অঞ্চলে যারা বাস করে, তারা এক একটি পাথর। মানুষ পাথর। কিন্তু ডাঃ মারাক খাসি হলেও তাঁর মধ্যে যা পেলাম, কই, তা তো পাথর নয়?

সোনা পাহাড়ের গল্প তাঁর মুখেই প্রথম শুনলাম। ডাঃ মারাক যখন ছিলেন বালক, ইংরেজ সাহেবরা এই পথ দিয়েই যেত সোনা পাহাড়ে। তাঁদের আনাগোনা তাঁর কাছে কেমন রহস্যজনক লাগত তখন।

দুই

ডাঃ মারাক। ছোটখাটো মানুষ। বিরল কেশ। পরনে ধূসর ট্রাউজার এবং শাদা বুস শার্ট। প্রথম দর্শনেই মনে হয়, এ মানুষ যেন একজন ইউলিসিস। টেনিসনের ভাষায় যিনি জীবনকে নিঙড়ে পান করে বসে আছেন। খাসি পরিবারের সন্তান। লেখাপড়া মিশনারিদের কাছে। পরে ডাক্তারি পড়ে চাকরি নেন। আর এই ডাক্তার হিসেবেই দীর্ঘজীবন তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে ভারতের পূর্ব-সীমান্তের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। ট্রাইবদের সংস্কার

এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংঘাতের সামনে পড়তে হয়েছে বহুবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়ী হয়েছেন।

ছোট বাংলো প্যাটার্নে বাড়ি। সামনে বিরাট্ একটি মাঠ। মাঠের পর রেলিং দিয়ে ঘেরা কোর্টইয়ার্ড। রেলিং বরাবর নানারকম গাছ। সবুজের স্নিগ্ধতা। সেই সঙ্গে বাহারে ফুলের প্রস্রবণ।

কোর্টইয়ার্ডের দরজার কাছে যেতেই এক দঙ্গল কুকুর এসে ঘেউ ঘেউ করে অভ্যর্থনা জানাল আমাদের।

ডাঃ মারাক তাদের মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন, স্টপ, স্টপ! ডোণ্ট ইউ সি দে আর অল মাই ফ্রেণ্ডস?

সারমেয়র দল এবার মাথা নিচু করে চুপ করে গেল।

প্লিজ ডু কাম। বললেন ডাঃ মারাক।

আমরা গিয়ে তাঁর বৈঠকখানায় বসলাম।

পরিচ্ছন্ন ঘর। দেয়ালে নানা রকম ছবি।

ডাঃ মারাকের পরিবারের লোক বলতে তাঁর স্ত্রী, পুত্রবধূ, নাতি এবং মেয়ে। মেয়ে শিলং-এ লেডিকিনি কলেজের স্নাতক-ছাত্রী।

সবাই এলেন ড্রইং রুমে। ঠাণ্ডা জল এল। এল ঘরে তৈরি কেক এবং কিছু খাবার। চা।

আমাদের প্রোগ্রাম শুনে ডাঃ মারাক বললেন, খুব ভাল কথা, আপনারা সোনা পাহাড়ে যাচ্ছেন। এক সময় তো ওসব জায়গা খুব দুর্গমই ছিল। 'জিওলজি'। এসব কথা তো এ অঞ্চলের কাছে খুবই নতুন। আশা করি অনেক কিছুই আপনারা আবিষ্কার করতে পেরেছেন, ডঃ মজুমদার?

সুজিতবাবু বললেন, কাজ চলছে। আসলে এ অঞ্চলে বড় রকমের প্রোগ্রাম নিয়ে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইনডিয়া কাজ শুরু

করেছে মাত্র কয়েক বছর আগে। তবে এরই মধ্যে যেসব খনিজ পদার্থের সন্ধান এ অঞ্চলে পাওয়া গেছে তাতে আমরা খুবই আশান্বিত হচ্ছি।

ভেরি গুড। ডাঃ মারাক বললেন, মাউসিনরুট জানেন তো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়—আমরা তখন অনেক ছোট। এসব জায়গা তো তখন গহন অরণ্য। বৃটিশরা ঘোড়ায় চড়ে, আমরা দেখতাম, ওই মাউসিনরুটের দিকে যাতায়াত করছে। শুনতাম সেখানকার পাহাড় অঞ্চলে বড় বড় কী নাকি পাথর পেয়েছে তারা। অল বোলডারস। পরে শুনেছি ওগুলি নাকি এক ধরনের দামী খনিজ পদার্থ। সিলিমেনাইট। ওই সব পাথরের চাঁই কেটে নিয়ে ঘোড়ায় চাপিয়ে কোথায় তারা নিয়ে যেত—এসব কেমন যেন রহস্যজনক বলেই মনে হত আমাদের কাছে।

শুধু কি তাই, স্মৃতি রোমন্থন করে চললেন। ডাঃ মারাক। স্থানীয় লোকেরা কিন্তু সন্দেহের চোখে দেখত বৃটিশদের। মনে পড়ে, আমরা তখন স্কুলে পড়ি। সম্ভবত ১৯২১ সাল। ইয়া ইয়া খচ্চরে চড়ে বৃটিশরা যাচ্ছে, আসছে। স্থানীয় লোকেরা হাঁ করে দেখে। আর গরজায়। অবশ্য মনে মনে। তাদের ধারণা, ওসব পাথর টাথর বাজে কথা। আসলে নিশ্চয় সোনার সন্ধান পেয়েছে তারা। ওই পাথরের মধ্যেই হয়ত সোনা আছে। সেই সোনাই পাচার করছে তারা। হাহিমের ওই নদীটা দেখছেন—কয়েক মিনিট এগিয়েই ওটা পার হতে হবে আপনাদের। নাম সিংগ্রা নদী। খচ্চরে চড়ে ওই নদী পার হত তারা। তারপর সামনের ওই যে রাস্তাটা দেখছেন—যে পথ ধরে এদিকে এলেন আপনারা—তখন তো ওটা কাঁচা রাস্তা। ওই রাস্তা ধরে তারা পাথর বোঝাই খচ্চর নিয়ে আবার ফিরে যেত। তার থেকেই তো—

মাউসিনরুটের ওই অঞ্চলের নামই হয়ে গেল সোনা পাহাড়। মানে যেখান থেকে পাথর নিয়ে আসত সাহেবরা, আমি সেখানকার কথাই বলছি।

উত্তর আসামের ভূমিকম্পের কথা উঠল। তিনি বললেন, আর বলবেন না। কী সাংঘাতিক ব্যাপার। ১৯৫০ সালের ভূমিকম্প তো? কী দারুণ শব্দ। বেশ কয়েকবার ভূমিকম্পে আমাদের বাড়ি ভেঙেছে।

চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর হাহিমেই পাকাপাকিভাবে বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডাঃ মারাক। —ইউ সি শিলং ইজ অলরাইট। বাট ইট ইজ ভেরি ক্রাউডেড নাও। আই লাইক হাহিম। ইউ ফাইনড পিস হিয়ার। আই গট এ স্মল ফ্যামিলি। মাই স্মল প্র্যাকটিস হেয়ার ইজ এনাফ ফর মাই ফ্যামিলি। বলেই আত্মভোলার হাসি হাসলেন ডাঃ মারাক। পরিতৃপ্তির হাসি। হাহিমের শান্ত পরিবেশেই হয়ত সেটা সম্ভব।

ঘণ্টাখানেক আমরা ডাঃ মারাকের পরিবারে কাটিয়ে যাত্রা শুরু করলাম সোনা পাহাড়ের দিকে। বাঁ পাশে পড়ে রইল হাহিম। ডান দিকে মোড় নিয়ে সোনা পাহাড়ের রাস্তা। মিনিট পাঁচেক এগোতেই পড়ল সিংগ্রা নদী। ছোট্ট পাহাড়ী নদী। বর্ষার সময় গভীরতা বাড়ে। সেই সঙ্গে স্রোতও। এখন বৃষ্টি নেই। নদীর জল হাঁটু পর্যন্ত। একটা সেতু আছে। তবে তার অবস্থা খুবই খারাপ। সরকারী আদেশে ওই সেতু দিয়ে গাড়ি যাওয়া বারণ। ফলে বাঁকা পথে সরাসরি নদীর মধ্যে দিয়ে ওপারে যেতে হল আমাদের। বিকেলের রোদ ম্লান হয়ে এসেছে। খাসি মেয়েরা নদীতে নেমে স্নান করছে, কাপড় কাচছে। কেউ বা খাবার জল নিচ্ছে। রঙীন পোশাক। সরল মুখ। মিষ্টি সৌন্দর্য।

নদীর ও-পাড়ে ছোট্ট একটি গ্রাম। বেশ সচ্ছল মনে হল। কিছু দোকানপাটও আছে। কলার দোকান। পান সিগারেট। শুনলাম খাঁটি মাখন পাওয়া যায় এখানে।

সিংগ্রা নদীর পর থেকে চড়াই। প্রথমে ছোট ছোট পাহাড়। লাল মাটির পুরু স্তরে ঢাকা। এসব অঞ্চল এক সময় সমুদ্রের নিচে ছিল। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অকসিজেন এবং মাটির সঙ্গে মিশে থাকা লোহার কণা জারিত হয়ে তৈরি হয়েছে আয়রন অকসাইড। এর জন্যেই ওই মাটির রঙ লাল। মাটির স্তরে ছোট ছোট নুড়ি পাথর। এই নুড়ি পাথর দেখে কোন কোন ভূতাত্ত্বিক মনে করেন, এক সময় এই অঞ্চলটি শেষ হিম-যুগের অধীনে ছিল। তখন এখানে বিরাজ করত পুরু বরফের স্তর। বা হিমবাহ। হিমবাহের চাপে কঠিন পাথর ভাঙতে থাকে। তারপর ঢাল বেয়ে হিমবাহ যতই অগ্রসর হয়, সেই পাথরের টুকরোও সেই সঙ্গে তার অনুগামী হয়। অবশেষে বরফের চাপ এবং নিচের কঠিন শিলার ঘর্ষণে ধীরে ধীরে তাদের আয়তন ছোট হতে থাকে। এবং এক সময় নুড়ি পাথরে পরিণত হয়।

বিচিত্র এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। নানারকম গাছ। সবুজে ছাওয়া। পথের দুপাশে ধানের জমি। আলু, লেবু, পান, কলা এবং আনারস এ অঞ্চলের কৃষিসম্পদ। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে জমি যেখানে উপত্যকা সৃষ্টি করেছে, উঁচু আল বেঁধে পাহাড়ী ঝরনা অথবা নালার মত প্রবাহিণীর জল আটকে চলছে চাষবাস। জীপের সার বাঁক নিচ্ছে মাঝে মাঝে। আমরা ক্রমে খাসি হিলসের ভেতরে ঢুকছি। দূরত্ব বাড়ছে। বাড়ছে উচ্চতা। পথের দুপাশে ঘন কলা বন। আর সেই সঙ্গে বাঁশঝাড়। যত উপরে উঠছি, কলাগাছ আর বাঁশের বনের ভিড়ও বাড়ছে। এ সম্পদ মানুষের তৈরি নয়। প্রকৃতির দান।

মুশকিল এই, কলাগাছ অজস্র। কিন্তু বেশির ভাগই বিচে কলা। বন্য জাতের। বাঁশও তল্লা বাঁশ। পেটাই করে ঘরের বেড়া তৈরি করা ছাড়া এসব বাঁশ দিয়ে আর কিছু হয় না। জানি না, দেশের পরিকল্পনা নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন এই কলা এবং বাঁশ নিয়ে কোন পরিকল্পনা করছেন কী না তাঁরা। দেশে কাগজের অভাব। এই বাঁশ তো অনায়াসেই কাগজ শিল্পে কাজে লাগান যায়। এই দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে বড় বড় কারখানা বসান এখনই হয়ত সম্ভব নয়। তার প্রথম বাধা উপযুক্ত পথঘাট। কাগজের কারখানায় দরকার প্রচুর জল। বছরে এদিকে বৃষ্টি হয় যথেষ্ট। তবে সে জলের সবটাই পাহাড় গড়িয়ে সমভূমিতে গিয়ে পড়ে। তাই অন্য সময় জলেরও প্রচণ্ড অভাব। এ সব অঞ্চলে কাগজ শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে সম্ভবতঃ এ দুটিই প্রচণ্ড রকমের বাধা। বাধা ঠিকই। তবে একটু চেষ্টা করলে জল সংরক্ষণের জন্যে বড় বড় আধার হয়ত গড়ে তোলা যায়। সেই জলে কাগজ তৈরির প্রয়োজন মেটান সম্ভব না হলেও, কাগজের মণ্ড তো তৈরি করা যায়? ছোট ছোট গ্রাম। চারদিকেই ছড়িয়ে আছে। ওই সব গ্রামের মানুষদের নিয়ে কুটির শিল্পের মত কাগজের মণ্ড তৈরির ব্যবস্থা করলে এদিকের মানুষ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট লাভবান হতে পারেন। সেই মণ্ড গৌহাটি, বোকো অথবা কুকুমারায় নিয়ে কাগজে তৈরির কাজে লাগান খুবই অসম্ভব কি?

বন্ধুর চড়াই পথে যত এগিয়ে যাচ্ছি, দু পাশের বাঁশের বন দেখে এসব কথাই মনে আনাগোনা করছিল।

প্রায় ঘণ্টা তিনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছলাম রিয়াংডো বাজার। নিজেরা ছাড়া এতক্ষণ তেমন কোন মানুষের সাক্ষাৎ পাইনি। জনবসতিও তেমন চোখে পড়েনি। রিয়াংডো পৌঁছনর সঙ্গে সঙ্গে মনে

হল হৃদয়ের শূন্যতা যেন বিপুল মানুষের কল্লোলে ভরে উঠল। জীপের হেডলাইট ছাড়া এতক্ষণ আশপাশটা ছিল ঘন অন্ধকারে ভরা। এবার বিদ্যুতের রোশনাই।

বলতে পারেন, এটা একটি খনি-নগরী। দুপাশে পাহাড়ের ঢালে ওপর বসতি। কাঠের ছোট ছোট ঘর। একটা খোলা জায়গায় তখনও বাজার চলছে। ডিজেল-ইঞ্জিন দিয়ে জেনারেটার চালিয়ে বিদ্যুতের আলোর ঝলমল করে রাখা হয়েছে চারদিক। পাশে সোনা পাহাড়। বসতির কিছু দূরে হিন্দুস্থান স্টিল লিমিটেডের অফিস 'এবং গেস্ট হাউস। এ অঞ্চলের চারদিকটাই খনি। সিলিমেনাইট এবং করাণ্ডামের খনন চলছে। চলছে দিন রাত, অবিরাম। তাই পথের ওপর মানুষের মুখ দেখা যায় সব সময়ই। বেশির ভাগ খাসি। বাঙ্গালী, অসমীয়া এবং উত্তর-ভারত থেকেই এসেছে অনেকে। এরাই এখানকার শ্রমিক। কেউ বাজার করছে। কেউ রাতের শিফটে খনিতে কাজ করতে চলেছে। আবার অনেকে ছোট ছোট চায়ের দোকানে বসে গল্প করছে।

হিমেল হাওয়ায় বেশ শীত শীত করছিল।

সুজিতবাবু বললেন, সোয়েটারটা পরে নিন, ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। এ জায়গাটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু।

সত্যিই শীত লাগছিল। হাহিম থেকে যখন রওনা হই, তখন প্রায় গলদঘর্ম অবস্থা। তারপর কখন যে শীতের রাজ্যে ঢুকে পড়েছি, খেয়ালই করিনি। সঙ্গে হাফ হাতা সোয়েটার ছিল, পরে নিলাম।

ইতিমধ্যে জীপ বাঁ দিকের রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করেছে। রাস্তা দেখে কান্না পেল। কাঁচা পথ। পাহাড়ের লাল মাটি বৃষ্টিতে গলে পড়ে পথের ওপর কাঁই হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। সেই কাঁই-এর

মধ্যে আবার মিশে রয়েছে ছোট বড় পাথরের টুকরো। এমন পথে জীপ এবং ভারী ট্রাক ছাড়া চলা শক্ত। মাঝে মাঝে সেণ্টাল পি ডবলু ডি-র বুলডজার পথ পরিষ্কার করছে।

আমাদের ড্রাইভার খাসি। গৌহাটি এয়ারপোর্ট থেকে সেই যে স্টিয়ারিং ধরেছে, তার আর ছাড়াছাড়ি নেই। ছোট্ট মানুষ। গায়ের রঙ তামাটে। বয়েস বছর পঞ্চাশ। নির্বাক পাথরের মত স্টিয়ারিং ধরে বসেই আছে।

একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম হয়ত। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে জীপ থেমে গেল।

সর্বনাশ। আর একটু হলেই তো আমরা প্রায় গর্তের মধ্যে পড়তাম।

রাস্তার সামনেটা কেটে রাখা হয়েছে। গভীর গর্ত। কালভার্ট তৈরি হবে। লিনডো, মানে আমাদের ড্রাইভার, সে একটু অন্যমনস্ক হলে ওই গর্তে পড়ে আমরা হাড়গোড় ভাঙতাম।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে লিনডো নেমে গেল। এ জায়গাটা অন্ধকার। তাই রাস্তার দু পাশটা ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না।

মিনিট দুই পর লিনডো ফিরে এসে আবার স্টিয়ারিং-এ হাত রাখল। মনে মনে গজরাচ্ছিল হয়ত। মুখে বলল, আদমি লোক সিগনাল নাহি দেতা হ্যায়। ডাইভারসন হ্যায়। বলেই ডান পাশে গাড়ি নিয়ে নেমে গেল সে। প্রায় খাড়া পথ ধরে। জীপের ইঞ্জিন থেকে তখন বুকফাটা শব্দ বেরোচ্ছে।

লিনডোর মত ড্রাইভার পাওয়া শক্ত। কিন্তু মুশকিল কি জানেন মিঃ কর, এতদিন চাকরি করেও সে কনটিনজেণ্ট হয়ে রইল। মন্তব্য করলেন সুজিতবাবু।

'কনটিনজেন্ট মানে' আমার প্রশ্ন।

মানে সাড়ে আট টাকা রোজ। এবং নো ওয়ার্ক, নো পে।

কিন্তু কেন?

সুজিতবাবু আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই জীপ বাঁ পাশে মোড় ঘুরে একটি অনুচ্চ টিলার কাছে এসে দাঁড়াল। পেছনে এসে দাঁড়াল আরও দুটি জীপ এবং ট্রেইলর। পেছনের জীপ থেকে নেমে এলেন অমরবাবু। অজিতবাবু তাঁর ক্যামেরার বাকস সামলাতে ব্যস্ত।

গাড়ি থেকে নামতেই চোখে পড়ল টিলার বড় একটি অংশ বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করছে। আর সেই আলোয় ঝক ঝক করছে একগাদা তাঁবু।

অমরবাবু বললেন, জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার ক্যাম্প। আসুন, জিওলজিস্টরা কীভাবে ক্যাম্পে তাঁদের জীবন কাটান দেখে যান।

রীতিমত শোরগোল পড়ে গেল।

ছোট্ট একটি ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এলেন একজন তরুণ জিওলজিস্ট।

অমরবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি এস কে ওয়াধাবন। সোনা পাহাড় ক্যাম্পের ইনচার্জ।

বছর আটাশ বয়েস। দিল্লির ছেলে। জিওলজিস্টের চাকরি নিয়ে এদিকে এসেছেন সম্প্রতি। খুব চটপটে।

বললাম, কোথায় দিল্লি, আর কোথায় সোনা পাহাড়। পাথরের মাঝখানে এই আদিম পরিবেশ লাগছে কেমন?

খারাপ আর কি? বললেন ওয়াধাবন। এ কাজে রোমাঞ্চ

আছে। তবে মাঝে মাঝে নিজেকে যে খুব নিঃসঙ্গ মনে হয় না, তা বলব না। বিশেষ করে যখন বর্ষা নামে, তখন। তখন তো বাইরে বেরোনই যায় না। ক্যাম্পের মধ্যে বসে বই পড়া, আড্ডা অথবা শুয়ে কাটান।

আরও কয়েকজন স্টাফ আছেন এখানে। তাদের নিয়েই ক্যাম্পের পরিবার-জীবন। প্রথম অভিজ্ঞতায় একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম, ক্যাম্পে কে অফিসার, কে অফিসার নয়, সে নিয়ে কারোর মাথা ব্যথা নেই।

সেটা স্বাভাবিক। বললেন সমরজিৎ চক্রবর্তী। গভীর অরণ্য, দুর্গম পাহাড় পর্বত অথবা শ্বাপদ সঙ্কুল পরিবেশে মানুষই তো' মানুষের একমাত্র বন্ধু। সেখানে কারোর না হলে কারোর চলে না। তাই ফিল্ডে গিয়ে কে জিওলজিস্ট কে অধস্তন কর্মচারী আমরা কখন যে ভুলে যাই, আমরাই জানি না।

সারাদিনের পথ চলায় আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম সবাই।

সুজিতবাবু বললেন, সিলিমেনাইট পরে হবে। এখন দরকার স্নান, বিশ্রাম এবং রাতের খাওয়া।

কথাটা কানে যেতেই, ওয়াধাবনের এক সহকারী বললেন, সব রেডি। আপনারা আসছেন, সে খবর তো আমরা আগেই পেয়েছি। মুরগি রেডি করে রেখেছি কয়েকটি। ভাল চালও আছে।

আমার তো চোখ চড়ক গাছে। বলে কি? এতক্ষণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে সব ভুলে ছিলাম। এবার খাবার কথা উঠতেই মনে হল পেটের সমস্ত নাড়ি বুঝি ক্ষিদেয় ছিঁড়ে যাবে।

সুজিতবাবু ওঁদের বলছিলেন, ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই ভাই। মুরগী এবং চাল আমিও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। ওসব হবে

এখন। আগে রাতের আস্তানার কথা বল।

ওয়াধাবন বললেন, না না, তাঁবুতে আপনাদের থাকতে হবে না। হিন্দুস্থান স্টিলের গেস্ট হাউসে থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আপনারা সেখানে গিয়ে বরং চান-টান সেরে আসুন। আমরা খাবার ব্যবস্থা দেখছি।

কখন অজিত ব্যানার্জি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পাই নি। হঠাৎই মনে হল। কানের কাছে ফিস ফিস শব্দ। —কর সাহেব, অবস্থা তো বেশ ঘোরালোই মনে হচ্ছে। মানে জ্যান্ত মুরগী এখন মারা হবে। তারপর হাঁড়িতে চাপাবে। মুরগীর পর ভাত। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা ? মানে রাত দশ এগারোটার আগে আমাদের পেটে আর কিছু পড়ছে না।

বেচারা। পেটরোগা মানুষ। তাই খাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানী। সেটা বোকোতেই লক্ষ করেছিলাম দুপুরের খাবার সময়। হোটেলের খাবার খেয়ে পাছে শরীর খারাপ হয়, কোন রকম পাতে হাত দিয়েই উঠে পড়েছিলেন তিনি। তারপর ডাঃ মারাকের বাড়িতে কিঞ্চিৎ জলযোগ। জীপে চড়ে চড়াই পথে আসতে গিয়ে সে সব কখন হাওয়া হয়ে গেছে। এখন মুখটি শুকিয়ে একেবারে আমসি।

শুধু তাঁরই নয়। ব্যাপার স্যাপার দেখে আমিও বেশ ঘাবড়ে গেছি।

সুজিতবাবুর কথাবার্তা শুনে বুঝলাম, তিনি চান না তাঁবুতে খাবার ব্যবস্থা হোক। ওয়াধাবনকে তো তিনি বলেই ফেললেন, এখন বরং থাক। আগে গেস্ট হাউসে যাই। দেখি সেখানে ওঁরা কী ব্যবস্থা করেছেন।

এই দ্বিধার কারণও ছিল, দুর্গম এই অঞ্চলে খাবার যোগাড় করা

একটা বড় রকমের সমস্যা, সেই বোকো থেকে তাঁদের খাবার-দাবার কিনে আনতে হয়। মুরগী, চাল, ডাল, ডিম—সমস্ত। আমরা সেই দুর্লভ খাবারে ভাগ বসাই সুজিতবাবু তা চান না।

অতএব গেস্ট হাউসেই তখনকার মত যাওয়া স্থির করলাম আমরা।

আবার চড়াই। এখান থেকে গেস্ট হাউস মিনিট দশেকের পথ।

সেখানে গিয়ে দেখলাম আমাদের দুশ্চিন্তাটাই অমূলক। গেস্ট হাউসের অফিসার ইন চার্জ মিঃ রাও জানালেন, এখানেই আপনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। চান সেরে নিন। ইতিমধ্যে চায়ের আয়োজন করে রাখছি।

এর পর কে আর দাঁড়ায়। যে যার ঘরে গিয়ে আগে চান। তারপর চা পর্ব সেরে কিছুক্ষণ গল্প।

গল্পের আসরে এলেন মিঃ রাও এবং তাঁর সতীর্থরা। এ জায়গাটার স্থানীয় নাম ওয়ানসোফি। মিঃ রাও বললেন, চারদিকেই তো পাথর। আপনারা মাঝে মধ্যে এলে আমরা তবু নতুন মুখ দেখি। কিছু নেই মশায়, কিছু নেই। স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে আর কী কথা বলব, বলুন, দিন-রাত পাথর কাটার কাজ চলছে। ব্যস। খুব সাবধানে চলতে হয় আমাদের। ট্রাইবদের মতিগতির সঙ্গে সাবধানে চলতে হয়। পান থেকে চুন খসলেই সিয়ামের কোপ এসে পড়বে।

আমরা সবাই ক্লান্ত। খাবার এল রাত দশটা নাগাদ। খাওয়ার পর ঘুম।

পরদিন ঘুম ভাঙল ভোর সাড়ে চারটেয়। ভোরের আলো এসে ঢুকেছে সরাসরি আমার ঘরের ভেতর। এখানে সূর্য ওঠে অনেক

ভোরে। জানালা খুলতেই সূর্যের মুখ দেখতে পেলাম। আর দেখতে পেলাম প্রকৃতির অকৃপণ সৌন্দর্য।

আর কারোর ঘুম ভাঙেনি তখনও। আমি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। গেস্ট হাউসের আশপাশে অফিস ঘর। একটি সমবায় বিপণি। ন্যায্য মূল্যের দোকান।

এরই মধ্যে পথে লোক চলাচল শুরু হয়েছে। তবে সবাই স্থানীয় অধিবাসী। খাসি। মেয়েরা সবজি মাথায় করে চলেছে রিয়াংডো বাজারে। কেউ কেউ ক্ষেত-খামার চাষ-বাসের কাজে বেরিয়ে পড়েছে। পুরুষরা কেউ যাচ্ছে ভোরের সিফটে কারখানায় বা খনিতে কাজ করতে। কেউ সেণ্ট্রাল পি ডব্লু ডি অথবা বন বিভাগের কাজে।

খাসিয়াদের মধ্যেও এসেছে পরিবর্তন। অনেক পরিবর্তন। ওদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। পরিবারে মেয়েরাই সর্বেসর্বা। আমরা বিয়ে করে কনেকে বধূ হিসেবে বরণ করে ঘরে তুলি। আমাদের পরিবারে পুরুষের প্রাধান্য বেশি। খাসিয়াদের উল্টো ব্যাপার। ও-দেশে মেয়েরা ছেলেকে বিয়ে করে তোলে নিজের বাড়িতে। সম্পত্তির মালিক মা। মা-র সম্পত্তি পায় তার বড় মেয়ে, ছেলে নয়। সংসারে যদি একাধিক মেয়ে থাকে, তাহলে বড় মেয়েই সেই সম্পত্তির একমাত্র মালিক। তবে হ্যাঁ, ছোট বোনদের দায়-দায়িত্ব তার। তাদের লালন করা, প্রয়োজনে তাদের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব— সবই বড় বোনের। স্বামীকে বিয়ের পর পছন্দ না হলে ইচ্ছেমত তারা তাকে ত্যাগ করে অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে করতে পারে। আমাদের যেমন পিতার পদবীতেই পুত্র-কন্যার পরিচয়। ওদের পুত্র-কন্যার পরিচয় ওদের মায়ের পদবীতে। মেয়েরা পরিশ্রম করে প্রচুর।

চাষবাস থেকে শুরু করে ঘর তৈরি হাট-বাজার সমস্ত। পুরুষদের জীবন অলস। ঘরে তৈরি মদ খেয়ে দিনরাত তারা বুঁদ হয়ে থাকে। প্রয়োজনে স্ত্রীকে সাহায্য করে।

চিরাচরিত এই প্রথায় কোন কোন অঞ্চলে এখন ফাটল ধরেছে। যেমন এই ওয়ানসফিতে। শিল্প সভ্যতার অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন পাথরের মত অনমনীয় সংস্কারে এখন চিড় ধরেছে। অলস জীবনের পরিবর্তে এখন তাদের পুরুষদের মধ্যে শুরু হয়েছে কর্মযজ্ঞ। ওদের অনেকেই এখন এ অঞ্চলে কারখানা অথবা খনির শ্রমিক।

হিন্দুস্থান স্টিলের গেস্ট হাউস থেকে পার্বত্য পথ ধরে প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল দূরে বসেছে জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার ড্রিলিং ক্যাম্প। সিলিমেনাইটের অস্তিত্ব জানার জন্যে এখানকার পাহাড়ে গভীর খনন চালান হচ্ছে। ড্রিলিং-এর জন্যে চাই জল। অথচ জলের এখানে একান্তই অভাব।

সকালের খাবার শেষ করে এই ড্রিলিং-এর কাজ দেখতেই গিয়েছিলাম আমরা। চড়াই-উৎরাই পথ। প্রায় মাইল পাঁচেক। মাঝে মাঝে খাসিদের গ্রাম। গ্রাম বলতে যে প্রচুর জনবসতি তা নয়। এক একটি পাহাড়ের মাথায় সাত আটটা পরিবার। কাঠের দেয়াল এবং কাঠের মেঝে। চাল তৈরি হয়েছে খড় দিয়ে। এই হল তাদের বাড়ি। বাড়ির নিচে পাহাড়ের ঢালে চাষের জমি। কোন কোন জায়গায় একটি পরিবার। একটি বাড়ি। তাই নিয়েই গ্রাম।

জনৈক অফিসার বললেন, কী বলব মশায়, বাইরে থেকে এদের মন বোঝা দায়। ইনডিয়ান পেনাল কোডটোড এখানে অচল। কত রকম বিপদ মাথায় করে যে এসব অঞ্চলে আমাদের কাজ করতে হয়, আপনারা ধারণাও করতে পারবেন না।

বিপদ মানে ? আমার প্রশ্ন।

বিপদ মানে বিপদ! এই ধরুন না, এই ওয়ানসফিতেই ঘটল। জনকয়েক মিলে আমরা ম্যাপিং করতে বেরিয়েছি। চলেছি ঝোপ-ঝাড় জংলা পথে। কী করে বুঝবেন মশায়, কোনটা বন, কোনটা ওদের বাগান। বাগানে যে কী গাছ তৈরি করে, সেও তো আমরা জানি না। পথ তৈরি করতে গিয়ে আমাদের এক কর্মী একটা চারাগাছ কেটে ফেলল। আর মশায়, কী বলব আপনাকে। হঠাৎ ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে যেন ভূতের মত আবির্ভাব। জনকয়েক খাসি। হাতে বর্শা, ইয়া লম্বা দা আর লাঠি। মহা হাল্লা। চিৎকার করে কী যে বলতে লাগল—কী করে বুঝব বলুন ? ওদের ভাষা তো বুঝি না। আমাদের তো তখন প্রায় ধাতু ছাড়ার মত অবস্থা।

একসপ্লোরেশনের সময় আমরা দোভাষী নিয়ে চলাফেরা করি। দোভাষীকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কী ?

দোভাষী বলল, সাব, ওদের ও গাছঠো নষ্ট করেছেন আপনারা। তাই আপনাদের এখন সিয়মের কাছে যেতে হবে। বিচার হবে আপনাদের।

তার কথা শুনে এবার আরও ঘাবড়ে গেলাম আমরা। বিচার ? বিচার আবার কী ? ওই একটি জংলী লতা, তার জন্যে বিচার ? দেশে কি পেনাল কোড-টোড নেই ?

দোভাষী বলল, উপায় নেই সাব। বলছে যখন, যেতেই হবে। ওরা ছাড়বে না।

কী আর করা ? সিয়ামের কাছেই গেলাম আমরা। সেও কি এখানে ? চল আরও দশ মাইল। তারপর এই পাহাড়ী পথ। ভাবুন ব্যাপারখানা। খাসিরা সব আমাদের জীপে উঠে পড়ল। উঠে কেউ

সামনের সিটে কেউ পেছনের সিটে এমন করে বসল যেন জীপ-গুলি তাদের বাপের সম্পত্তি। উপায় নেই। চুপ করেই থাকতে হবে। নইলে কাঁধের ওপর হয়ত পড়বে দা-এর কোপ।

সিয়াম মানে—ওদের রাজা। তাকে যে খাসিই হতে হবে এর কোন কারণ নেই। এরা কেউ কেউ খাসি। আবার শুনলাম কেউ মুসলমান। মোগল আমলে—বিশেষ করে আউরঙ্গজেবের সময় অনেক মোগল প্রাণের ভয়ে পশ্চিম থেকে এই পূর্বাঞ্চলে পালিয়ে এসে এসব পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। পরে অনেকেই তাদের পাকাপাকিভাবে এখানে থেকে যায়। অনেকে খাসিয়া মেয়ে বিয়ে করে এদের সমাজের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে গেছে।

সে যাই হোক, সিয়ামই হল এদের প্রধান। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় চিফটেইন। এদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্বাচিতও হয়ে থাকে। আবার অনেকে বংশপরম্পরায় সিয়াম। এরাই খাসিয়াদের বিধিবিচার এবং নিয়ম-কানুনের হর্তাকর্তা।

সিয়ামের কাছে গেলাম। সে ওদের কথা শুনল। আমাদের কথাও। দেখলাম লোকটি কথা বলে কম। বরং দু পক্ষের কথা মন দিয়ে শুনল সে। তারপর বিচারের রায়। আমরা অপরাধী বলে বিবেচিত হলাম। শাস্তি দুশো টাকা জরিমানা। এর কোন নড়চড় নেই।

না মশায়। সিয়ামের বিচারে কোন ওজর আপত্তি নেই। ওর কথা মানেই, কাজ। দিতে হল। গুণে গুণে দুশো টাকা সত্যিই, বের করে দিতে হল আমাদের।

প্রশ্ন করলাম, সরকারী কাজে এসেছেন, তার জন্যে এতগুলি টাকা পকেট থেকে দিতে হল আপনাদের।

এবার হাসলেন ভদ্রলোক। বললেন, অফ দ্য রেকর্ড। এ ধরনের খয়রাতির জন্যে কিছুটা ম্যানেজ করতে হয়। সরকারী তহবিল থেকেই যায়—ওই কনটিনজেনসি এসব থেকে।

পালা পার্বণের সময় ভয় আরও বেশি।

জীপের সারি। আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। দু-পাশে ঘন জঙ্গল। পাথর কেটে পথ তৈরি হয়েছে সম্প্রতি। শহরের পিচ ঢালা রাস্তা নয়। লাল মাটি। ছোট বড় পাথরের টুকরো। তার ওপর দিয়ে গাড়ি চড়ে যাওয়া মানে শরীরের প্রচণ্ড ব্যায়াম।

একটি গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। গ্রাম মানে পাহাড়ের ডগায় গোটা তিনেক পরিবারের ডেরা। খড়ে ছাওয়া এক একটি ঘর তিরিশ থেকে চল্লিশ ফুট লম্বা। ঘরের নিচে পাহাড়ের ঢাল। তার খানিকটা অংশ বাঁশ দিয়ে বেড়া দেওয়া হয়েছে। মেয়েরা সেখানে চাষ করছে। চাষের যন্ত্রপাতিও আদিম। ছোট ছোট খন্তা। তাই দিয়ে মাটি খুঁড়ে চিনে, কাহন, লঙ্কা, আদা প্রভৃতি বুনে চলেছে। আর কয়েক দিনের মধ্যেই নামবে বর্ষা। সেই বর্ষার জলে মাটি সিক্ত হবে। পাহাড়ের গা তখন ভরে উঠবে সবুজে। যতই দেখছিলাম, ভাবছিলাম, এক মুঠো খাবারের জন্যে মানুষকে এখনও কী প্রচণ্ড পরিশ্রমই না করতে হয়। অথচ এরাও তো ভারতীয়। স্বাধীনতার পর দেশে কত কল-কারখানা বসল। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপারে নানান কর্মযজ্ঞ। সেই কর্মযজ্ঞের স্পর্শ কতটুকু আমরা পৌঁছে দিতে পেরেছি ভারতের এই পূর্বাঞ্চলে?

হঠাৎ এক দঙ্গল জীপ দেখে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা ভিড় করল রাস্তার ধারে। চিৎকার এবং হাত নেড়ে উচ্ছ্বাস দেখাল। আমরাও তাদের উদ্দেশে হাত নাড়লাম। বয়স্কা যারা, তারা কিন্তু নিশ্চুপ

মাথা নিচু করে জমির কাজে ব্যস্তই রইল।

সুজিতবাবু মন্তব্য করলেন, পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী গ্রামের যেখানেই যাবেন, সেখানকার বড়দের মধ্যে এ ধরনের ইনডিফারেন্স আপনার চোখে পড়বে, মিঃ কর। সমভূমির মানুষের ওপর ওদের মধ্যে এখনও রয়েছে পাথরের মত অবিশ্বাস।

না। শুধু কি অবিশ্বাস? ঘৃণাও কি দেখি নি? এই ঘৃণা হয়ত কিছুটা সংস্কার। কিন্তু এই সংস্কারের পেছনে বাস্তবতাও কি কিছু নেই?

জানেন, ওই যে পালা পার্বণের কথা বলছিলাম? এই বনে জঙ্গলে চলাফেরা করতে গিয়ে ওই সময় আমাদের খুব সাবধান হতে হয়। সাংঘাতিক মশায়। খাসিদের মধ্যে এক দল আবার সাপ পুজো করে। তখন এসব অঞ্চলে একা ঘোরা মানে নিজের প্রাণ নিয়ে খেলা করা। জীপে যেতে যেতেই কথাটা তুললেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার জনৈক কর্মী।

সাপ পুজোর কথা শুনে আমি খানিকটা কৌতূহলী হলাম।

ভদ্রলোক বললেন, খাসিদের মধ্যে কোন কোন গোষ্ঠী বছরে এক বার সাপ পুজো করে। তার জন্যে তারা কী করে জানেন? পুজোর ঠিক এক মাস আগে বনবাদাড় চষে বেড়ায় সাপ ধরতে। বেশ বড়সড় একটি সাপ ধরার পর সেটিকে তারা একটি ঝাঁপির মধ্যে বন্দী করে রাখে। কিছু খেতেও দেয় না। এর পর এক মাস গেল। এতদিন না খেয়ে খেয়ে সাপ রেগে টং হয়ে আছে। তারপর পুজোর ঠিক আগে ওরা বেরিয়ে পড়বে মানুষ ধরতে। ভিন গাঁয়ের কোন মানুষ। বিদেশী হলে তো কথাই নেই। ধরুন লোকটি একা একা চলেছে। অমনি জনা কয়েক খাসি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

তারপর আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তাকে এক গোপন ডেরায় নিয়ে যাবে। নিয়ে গিয়ে তার গায়ের বিভিন্ন অংশে ছুঁচ ফুটিয়ে বের করে নেবে রক্ত। যতক্ষণ না রক্ত ঝরতে ঝরতে তার শরীর ফ্যাকাশে হয়। তারপর ওই রক্ত দিয়ে বন্দী সাপটিকে চান করিয়ে তারা পুজো করবে। মশায়, এটাই তাদের নাকি সব চেয়ে বড় পুজো। শুভ উৎসব। আমাদের নববর্ষ এবং বিহুর মত আর কি।

তা না হয় হলো, কিন্তু সেই লোকটিকে নিয়ে কী করবে তারা? আমার প্রশ্ন। বলতে কী, হতভাগ্য ওই বেচারার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আতঙ্কিতই হয়ে পড়েছিলাম আমি।

ভদ্রলোক বললেন, শরীর থেকে রক্ত বের করে নেয়ার পর আগে তাদের তারা ছেড়ে দিত। এখন শুনি, আর ছাড়ে না। মেরে ফেলে কোন গোপন জায়গায় কবর দেয়। কারণ আর কিছু নয়। আগে ছাড়া পাওয়া লোকেরা ফিরে এসে নিজের লোকদের জানিয়ে দিত সব। কখনও পুলিসের সাহায্য নিত। ফলে হুজ্জত শুরু হত অনেক। এই রিস্কটি এখন খাসিয়া নিতে চায় না।

প্রবাদের মতই মনে হয়। এসব কথা লোকমুখে ঘোরে। এখনও ঘোরে। বিশেষ করে বাইরে থেকে যারা আসে এ ধরনের অনেক কাহিনী তারা বিশ্বাস করে নেয়। আর এই বিশ্বাস থেকেই সৃষ্টি পারস্পরিক অবিশ্বাস, ব্যবধান এবং ঘৃণা।

প্রথম প্রথম আমরা ভয় পেতাম। এখন আর পাই না। বললেন অমরবাবু, এ অঞ্চলের অনেকেই এখন আমাদের বন্ধু। জিওলজিক্যাল সার্ভের কাজে তারা যথেষ্ট সাহায্যও করে।

কথা বলতে বলতে একটি ড্রিলিং সাইটে এসে পৌঁছলাম।

জিওলজিক্যাল সার্ভের-প্রায় ডজন খানেক কর্মী তখন কঠিন

পাথরের মধ্যে ড্রিল করায় ব্যস্ত। ডিজেল ইঞ্জিনের কান ফাটান শব্দে চারদিক মুখর। ভূস্তরের গভীর অঞ্চল থেকে তুলে আনা ভূতাত্ত্বিক নমুনা পরীক্ষা করতে ব্যস্ত বিশেষজ্ঞের দল। তাঁদের আত্মবিশ্বাস। এতক্ষণ গাড়িতে আসতে আসতে যে সব গল্প শুনছিলাম, এবার মনে হল, ওসব মিথ্যে। বরং মানুষের আসল প্রত্যয় যা, আমি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

তিন

'ডিপোজিট নাম্বার সেভেনটিন। আর এই জায়গাটার নাম ওয়ানসফি। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ থেকে এখানে আমাদের ড্রিলিং-এর কাজ চলছে।' বললেন গোবিন্দচন্দ্র নাহা। তাঁর ওপরই ওয়ানসফি এই ড্রিলিং স্টেশন দেখাশোনার দায়িত্ব। আরও দুটি জায়গার ড্রিলিংও তাঁকে দেখতে হয়। একটি থুলোখোলায়, অপরটি লালমাটিতে।

প্রচণ্ড শ্রমসাধ্য কাজ। শুধু শ্রমসাধ্য বললে ভুল হবে। দরকার যথেষ্ট হিসাব নিকেশ, সেই সঙ্গে সতর্কতা।

প্রথমে ম্যাপিং। অর্থাৎ যত পার, চষে বেড়াও। এ দায়িত্ব ভূ-তাত্ত্বিক বা জিওলজিস্টদের। ডাক্তারদের সঙ্গী একটি স্টেথোস্কোপ, একটি থার্মোমিটার এবং ছোট্ট এক বাক্স ওষুধ। আর জিওলজিস্টদের নিত্যসঙ্গী একটি কম্পাস, একটি লেন্স, একটি হাতুড়ি এবং একটি ক্যামেরা। এদের সম্বল করেই তাঁরা চষে বেড়ান। কখনও প্রান্তরে,

কখনও উপলসঙ্কুল উপত্যকায়, কখনও গহন অরণ্যে, দুর্গম পাহাড়-পর্বতের চূড়ায় অথবা নদী, প্রস্রবণ এবং সমুদ্র অধ্যুষিত এলাকায়। কোথাও গাড়ি চলে। কোথাও পথ চলার জন্যে নির্ভর করতে হয় ঘোড়া অথবা খচ্চরের ওপর। তবে বেশির ভাগই হেঁটে চলা। মাইলের পর মাইল শুধু হেঁটেই চলা। অনেক সময় রাত কাটাবেন, তার আশ্রয় নেই। প্রত্যন্ত অঞ্চল। হয়ত পাহাড়ী দেশ জঙ্গল কেটে পথ তৈরি করো। সেখানে বন্য পশুর ভয়, সাপের ভয়। অনেক সময়ে থাকে অজ্ঞাত পোকামাকড়। কখন যে তারা গায়ে এসে বসবে, কেউ জানে না। বিষাক্ত পোকা। একবার দংশন করলে আর রক্ষে নেই। শরীরের কোন অংশ হয়ত ফুলে উঠল। অথবা ক্ষত সৃষ্টি হল। এরপর আছে আদিবাসী। না জানা থাকে তাদের ভাষা, না আচরণ। অনেক সময় তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হয় প্রাণ হাতে করে। কিন্তু উপায় তো নেই! ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্যে প্রথমেই দরকার ম্যাপিং। ওঁরা বলেন 'টপোগ্র্যাফি'। জানতে হবে দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূস্তরের চরিত্র। কোথাও পাললিক স্তর, কোথাও আগ্নেয় শিলার কাঠিন্য অথবা পরিবর্তিত শিলা।

কোথাও মাইলের পর মাইল শুধু বালি। মাটি। কোথাও পাহাড় এবং পর্বতমালা। ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নেমে সমভূমির মাটির স্তর ভেদ করে নিচে নেমে গেছে। আবার কখনও বা উঁচু পাহাড়, এক হাজার, দু হাজার অথবা তিন হাজার ফুট উঁচু। তার বিস্তৃত চূড়া মাইলের পর মাইল প্রায় সমভূমির মত। যেমনটি দেখেছি চেরাপুঞ্জিতে। দেখা যাবে সমতল-চূড়া সেই পাহাড় হঠাৎ এক জায়গায় এসে যেন শেষ হয়ে গেছে। তার প্রান্ত নদীর খাড়া পাড়ের মত সরাসরি উপর থেকে নিচে নেমে সমভূমির গভীরে প্রবেশ

করেছে। এ ধরনের অঞ্চলকেই ভূতাত্ত্বিকরা বলে থাকেন 'ফলট'। বা চ্যুতি।

ম্যাপিং মানে কোথায় কী রকমের ভূস্তর পৃথিবীর বুকে মাথা চাড়া দিয়ে আছে, জেনে নাও। জেনে নাও কোন জায়গা সমুদ্রতল থেকে কতটা উঁচুতে, সেখানকার ভূস্তরের প্রকৃতিই বা কেমন ?

এর জন্যে দরকার লেন্স। পাথর বা মাটির নমুনা নিয়ে দেখে নাও, তার বাইরের প্রকৃতিটা কী রকম। দরকার হলে হাতুড়ি মেরে খানিকটা পাথর কেটে নাও। তারপর লেন্সের সাহায্যে দেখে নাও তার রঙ, তার গঠনবৈচিত্র্য। এবার সেই নমুনাটি একটি থলের মধ্যে ভরে তার গায়ে লিখে রাখ, এ পাথর কোথেকে পাওয়া গেল, কী ভাবেই-বা পাওয়া গেল। ক্যামেরা বের কর। যে স্তর থেকে নমুনাটি পাওয়া গেল, তার ছবি তোল, ছবি তোল আশপাশের অঞ্চলের। রঙীন ছবি তুললেই ভাল হয়। তাহলে আরও বিশদভাবে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান রেকর্ড করা যায়।

কম্পাস ? হ্যাঁ, তার ভূমিকা যথেষ্ট ! শুধু কোন জায়গায় কতটা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সেটা জানাই নয়, সেখানকার চৌম্বক ক্ষেত্রের স্বরূপটিও জানতে হয় কম্পাসের সাহায্যে।

পাথরের স্তূপ। কোথাও খাড়া। যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। কোথাও পুরু স্তর। পর পর সাজান। মাটির সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থায় এগিয়ে গেছে এদিক থেকে ওদিক। একদা, কতকাল আগে এখানে ছিল সমুদ্র। সেই সমুদ্রের বুকে জমেছে পলি, নদী স্রোতে বয়ে আনা বালি, পাথর। কালে কালে তারা শিলায় পরিণত হয়েছে। কখনও ভূতাত্ত্বিক চাপে উত্তপ্ত হয়ে তাদের কোন কোন অংশ গলে গিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে পরিবর্তিত শিলায়। মাটির

ভেতর থেকে নানা রকম রাসায়নিক বস্তু। এ পরিবর্তন তারাও ঘটায়। তৈরি হয় নতুন ধরনের শিলা। মেটামরফিক রক। পাথরের এই বৈচিত্র্য দেখে ভূতাত্ত্বিকরা বলে দিতে পারেন কোথায় কী ধরনের খনিজ সম্পদ প্রকৃতি তার আঁচল দিয়ে লুকিয়ে রেখেছে।

'মুখ দেখে আপনারা মানুষ চেনার চেষ্টা করেন, আর আমরা পাথর দেখে অনুমান করি প্রকৃতি তার কোন সম্পদটি কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।' মন্তব্য করলেন সুজিতবাবু। 'ড্রিলিং তো অনেক পরে। প্রথমে এই হাতুড়ি। পাথরের বুকে হাতুড়ি মেরে প্রথমে নমুনা নিন। তারপর আছে রাসায়নিক পরীক্ষা। আছে ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানীদের নিরীক্ষণ। দেখে শুনে তাঁরা যখন বললেন, মাল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তারপরই তো ড্রিলিং। ড্রিলিং-এ খরচ তো কম নয়। লাভজনক কিছু পাওয়া যাবে কী না, সেটা না দেখে ড্রিল করা চলে না।'

আমাদের সামনেই ড্রিলিং চলছে। ডিজেল ইঞ্জিনের কান ফাটানো শব্দ। সেই ইঞ্জিনের সাহায্যে লোহার নল ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে পাথরের বুকে। গভীরে। যেমনটি আমরা টিউবওয়েল তৈরির সময় দেখে থাকি।

তবে এখানে কাজটি আরও শক্ত। প্রথম নলটির ডগায় একটি বোরার লাগিয়ে নাও। বোরারের সামনে বসান থাকে এক ধরনের ছোট ছোট হীরের টুকরো। ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শক্তিতে পাথরের বুকে চেপে বসে বোরারের সামনের অংশ যখন ঘুরতে থাকে, পাথর ক্ষয়ে গিয়ে তৈরি করে ছিদ্র। বোরারের পেছনে আঁটা নল এবার সেই ছিদ্রপথে ধীরে ধীরে ঢুকতে থাকে ভূস্তরের গভীরে। সেই নলই সংগ্রহ করে নিয়ে আসে ভূস্তরের নমুনা।

দেখেছি। দেখেছি ওয়াসফির বিস্তৃত অঞ্চল। এক সময় সিলিমে-নাইটের স্তর ওপরেই ছিল। ওপর থেকে কেটে তাদের সংগ্রহ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে তৈরি হয়েছে খাদ। মূল্যবান এই বস্তুর সংগ্রহে জিওলজিক্যাল সার্ভে এবার হাত বাড়িয়েছে গভীর ভূস্তরের নীচে।

দিতেই তো হবে। কোন ভাণ্ডারই তো আর অসীম হতে পারে না। সিলিমেনাইটের সঙ্গে এ অঞ্চলে পাওয়া গেছে করানডাম। সে তো অনেক দিনের কথা।

সোনা পাহাড়ে সিলিমেনাইট এবং করানডামের এই যে সমাবেশ সে খবর প্রথম জানিয়েছিলেন একজন ব্রিটিশ ভূ-বিজ্ঞানী। নাম এফ আর ম্যালেট। সেটা ১৮৭৯। পরে ১৯২৯ সালে এই নিয়ে এ অঞ্চলে অনুসন্ধান চালান জে এন ডান, ১৯৩৮ সালে সি এস ফক্স্ এবং ১৯৩৯ সালে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক ভি পি সেনধী। এর পর এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কাজে ভাটা পড়ল। যুদ্ধের পর স্বাধীনতা। এবার নতুন উদ্যমে এবং পরিকল্পনায় সোনা পাহাড়ের বিস্তৃত অঞ্চলে অনুসন্ধানের কাজে হাত দিল জিওলজিক্যাল সার্ভে। আবিষ্কৃত হল, সোনা পাহাড় তার ১৩০ বর্গ কিলোমিটার ধরে সঞ্চিত করে রেখেছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানের সিলিমেনাইট। মোট সাতাশটি ডিপোজিটের সন্ধান পাওয়া গেছে। শুধু সোনা পাহাড়েই নিশ্চিতভাবে ১,২৬,০০০ মেট্রিক টনের মত এই আকরিকটি সংগ্রহ করা যাবে বলে জিওলজিক্যাল সার্ভের ভূতাত্ত্বিকরা মনে করেন।

তরুণ জিওলজিস্ট ওয়াধাবনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। পাথরের সঙ্গে তার একাত্মতা এই তো সম্প্রতি। তবু মনে হল, দিল্লির এই স্মার্ট ছেলেটির কাছেও এখন যেন পাথরই জীবন। পাথর তাঁর স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা।

'জানেন তো, সিলিমেনাইট মানে অ্যালুমিনা এবং সিলিকার সমাবেশ। বলতে পারেন তাদের জটিল রাসায়নিক যৌগও।' বললেন ওয়াধাবন। 'এখানে আমরা যে সিলিমেনাইট পেয়েছি তাতে অ্যালুমিনাই আছে শতকরা একষট্টি ভাগ। পৃথিবীতে আর কোথাও এত বেশি অ্যালুমিনা আছে এমন সিলিমেনাইট আপনি পাবেন না। এ ব্যাপারে ভারতের পর দ্বিতীয় স্থান দক্ষিণ আফ্রিকার। আমাদের এই সিলিমেনাইটের দাম কত জানেন ? এক এক টনের দাম পনেরশ' টাকা। ইস্পাত কারখানা থেকে শুরু করে নানা রকম কারখানার চুল্লিতে ভেতরের আস্তরণকে উচ্চ তাপমাত্রায় সহনীয় করার জন্যে সিলিমেনাইটের লাইনিং কাজে লাগান হয়। তাই দেশ-বিদেশে এর চাহিদাও এখন প্রচুর।'

১৯৫১ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত ওয়ানসফির এই অঞ্চলে সিলিমেনাইট খননের কাজ চালিয়েছিল আসাম সিলিমেনাইট লিমিটেড। ১৯৭২-এর পর এল হিন্দুস্থান স্টিল লিমিটেড। পুরো এলাকা ওই আকরিক সংগ্রহের জন্যে পত্তনি নিল তারা। তারপর থেকে সিলিমেনাইট মাইনিং-এর কাজ তারাই চালিয়ে যাচ্ছে।

আর এর ফল হয়েছে অভূতপূর্ব। প্রস্তরীভূত সভ্যতা এখন সচল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এখন এখানে মানুষের ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে এসে মিশেছে খাসি পুরুষ। এবং নারী। বসেছে নানান পসরার হাট। চায়ের দোকান, মনোহারী সওদা! সিফটে সিফটে কাজ হয় খনির। ভোঁ বাজে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাসি শ্রমিকরা বন্য সর্পিল পথ ধরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে খনিতে কাজ করতে যায়। পথ চলার সময় কারোর কারোর কণ্ঠে হিন্দী গানের কলিও শুনতে পাবেন কখনও সখনও।

বেলা বাড়ছিল।

সুজিতবাবু ডাকলেন, ওয়াধাবন, দুপুরের খাবার—

ওয়াধাবন তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়েই জবাব দিলেন, আমাদের ক্যাম্পেই তার ব্যবস্থা করেছি। চিন্তার কারণ নেই। কয়েকটি মুরগী আমরা আগে থেকেই রেডি করে রেখেছিলাম। আপনারা যে মুরগী সঙ্গে করে এনেছিলেন তারও সদ্ব্যবহার করার আয়োজন হয়েছে।

ভেরি গুড। সুজিতবাবুর কণ্ঠে স্বস্তি।

স্বস্তিই বটে! শুনেছিলাম, এদিকে নাকি খুব সস্তায় মুরগী পাওয়া যায়। অনেক সময় খাসিয়া বন্য মুরগী ধরে নিয়ে এসেও বিক্রি করে। এদিকে সারা বনে নাকি প্রচুর মুরগী। কিন্তু এসব কথা শেষ পর্যন্ত শুধু 'শোনা'-ই হয়ে রইল। এতটা অঞ্চল ঘুরলাম, একটাও বন্য মুরগী চোখে পড়েনি। সাধারণ মুরগীরও দাম বেজায় বেশি। একটি মুরগীর দামই কখনও কখনও কুড়ি টাকার মত চেয়ে বসে খাসিরা, মাছ খাবেন, তারও উপায় নেই। ছোট ছোট জলাশয় বা পার্বত্য নদীতে ছোট ছোট কিছু মাছ ধরা পড়ে। অসম্ভব দাম। পনের থেকে ষোল টাকা কিলো। তাও আপনি সব সময় পাবেন না।

ড্রিলিং সাইট থেকে নেমে ড্রিলিং ক্যাম্পে এসে বসলাম আমরা। গোবিন্দবাবু বললেন, এত দূরে এসেছেন, আমরা ক্যাম্পে কী ভাবে থাকি একটু দেখে যাবেন না? সেই ক্যাম্পে বসেই এই সব বিবরণ শুনছিলাম।

চারদিকে পাহাড়। মাঝখানে কিছুটা সমভূমি। উপত্যকার মত। পরপর কয়েকটি কাপড়ের ক্যাম্প। বাঁশ কেটে দুটি ছিটে বেড়ার ঘরও করা হয়েছে। গোবিন্দবাবুই এই ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত

কর্মী। সরকারী স্থায়ী চাকুরে এখানে মোট চারজন। এদের সঙ্গে আছে আরও বাইশজন কর্মী। এদের কেউই স্থায়ী চাকুরে নয়। কনটিনজেণ্ট। মানে অস্থায়ী দিন মজুর।

কনটিনজেণ্ট। পথে আসতে আসতে কথাটা বহুবার শুনতে পেয়েছি। তাই প্রশ্ন না করে পারলাম না। ব্যাপার কি বলুন তো? আপনাদের কতগুলি কনটিনজেণ্ট ওয়ার্কার নিয়ে কাজ করতে হয়?

আমার প্রশ্নে সবাই যেন একটু থতমত খেলেন।

বুঝলাম এসব সরকারী তথ্য নিয়ে ওঁরা কেউ মুখ খুলতে চান না।

তবু অবস্থাটা যে কী নিদারুণ, সেটা জানতে আমার অসুবিধে হয়নি। জিওলজিক্যাল সার্ভের শতকরা আশিজন কর্মীই অস্থায়ী। কনটিনজেণ্ট। এদের কাছে কাজ মানেই মাইনে। কাজ নেই, মাইনে নেই। এইসব কর্মীদের মধ্যে স্কিলড এবং আনস্কিলড সব রকমই আছে। এদের মধ্যে আছে বাহক, আছে মেকানিক, মোটর গাড়ির চালক। করণিক এবং টাইপিস্টও আছে। এদের অনেকেই বছরের পর বছর কাজ করছে। সাতদিন কাজ, একদিন সবেতন ছুটি। এই হল সোজা হিসেব। ফিলডে যখন থাকে তখন কাজের সময়ও ঠিক থাকে না। অথচ কেউই স্থায়ী চাকুরে নয়। দৈনিক সব চেয়ে বেশি মাইনে মানে, সাড়ে আট টাকা। তার কমও পায় অনেকে।

পাশে দাঁড়িয়ে ছিল লিনডো। সুজিতবাবু তাকে দেখিয়ে বললেন, বেশি দূর যেতে হবে না। এই যে লিনডো। আপনার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। লিনডোও তো কনটিনজেণ্ট।

পথে আসার সময় বলেছিলেন বটে আপনি একবার। বললাম আমি।

লিনডো জিওলজিক্যাল সার্ভের জীপ চালাচ্ছে কয়েক বছর।

কেমন একসপার্ট ড্রাইভার সে তো পথে আসতে আসতে দেখলেন আপনি। কিন্তু লিনডো এখনও কনটিনজেন্ট। কাজ করলে দৈনিক আয় সাড়ে আট টাকা। ব্যাস। কোন ওভারটাইম নেই। কোন দুর্ঘটনায় জখম হলে বা মারা গেলে কোন কমপেনসেসন নেই।

লাল জামা। পরনে হাফ প্যাণ্ট। পায়ে ছেঁড়া জুতো। লিনডো আমার পাশেই দাঁড়িয়ে। যেন পাথরের মূর্তি। তামাটে মুখের ওপর দুটি পাথরের চোখ। নিস্পৃহ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই যে সে জীপ চালিয়ে যাচ্ছে, তার দৈনিক বেতন মাত্র সাড়ে আট টাকা! তার কোন ওভারটাইম নেই! এত পরিশ্রম তাহলে কেন করে সে? কিসের আশায়? বেসরকারী ট্রাক চালালেও তো সে দৈনিক কম করেও কুড়ি টাকার মত রোজগার করতে পারত?

'হ্যাঁ, তা পারত।' উত্তর দিলেন সুজিতবাবু। 'কিন্তু ওই যে— আশা। এইভাবে কাজ করতে করতে যদি কোনদিন সে স্থায়ী চাকরি পায়, সেই আশায় তো এত পরিশ্রম। দিনের পর দিন ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে যাওয়া। বেসরকারী কাজে রোজগার বেশি। তবে রিকসও তো আছে? ওর বয়েস হয়েছে এখন। একমাত্র পুত্র সন্তান। ওর বোন আছে। মায়ের যা সম্পত্তি সে তো ওই বোনই পাবে। ওর নিজের কোন জমি জমা নেই। তাই ভাবছে, চাকরিটা যদি কোনদিন পাকা হয়, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা তো আসবে।

ওয়ানসফির এই ড্রিলিং ক্যাম্পে ঠিক ওই একই রকম অনিশ্চয়তা নিয়ে কাল গুণছেন কেরলার এম এল ম্যাথু। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে জিওলজিক্যাল সার্ভের চাকরি নিয়ে হেলপারের কাজ করছে। দৈনিক বেতন সাড়ে আট টাকা। আছেন ডোগাল হো। সাঁওতাল। হারমত আলি। আসামের মানুষ। বি এন সরকার।

কলকাতা থেকে এসেছেন। এবং সেকান্দার মাহাতো। দূর বিহার থেকে এসে যিনি এখানে দৈনিক সাত টাকার বিনিময়ে সার্ভের কাজ করে চলেছেন।

পি আর দাস এখানকার রেগুলার স্টাফ। ড্রিলম্যান গ্রেড-১। স্ত্রী মিতা দাসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল দশ বছর আগে। একটি ছেলে। মিতা তাঁর স্বামীর সঙ্গে ফিল্ডে ফিল্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রায় নয় বছর।

কষ্ট হয় না? মিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে থাকতে কষ্ট হয় না আপনার।

মিতা বললেন, কী করব বলুন। উনি এইভাবে থাকেন। বাড়িতে একা থাকতে আমার ভয় করে। কী জানি, যদি কিছু হয় ওঁর? ভাল কি লাগে আর? বাবা মা আছেন। তাঁদের দেখতে পাইনি কতদিন। এই পাহাড়, জঙ্গল। পাথর ভাঙ্গা কাজ। বুকটা সব সময় দুরদুর করে। ছেলেটা এখন ছোট। আর একটু বড় হলে তার পড়াশুনার যে কী হবে, জানি না। আজকাল খাসি মেয়েরা মাঝে মাঝে আসে। ওদের সঙ্গে গল্প করে নির্জনতা খানিকটা ভুলে থাকি।

সারা ড্রিলিং ক্যাম্প এলাকায় মাত্র দুটি স্ত্রীলোক। তরুণী বধূ মিতা দাস। আর গোবিন্দচন্দ্র নাহার মা। বৃদ্ধা মহিলা সুদূর কলকাতা থেকে ছুটে এসেছেন ছেলেকে দেখতে। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন বছর দশেকের নাতনী। কয়েক দিন থেকেই আবার ফিরে যাবেন তিনি।

'কী বলব, বাবা, ছেলেকে খাওয়ানর আমার বড় শখ। কলকাতা থেকে বড়ি এনেছি, মুগের ডাল এনেছি। কত রকম রান্না করি। কিন্তু ছেলের আর মুখে দিতে পারি না। বলে, মা, এই আসছি। তুমি

রান্না করে রাখো। ড্রিলিং চলছে। দেখে আসি একবার। কিন্তু কে আর আসে বাবা। খাবার ঠাণ্ডা হয়। কাজ থেকে ছেলে আসে কই? বুড়ো হয়েছি। এখানে এই আমার শেষ আসা। পথঘাটের যা অবস্থা। চলতে হাড়গোড় ভেঙ্গে যায়। আর আমি আসতে পারব না। কী যে হবে আমার ছেলের? কথা বলতে বলতে দু চোখ জলে ভেসে উঠল গোবিন্দবাবুর মা'র।

সমস্যা অনেক। ভাবছিলাম, বাবা, মা, স্ত্রী পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন বছরের পর বছর এই যে দুঃসহ জীবন, সে জীবনে সত্যিই কি এঁরা শেষ পর্যন্ত অভ্যস্ত হতে পারেন? এঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা কি করা যায় না? শুনলাম সরকারী ডাক্তার ছাড়া চিকিৎসা করলে কোন রকম খরচ বা ছুটি মঞ্জুর করার ব্যাপারে সরকার কোন দায়দায়িত্ব নেন না। তা যদি হয়, এই ওয়ানসফির কর্মীকে কি সার্টিফিকেট অথবা ওষুধের জন্যে ছুটতে হবে সেই শিলং অথবা গৌহাটিতে সরকারী ডাক্তারের খোঁজে?

যন্ত্রপাতি বিগড়ালো। চল পাহাড় পর্বত ঠেঙ্গিয়ে ১৩৫ কিলোমিটার পথ সেই শিলং। পেট্রল নেই? চল ১০০ কিলোমিটার দূরে সেই বোকোয়? এমন কি সাপ্তাহিক খাবার দাবার কেনার জন্যেও ওই বোকোতেই যেতে হবে। খাটুনির পর এসব ভালোও লাগে না সব সময়। ভাবছিলাম, এসব ক্ষেত্রে সরকার থেকে কি রেশন সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা যায় না? যেমন করা হয়ে থাকে সেনা বিভাগের ক্ষেত্রে?

গোবিন্দবাবু বললেন, চিঠিপত্র পাওয়া দুষ্কর হত যদি না এখানে হিন্দুস্থান স্টিল থাকত। ওঁদের ডাক আনতে যেতে হয় বোকো।

রোজই যান। ওই সঙ্গে আমাদেরও চিঠিপত্র অথবা টেলিগ্রাম দয়া করে নিয়ে আসেন, তাই রক্ষে।

চা এল। এল ডালমুট। বিস্কুট।

গোবিন্দবাবুর মা বললেন, এখানে এক মুঠো খেয়ে গেলে হত না, বাবা? বেলা অনেক হয়েছে।

বললাম, আজ থাক মা। আর কোনদিন হবে। এখান থেকে তাড়াতাড়ি সেরে আজই গৌহাটি পৌঁছতে হবে কিনা, তাই দেরি করা উচিত হবে না আমাদের।

আর আবার! আবার কি দেখা হবে বাবা? একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

এর অর্থ কী, আমি জানি। কারণ, মানুষই যে মানুষের কাছে সব চেয়ে বড় সম্পদ। পাথর-জীবনে কয়েক ঘণ্টার জন্যে শোরগোল তুলেছিলাম—হয়ত তিনি চাইছিলেন, সেটা আরও কিছুক্ষণ স্থায়ী হোক। এখানে খাওয়াটা গৌণ। আসলে যা তিনি চেয়েছিলেন, তার মর্মার্থঃ তোমরা থাক। আরও কিছুক্ষণ থাক। তাহলে হৃদয়ের শূন্যতাকে কিছুক্ষণের জন্যেও আমি পূর্ণ করে রাখতে পারি।

ওয়াধাবনের ক্যাম্পে যখন ফিরলাম ঘড়িতে তখন দুটো। মাঝে ঝির ঝির করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। রাস্তায় বেশ কাদা জমেছে। জীপের চাকা পিছলে যাচ্ছিল সেই কাদায়।

আড়াইটের মধ্যে খাবার প্রস্তুত। মুরগীর মাংস এবং ভাত। খিদেও পেয়েছিল খুব। শুধু আমার নয়। সবারই। সেটা বুঝলাম, যখন দেখলাম, খাবারের নামেই যে যার আসন বিছিয়ে বসে পড়েছেন।

ডি পি দাসের বাড়ি গৌহাটি। এখানকার সহকারী জিওলজিস্ট।

আর ডি পি সরখেল এবং আর এন সাহা সার্ভেয়ার। খাবার দাবার তৈরির ভার নিয়েছিলেন এঁরাই।

ডি পি দাস বললেন, আমাদের রান্না আপনাদের কেমন লাগবে, জানি না, মশাই। ক্যাম্পে থাকতে থাকতে এ কাজটিও আমাদের শিখে নিতে হয়েছে।

বললাম, ভাবতে হবে না আপনাকে। জ্বলন্ত আগুনে যা দেবেন, তাই জ্বালানি হয়ে জ্বলতে থাকবে। এখন যা দেবেন, তাই ডেলিসাস।

খাওয়ার পর কফি।

আর কফি খেতে খেতে সুজিতবাবুই তুললেন কথাটা। জানেন, মিঃ কর, নংগস্টইনের গুহাটাই আপনার দেখা হল না। ভেবেছিলাম, ওটা দেখিয়ে দেব আপনাকে। কিন্তু আপনি তো এখন যেতে চান গৌহাটি।

বললাম, মানে, সেখানে আমার একটু দরকার ছিল—

না, না। ঠিক আছে। আপনি গৌহাটি যান। সমরজিৎ এবং অজিতবাবু আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন। দুটো জীপ যাবে। আমি বাকি দুটো জীপ এবং ট্রেইলর নিয়ে শিলং যাচ্ছি। অমরদা আমার সঙ্গে চলুন। আমরা কাল সকালে নংগস্টইন এবং হাফলং হয়ে শিলং যাব। ঘণ্টা পাঁচেক লাগবে। তবে স্যার, গৌহাটিতে দেরি করবেন না। কাল যতটা সকালে সম্ভব সেখান থেকে রওনা হবেন। দুপুরের খাবার শিলং-এই খাবেন এখন।

ঠিক হল ডি পি দাসও আমাদের সঙ্গে যাবেন। শনিবার, ১ বৈশাখ। বিহু উৎসব। উৎসবে যোগ দেবেন তিনি।

সুজিতবাবুকে বললাম, নংগস্টইনের গুহাটার কথা কী বলছিলেন যেন?

না, তেমন কিছু নয়। তবে আপনাকে একটা জিনিস দেখাতাম। মুশকিল হয়েছে সেন সাহেবের (শম্ভু সেন) প্রোগ্রাম নিয়ে। এত টাইট প্রোগ্রাম, মশায়। নইলে সেই বুড়ো সিয়ামকেও দেখিয়ে দিতাম আপনাকে। বয়েস হয়েছে বটে, তবে এখনও স্মৃতিশক্তি লোপ পায় নি তাঁর।

অদ্ভুত রহস্যের জাল সৃষ্টি করে কথা বলতে পারেন সুজিতবাবু। তাঁর ভূমিকাটি আমার কাছে রহস্যজনক বলেই মনে হল।

ব্যাপারটা এই। বলে চললেন তিনি। রিয়াংডো বাজার দিয়েই তো এদিকে এলাম আমরা? আপনার মনে আছে নিশ্চয়, যে পথ ধরে এখানে আমরা এলাম, বাজারের কাছে এসে সেটি ডান দিকে বেঁকে গেছে। আর আমরা এলাম বাঁ দিকের ঘুর পথে। ডান দিকের ওই রাস্তাটাই নংগস্টইন এবং হাফলং হয়ে সোজা চলে গেছে শিলং। ওই নংগস্টইনের কাছের একটি পাহাড়ে গেলে তিনটে গুহা দেখতে পাবেন আপনি। গুহা না বলে বরং টানেলই বলি। একটি টানেল ছোট। কত আর হবে। ব্যাস এই ধরুন ফুট পনের। গেলে দেখবেন, তার মুখটি কাদা দিয়ে বন্ধ করা। কে করেছে, কেউ বলতে পারে না। আর দুটি টানেলের মধ্যে এই ১৯৭১ সালেও ছিল প্রচুর কার্বন মনোকসাইড। সেখানে আগুন জ্বলতেও দেখেছেন পুরনো লোকেরা।

অনেকে মনে করেন, এই টানেলগুলি মানুষেরই তৈরি, কোন ভূতাত্ত্বিক ঘটনা নয়। ১৯২৪ সালে আসামে তখন একটি বিলেতি কোম্পানি এ অঞ্চলে করান্‌ডাম সংগ্রহের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাম স্টিল ব্রাদার্স কোম্পানি। করানডামের নতুন স্তর খোঁজার জন্যেই টানেলগুলি তৈরি করেছিল তারা। তারা বড় বড়

যন্ত্রপাতি নিয়ে এ অঞ্চল থেকে প্রচুর করানডাম নিয়ে যায়। মূল্যবান এই বস্তুটি কাঠিন্যের দিক দিয়ে হীরের পরেই পড়ে। কাচ ঘষার জন্যে এর দরকার খুব।

তা একবার হলো কী—ওই ১৯২৪ সালেই। স্টিল ব্রাদার্সের কয়েকজন কর্মী করানডামের সন্ধানে ওই টানেলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পনের দিনের মধ্যেই দেখা গেল তাদের সবাই মরে গেছে। অনেকের ধারণা এ কোন অশরীরীর কাজ। তবে আমরা মনে করি, টানেলের মধ্যেকার বিষাক্ত গ্যাসই তাদের খুন করেছে।

যে বৃদ্ধ সিয়ামের কথা বলছিলাম, তিনিই এ ঘটনার সাক্ষী। তখন তিনি পাঁচ ছয় বছরের বালক। তবে ওই ঘটনা তিনি আজও নাকি ভুলে যাননি। তবে সিয়াম করানডামের কথা বিশ্বাস করতে চান না। তাঁর ধারণা, স্টিল ব্রাদার্স আসলে সোনার সন্ধান পেয়েছিল। সেই সোনা নিতে এসেই তাঁরা দেবতাদের রোষে পড়েন। বিপত্তির কারণ এটাই।

শুধু নংগস্টইনেই নয়। ঘটনার সঙ্গে অতি প্রাকৃতিক আখ্যান মিশিয়ে এমন গল্প বিস্তর শোনা যায় পূর্বাঞ্চলের ট্রাইবদের মধ্যে। এ সব গল্পের ঐতিহাসিক সত্যতা কতটা, জানি না। কিন্তু এই গল্পগুলির মধ্যেই বিধৃত হয়ে আছে তাদের মানসিকতা। এই মানসিকতা যথাযথ বুঝে উঠতে পারলে তবেই ট্রাইবদের সত্যিকারের আশা আকাঙ্ক্ষা কী, তা জানা সম্ভব।

বিকেল চারটে নাগাদ আবার চলা। এবার গৌহাটি হয়ে শিলং। তারপর চেরাপুঞ্জি। সেখান থেকে সিলেটের কাছাকাছি ভোলাগঞ্জ। কিন্তু তখনও কি জানতাম, ওই চেরাপুঞ্জির পথেই এমন একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে যার মুখ দিয়ে আমাকে শুনতে হবে ক্লাইং

সসারের গল্প, ফ্লাইং সসার মানে উড়ন্ত পিরিচ! যে নিজের চোখে সেই পিরিচকে নিজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে! সেও একজন খাসি। নাম পূর্ণকুমার রায়। তার সঙ্গে দেখা মওকডক ডাকবাংলোর সমামে। তার কথায় চমকে না উঠে পারিনি।

চার

আগে ছিল আসামের অন্তর্গত। ১৯ জানুয়ারি, ১৯৭২ গারো, খাসি এবং জয়ন্তিয়ার পার্বত্য জেলাগুলি একত্রিত করে তৈরি হল নতুন প্রদেশ। মেঘালয়। উত্তর-পশ্চিম উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা বরাবর আসাম। আর দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঙ্গলা দেশ। আয়তন তেইশ হাজার বর্গ কিলোমিটার। আর জনসংখ্যা দশ লক্ষের মত।

পাহাড় এবং পাহাড়। থাকে থাকে সাজান। সমুদ্রতল থেকে সেই পাহাড়ের উচ্চতা কোথাও দেড়শ' মিটার। কোথাও প্রায় দু হাজার মিটার। উপলখণ্ডের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ী নদীর লুকোচুরি খেলা। সে নদী কখনও গভীর অরণ্যের মধ্যে হারিয়ে যায়। কখনও বা চলার পথে সৃষ্টি করে ছোট ছোট জলাশয়। তার কাকচক্ষু জলের ওপর গাঢ় সবুজের ছায়া। হয়ত বা চোখে পড়বে কোন খাসি ললনা। জলের ধারে একখণ্ড পাথরের ওপর তার সমস্ত দেহবাস পড়ে। নিরাভরণা। নিঃসঙ্কোচ। পৃথিবীর কোন দিকেই যেন তার দৃষ্টি নেই। স্ফটিকশুভ্র নগ্ন পিঠের ওপর ঘন কালো চুলের মেঘ বিস্তার

করে কখনও একখণ্ড পাথরের ওপর বসে কাপড় কাচছে। কখনও বা দেবকন্যার সৌন্দর্য ছড়িয়ে ভেসে রয়েছে জলে।

তবে সাবধান। মনের আগ্রহ মনে রাখাই ভাল। পুরুষের কৌতূহলকে ওরা ঘৃণা করে। বিশেষ করে সে পুরুষ যদি ভিনদেশী হয়।

এ ঘৃণা যে কত তীব্র তাও দেখেছি।

আমরা শিলং-এর দিকে যাচ্ছিলাম। মাঝে পড়ল একটি উপত্যকা। সেই উপত্যকার সবুজ জমিতে চাষ করছিল কয়েকটি মেয়ে। দু একজন প্রবীণাও ছিল তাদের মধ্যে। নানা রঙের পোশাক পরা ওই মেয়েদের দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। পাশেই বসে ছিলেন অজিতবাবু।

বললাম, ছবি তুলতে হবে। রঙীন ছবি।

লিনডোর কানে আমার কথা যেতেই সে গাড়ি থামিয়ে দিল।

অজিতবাবু বললেন, ছবি তুলছি। কিন্তু তার আগে ওদের একটু পারমিশন নিলে হত না ?

আমি বললাম, মশাই, পারমিশন পরে নেবেন। আগে ক্যামেরায় ক্লিক তো করুন। পারমিশন টারমিশন নিতে গেলে ন্যাচারাল পোজটাই মাটি হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক।

আর তারপরই মারমুখী ব্যাপার।

মেয়েগুলি আমাদের মতলব বুঝতে পেরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার। মুহূর্তে ক্যামেরার দিক পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। আর সেই সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় গালাগাল। কেউ কেউ আমাদের দিকে কাদা ছুঁড়তে লাগল। ভাগ্য ভাল, আমাদের রাস্তাটা থেকে ওদের দূরত্ব ছিল অনেক বেশি। অতএব কাদা মাখতে হয় নি।

লিনডো সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল। আমরা লক্ষ করলাম, মেয়েরা তখনও আমাদের উদ্দেশ্যে হাত পা ছুঁড়ে গালাগাল দিয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে আমাদের লক্ষ করে থুতু ছুঁড়ছে।

এই ঘৃণা শুধু মেয়েদের মধ্যে নয়, পুরুষদের মধ্যেও লক্ষ করেছি। অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় সামনাসামনি তারা স্বাভাবিক ভাবে অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা করে ঠিকই, কিন্তু মনে মনে সমতলভূমির মানুষকে এখনও তারা বন্ধুভাবে মেনে নিতে পারে নি।

'তবে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে।' বললেন শ্রীশম্ভু সেন। জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিভাগের ডেপুটি ডাইরেকটর জেনারেল।

শম্ভু সেন। জিওলজিক্যাল সার্ভের সবার কাছে তিনি শুধু 'স্যার' নন। শম্ভুদা।

সত্যি কথা বলতে কী, এ ধরনের মানুষ আমি কমই দেখেছি। প্রচণ্ড স্মার্ট, রসিক, কথা বলতে ভালবাসেন এবং সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ড তাঁর নখর্দপণে। দেখেছি, বড় সরকারী অফিসারদের অনেকেই হন স্নব, আত্মকেন্দ্রিক এবং নিজেদের স্ট্যাটাস সম্পর্কে বড় বেশি স্পর্শকাতর। শম্ভুদাকে দেখলে মনে হয়, এসব ধ্বংস করার জন্যেই তিনি যেন জন্মেছেন। তাঁর কাছে কাজের প্রতিশ্রুতিতেই মানুষের পরিচয়। এবং যিনি যে কাজই করুন না কেন, ভাল কাজ করলে তিনিই নমস্য। সিনিয়ার জিওলজিস্ট থেকে শুরু করে জীপের ড্রাইভার, হেলপার সবারই তিনি প্রিয়পাত্র। সবারই শম্ভুদা।

একজন বললেন, দারুণ ভাল মানুষ। কিন্তু পান থেকে চুন খসলে রেহাই নেই। দারুণ রেগে যান তিনি।

তবে ওই রাগই শুধু। রাগ মানে শাসন। শোধন। কারোর ক্ষতি করা নয়।

শিলং-এ জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার দপ্তরে যখন গিয়ে পৌঁছলাম, কী একটা ব্যাপার নিয়ে সিনিয়র জিওলজিস্টদের সঙ্গে মিটিং করছিলেন শম্ভুবাবু। আমরা যেতেই মিটিং শেষ হল।

ওঁর সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল। সে অন্য পরিবেশে। কলকাতার গ্রাণ্ড হোটেলে রোটারি ক্লাবের আহ্বানে ভারতের হীরক নিয়ে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। তখন। সেখানে তাঁর ভূমিকা ছিল অ্যাকাডেমিসিয়ানের মত। একজন অধ্যাপক অথবা বিজ্ঞানী। আর এখানে প্রথম দর্শনেই মনে হল তিনি একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। যিনি প্রতিটি কাজের ছক বেঁধে নেন অনেক আগে। যার এতটুকু পরিবর্তন তাঁর পছন্দ নয়। যাকে বলে পুরোদস্তুর প্রফেশনাল।

'ধন্যবাদ! ওয়েলকাম টু জি এস আই শিলং। বড্ড দেরি হয়ে গেল আপনাদের। আমি ভেবেছিলাম, এগারোটার মধ্যে আপনারা পৌঁছে যাবেন। এখন প্রায় দেড়টা। আই ফিল ইউ আর অল ভেরি মাচ হাংগরি।' বললেন শম্ভুবাবু।

সমরজিৎ চক্রবর্তী বললেন, 'মানে গৌহাটিতেই আমাদের একটু দেরি হয়ে গেল।'

এবার আমিই খানিকটা কিন্তু কিন্তু স্বরে বললাম, 'আমার জন্যেই আপনার রুটিনে খানিকটা চিড় ধরল। মানে'—

'জানি। সুজিত আমাকে বলেছে।' আমার মুখের উত্তর লুফে নিয়ে মৃদু হেসে নিজেই জবাব দিলেন শম্ভুবাবু। 'আপনারা কামাখ্যা দর্শনে গিয়েছিলেন। তাই দেরি হল। ভেরি গুড। আজ নববর্ষ। বিহু উৎসব। এই দিনে কামাখ্যা দর্শন একটা বড় পুণ্যকর্ম। ভালই

করেছেন। এবার আমরা রুটিন মত কাজ করি, কেমন?’ বলেই তাঁর রুটিনও শুনিয়ে দিলেন তিনি।

বুঝলাম, আমাদের প্রথম কাজ হবে এখানকার অরুণাচলের গেস্ট হাউসে গিয়ে তলপিতলপা রেখে একটু ফ্রেস হয়ে নেওয়া। তারপর কোন একটা রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ। বিকেল সাড়ে তিনটেয় বসবে প্রেস কনফারেন্স। রাতে শম্ভুবাবুর বাড়িতে ডিনার।

এপ্রিলের মাঝামাঝি। এ সময় শিলং-এর আবহাওয়ার মতিগতি বোঝা ভার। জিওলজিক্যাল সার্ভের দপ্তরে যখন ঢুকেছিলাম, আকাশে তখন রোদ ছিল। আর আধ ঘণ্টা পর যখন বেরিয়ে এলাম তখন চারপাশের পাহাড়ে পাইন গাছের মাথায় নেমে এসেছে, ঘন কালো মেঘের স্তূপ। তার মানে, মিনিট দশেকের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে। আর বৃষ্টি মানেই কনকনে শীত।

হলোও তাই। অরুণাচল গেস্ট হাউসের পথেই বৃষ্টি নামল। প্রথমে প্রবল বর্ষণ। তারপর ঝিরঝিরিয়ে। সেই সঙ্গে শীত।

তা হোক। হাতে সময় কম। গেস্ট হাউসে গিয়ে তলপিতলপা রেখে প্রথমে গরম জলে স্নান। তারপর গরম পোশাক পরে একটা রেস্তোরাঁয় কিছু খেয়েই দৌড়ে আবার জিওলজিক্যাল সার্ভের দপ্তরে। রুটিন মাফিক সাড়ে তিনটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সেখানে।

গিয়ে দেখি শম্ভুবাবু কাগজপত্র নিয়ে প্রস্তুত। তাঁর পাশে বসে রয়েছেন আরও কয়েকজন জিওলজিস্ট।

কোনরকম ভূমিকা না করে তিনি একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁদের সঙ্গে। ‘ইনি ডঃ প্রেম প্রকাশ সৎসঙ্গী। সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জীবাশ্ম বিষয়ক অনুসন্ধানের দায়িত্ব এঁর ওপর। ইনি শ্রীঅতনুবিহারী গোস্বামী। এঁর গ্রুপ কোয়ারটারনারি জিওলজি

নিয়ে কাজ করছেন। শ্রীউদ্ধবকৃষ্ণ বরদলৈ খনিজ পদার্থ সন্ধানে ভারপ্রাপ্ত। ডঃ কমল নন্দী ধাতু পদার্থ বিজ্ঞান, শ্রীনির্মল মজুমদার, ইনজিনিয়ারিং জিওলজিস্ট, শ্রীমুনীশ্বর দত্তের ওপর দায়িত্ব ড্রিলিং-এর। এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরিচয়ের প্রথম পাঠ চুকতেই পরিষ্কার বুঝতে পারলাম আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক কিছুই ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্যে এখানে কাজে লাগানোর আয়োজন করা হয়েছে। তত্ত্ব কথা থাক। বিজ্ঞানের কোন কোন আঙ্গিনা ভূতাত্ত্বিক রহস্য অনুসন্ধানে কীভাবে সাহায্য করে, সে প্রসঙ্গে পরে আসব। তার আগে, ঠিক ওই মুহূর্তে প্রথম যে প্রসঙ্গটি আমার মনে উঁকি দিয়ে উঠল, সেটা এই। এত যে আয়োজন, আমবা যাঁরা সাধারণ মানুষ, তাদের প্রয়োজন কতটুকু মেটাতে পেরেছে জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়া ?

পরিচয় পর্বের শেষে আমার প্রথম প্রশ্নটি ছিল এই বকম: শম্ভুবাবু, জটিল ভূতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কতটা আগ্রহ, জানি না। তবে যতটুকু জানি, তুটি ব্যাপারে আপনাদের কাজকর্ম নিয়ে তারা আগ্রহ দেখিয়ে থাকে। তারা মনে করে, দেশের খনিজ সন্ধান দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের। এবং দেশের কোথায় কখন ভূমিকম্প হতে পাবে তার পূর্বাভাস দেবেনও আপনারা। এ তু'টি বিষয় নিয়ে ভারতের এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এ পর্যন্ত আপনারা কতটা কাজ করতে পেরেছেন ?

'ভূমিকম্প !' আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটিই লুফে নিলেন শম্ভু সেন। মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হলেন যেন। তারপর খানিকটা স্বগতোক্তির মত কী যেন বলে ফেললেন তিনি। এমনভাবে বললেন, যেন সেকথা নিজেকেই বলা।

মুদ্রাদোষ? জানি না। এরপর আরও কয়েকবার তাঁর সঙ্গে ঘোরাফেরা করেছি। কোহিমা এবং কিমক্রেতে গিয়ে সরকারী অতিথিশালায় তিন তিনটে রাতও কাটিয়েছি একই ঘরে। তখনও দেখেছি, এই কথা বলছেন আবার নিজের মনেই বিড়বিড় করে বকে চলেছেন।

'ভূমিকম্প!' কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন আবার। তারপর বললেন, 'আসুন। দেয়ালে ঝোলানো ওই মাপটা দেখলেই এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক পরিস্থিতিটা বুঝতে পারবেন।

বিরাট এক রঙীন মানচিত্র। উত্তরে অরুণাচল। তারপর নিচের দিকে পর পর সাজান আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর এবং মিজোরাম।

শম্ভুবাবু বললেন, এই প্রদেশগুলি নিয়েই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, এবং পুরো অঞ্চলটাই ভূমিকম্পের প্রাণকেন্দ্র। ভূকম্পন এদিকে প্রায় সব সময়ই চলছে। তবে ১৮৬৯, ১৮৯৭, ১৯৩০ এবং ১৯৫০ সালে যে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়ে গেছে ইতিহাসে তাদের নজির বড় অল্প। বিশেষ করে ১৯৫০ সালের ১৫ অগাস্ট যা ঘটেছিল অত বড় বিধ্বংসী ভূমিকম্প সারা পৃথিবীতে এ পর্যন্ত খুব কমই ঘটেছে। রিখটার স্কেলে ওই ভূকম্পনের মাত্রা ছিল ৮-৫ তার ধ্বংসলীলা—লখিমপুর, ডিব্রুগড় এবং শিবসাগর জেলার প্রায় পনের হাজার বর্গমাইল জুড়ে জীবন এবং সম্পত্তির যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার তুলনাই নেই। এই ভূমিকম্পে কোথাও সৃষ্টি হয়েছে গভীর গর্ত। সেই গর্ত দিয়ে স্তূপে স্তূপে বালি ভূস্তরের বাইরে বেরিয়ে এসে নদী নালার গতিমুখ পালটে দিয়েছে। কোন কোন জায়গায় ঘটেছে চ্যুতি, প্রবল বন্যা। যে সব অঞ্চল বন্যা-অধ্যুষিত ছিল না, এখন সেখানে নিয়মিত বন্যা হচ্ছে।

না। সুদূর অতীতের কথা থাক। গতি একশ' বছরের বেশি সময়ের কয়েকটি উদাহরণই হয়ত যথেষ্ট।

যেমন ধরুন, ১০ জানুয়ারি, ১৮৬৯। আসামের কাছার এলাকায় ওই দিন যে ভূমিকম্প হয়েছিল, তার এপি-সেনটার বা উৎপত্তি স্থল শিলং মালভূমিরই উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে। প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল এলাকায় এই কম্পন অনুভূত হয়। তবে ১২ জুন, ১৮৯৭ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের যেন কোন নজিরই মেলে না। এবারও উৎপত্তি স্থল এই শিলং মালভূমি! এখানকার ডাউকি চ্যুতির প্রায় কাছাকাছি অঞ্চলে। ভূমিকম্পের মাত্রা ৮-৫ রিখটার-এরও বেশি। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, ওই সময় শিলং-এর বহু পাহাড়ের চূড়া ফেটে পড়ে। সেই ফেটে পড়া অঞ্চল থেকে বড় বড় পাথরের চাঁই উর্ধ্বাকাশে প্রক্ষিপ্ত হয়। এই ভূমিকম্পের ফলেই শিলং-এর ব্যাপক অঞ্চলে প্রচুর জলপ্রপাত তৈরি হয়েছিল, তৈরি হয়েছিল তিরিশটিরও বেশি প্রাকৃতিক হ্রদ। কম্পনের পর আরো দশ বছর ধরে পূর্বাঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিতে তার প্রতিক্রিয়া সমানে চলতে থাকে।

'এই ভূমিকম্প আধুনিক ভূকম্পন পরিমাপ বিদ্যার ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের উত্তরণ। বরং বলি নতুন ভিত্তি প্রস্তর।' মন্তব্য করলেন শম্ভুবাবু। 'বিশিষ্ট ভূতাত্ত্বিক আর ডি ওলডজ্যাম এই ভূমিকম্পকালীন যে সব বর্ণনা নথিভুক্ত করে যান তার উপর নির্ভর করে সম্পূর্ণ নতুন একটি তত্ত্বই তৈরি হয়ে গেল। প্রমাণিত হল, ভূমিকম্পের সময় ভূস্তরে দু রকমের কম্পন হতে দেখা যায়। অনুদৈর্ঘ্য বা লংগিচুডিনাল এবং অনুপ্রস্থ বা ট্রানসভার্স। প্রথমটির ক্ষেত্রে কম্পন যে দিকে এগিয়ে যায়, ভূস্তর সে-দিক বরাবর কাঁপতে থাকে। দ্বিতীয়টির বেলায়, কম্পন যে দিকে এগোয়, ভূস্তর তার লম্ব বরাবর কেঁপে চলে। তরঙ্গ

দুটির বেগ পৃথক হওয়ায় ভূকম্পন জ্ঞাপক যন্ত্রে তাদের উপস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ধরা পড়ে।

বার বার। বহুবার। ৮ জুলাই, ১৯১৮ আসামের শ্রীমঙ্গল থেকে মাত্র সাড়ে তিন মাইল দূরে, দক্ষিণে, পাললিক স্তরের নিচে ধরা পড়ল উৎপত্তিস্থল। সে কম্পন ছড়িয়ে পড়ে আট লক্ষ বর্গ মাইল এলাকায়। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৩; ৩ জুলাই, ১৯৩০; ১৪ আগস্ট, ১৯৩২; ২১ জানুয়ারি ১৯৪১; ২৩ অকটোবর, ১৯৪৩; ২৯ জুলাই ১৯৪৭। অবশেষে ১৫ অগাস্ট, ১৯৫০ এর সেই প্রলয়ঙ্কর ঘটনা। এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি-স্থল জানার জন্যে মার্কিনদেশ, ফ্রান্স এবং ভারতীয় ভূতাত্ত্বিকরা যুগপৎ চেষ্টা করেছিলেন। তাতে দেখা যায়, এবারকার উৎপত্তিস্থলটি ছিল সইদিয়া থেকে প্রায় দুশ মাইল দূরে। অরুণাচলের মিসমি-পার্বত্য অঞ্চলে।

শম্ভুবাবু বলে চললেন, কেন ভূমিকম্প হয়, সে নিয়ে ব্যাখ্যা আছে অনেক। তবে ভারতের এই পূর্বাঞ্চলের ভূমিকম্পগুলির প্রধান কারণ হয়ত এই: আপনারা দেখেছেন, কেউ কেউ ঘরের মেঝে তৈরি করেন শ্লেট দিয়ে। খণ্ড খণ্ড শ্লেট দিয়ে ঢেকে দেন মেঝে। আধুনিক ভূ-তাত্ত্বিকরা মনে করেন, পৃথিবীর ভূস্তরও কতকটা সেই রকম। খণ্ড খণ্ড ভূখণ্ড পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে থেকে সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর তাবৎ ভূভাগ। মুশকিল এই, এই ভূখণ্ডগুলি কেউ স্থির নয়। অত্যন্ত ধীর গতিতে এরা সঞ্চরণ করে চলেছে। আর এই সঞ্চরণের সময় সেই খণ্ড খণ্ড ভূখণ্ড, ভূতাত্ত্বিকরা যাদের বলে থাকেন প্লেট, সেইসব প্লেট কখনও সামনা-সামনি এগিয়ে এসে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করে কখনও পাশাপাশি জুড়ে থাকা দুটি প্লেট পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে যায়, আবার কখনও বা একটি প্লেট এগিয়ে এসে অপর

একটি প্লেটের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ভূস্তরের গভীর অঞ্চলে ধাবিত হয়। এধরনের ঘটনার সময় পরস্পর দুটি প্লেটের সীমানা অঞ্চলই হয় যত সব বিপত্তির মূল কারণ। ওই সব অঞ্চলকে ঘিরেই গড়ে ওঠে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। দুটি প্লেটের পরস্পর আঘাত, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, কিংবা পাশ থেকে প্রচণ্ড চাপে ঠেলা মারার সময় কঠিন ভূস্তরের বিস্তৃত অঞ্চলে যে চাপ সৃষ্ট হয় তার প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত ভূকম্পন হিসেবে ধরা পড়ে। মিজোরাম, মণিপুর এবং নাগাল্যাণ্ড এমন একটি এলাকার ওপরই দাঁড়িয়ে। শিলং-এর উপত্যকার ওপর দিয়ে আসামের দিকে এগিয়ে গেছে ভূকম্পন সম্ভাবনার বেশ বড় রকমের একটি এলাকা। ব্রহ্মপুত্রের পাললিক অঞ্চলও বিপজ্জনক কম নয়। তাই বলছিলাম, সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলই ভূকম্পন অধ্যুষিত এলাকা। আশার কথা শুধু এই, এপর্যন্ত যত জায়গায় উৎপত্তিস্থলের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের বেশির ভাগই গভীর অরণ্য অঞ্চল শহর লোকালয় থেকে দূরে। তাই এর জন্যে সম্পত্তি এবং জীবনের ক্ষয় ক্ষতি তেমন হয়ত হয় নি।

হয় নি ঠিকই, তাই বলে দায়িত্ব তো এড়ান যায় না? ভারতের এই পূর্বাঞ্চলে এক সময়ে জনবসতির সংখ্যা ছিল কম। এখন সেকথা কিন্তু বলা চলে না। অতএব নিরাপত্তার দিকটিও তো এখন ভাবতে হবে?

একথা ভেবেই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটা ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে কাজে হাত দিয়েছেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার ভূ-তাত্ত্বিকরা। বিমান বাহিনীর প্লেনের সাহায্যে আকাশ থেকে ব্যাপক অঞ্চলের ছবি তোলা হয়েছে। হচ্ছেও। ছবি তোলা হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড থেকে শুরু করে

অরুণাচলের দীর্ঘ সীমানা বরাবর। এই সব ছবির সাহায্যে এ অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক প্রকৃতির একটি সুষ্ঠু চেহারা দাঁড় করানর চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে বড় বড় চ্যুতি। সেই সব চ্যুতির কোথায় কোথায় ভূকম্পনের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা জানার জন্যেও কাজ শুরু হয়েছে।

এটা গেল একটা দিক। মেঘালয়ের খনিজ সম্পদও কি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়?

খাসি এবং জয়ন্তিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে কয়লাখনি। উম রিলাং, সিরমাং, বাপুং, মওসিনরাম, শেলা-মাওলং চেরাপুঞ্জি-লাইটি্‌রংগিড পিন্নুরস্লা, লাকাডং, লুমসং, টেংগ্রা, প্রভৃতি জায়গায় গেলে চোখে পড়বে প্রচুর কয়লাখনি। গারো পাহাড়ের দরাংগিরির পশ্চিমে এবং সিজুতে গেলেও দেখতে পাবেন কয়লা। এছাড়া চীনে মাটি, চুনা পাথর প্রচুর। দেখতে পাবেন মেওসিনরাম, ভোলাগঞ্জ, জয়ন্তিয়া পাহাড়ের লুমসং, খাতুম, আরও কত জায়গায়। আছে, আরও অনেক কিছু আছে। সে বিবরণ সময় মত দেব।

ভূতাত্ত্বিকদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করতে রাত প্রায় আটটা। শম্ভুবাবুর বাড়ি থেকে ততক্ষণে ঘন ঘন টেলিফোন। খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে। চটপট চলে আসুন। তা ছাড়া আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। হয়ত অল্পক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে। আর বৃষ্টি মানেই শীতের বাড়াবাড়ি।

উদ্ধবকৃষ্ণ বরদলৈ বললেন, 'আজ বরং থাক। মাঝে মাঝে আমাদের কারোর না কারোর সঙ্গে দেখা হবেই। তখন অনেক কিছুই আমরা আলোচনা করতে পারব।'

'সেই ভাল।' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, সেই ভাল।' পেছন থেকে আমার কথার প্রতিধ্বনি করলেন অজিতবাবু। তাঁর গলার শব্দ শুনেই বুঝলাম ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি।

অতএব 'মন, চল যাই নিজ নিকেতনে।'

তার আগে অবশ্য খাওয়া। আর খাওয়ার কথা মনে পড়তেই মনে হল, তখন সবচেয়ে মূল্যবান কোন কাজ যদি থাকে, তবে ওই খাওয়া। সত্যি কথা বলতে কী, খিদেও পেয়েছিল খুব। বিকেলের দিকে 'লাঞ্চ' নামক যে বস্তু খেয়েছিলাম তা অনেকক্ষণ হাওয়া হয়ে গেছে। আর হাওয়া হওয়া ছাড়া থাকবেই বা কতক্ষণ? এক খুরি ভাত এবং দু টুকরো মাংস। পার্বণী আট টাকা। ওই দাম শোনার পর অতিরিক্ত আরও এক খুরি ভাত এবং দু টুকরো মাংসের কে অর্ডার দেবে, বলুন? শম্ভুবাবুর নেমন্তন্নকে মনে হল, যেন 'মুশকিল আসান'।

পথে যেতে যেতে অমরবাবু বললেন, 'বেজায় দাম, মশায়। সব জিনিসেরই বেজায় দাম। বাজারে মাছ পাবেন না। বড় মাছ বলতে যা, তার বেশির ভাগই আসে বাইরে থেকে। আপনি এখানে চিল্কা, কিংবা রাজস্থানের মাছও পাবেন। লোকাল ফিস বলতে ওই পাহাড়ে নদীর ছোট ছোট মাছ। পাবদা, বাটা, এই সব। খাসিরাই নিয়ে আসে। আর যা মেজাজ ওদের! মুখ দিয়ে ওদের একবার যে দাম বেরোবে সেই দামেই নিতে হবে আপনাকে। এক পয়সা কম নয়। প্রথম যখন এদিকে আসি, ভেবেছিলাম মুরগী-টুরগী খুব পাওয়া যাবে। শস্তাও হবে নিশ্চয়। হা, ভগবান! শস্তা! এ ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। ওজনটোজন নেই। দেখলেন, একজন খাসি ঠ্যাং-এ ঝুলিয়ে নিয়ে এল এক মুরগী। এক কিলোও হয়তো হবে না। দাম জিজ্ঞেস

করলেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, কুড়ি টাকা। মশায়, মনে হল, পায়ের রক্ত যেন মাথায় চড়ে গেল মুহূর্তে। ভাবলাম, মারি ওর গালে এক থাপ্পড়। চিটিংবাজীর জায়গা পাও না। প্রথম প্রথম খুবই বিশ্রী লাগত। পরে দেখলাম, এটাই এদিকের রেওয়াজ। শুধু মাছ মাংস নয়, সব কিছুই মাগ্‌গি। তবে হ্যাঁ, গাঁয়ে যান, দেখবেন, লোকগুলি খুব নিরীহ। অন্তত গায়ে পড়ে ঝগড়া করে না। গোলমাল শুধু এই শহুরেদের নিয়ে। যারা খাসি নয়, তাদের বড় একটা পছন্দ করে না এরা।'

শম্ভুবাবুর বাড়িতে খাওয়াদাওয়া সেরে গেস্ট হাউসে ফিরলাম রাত প্রায় এগারোটায়। মাঝে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় শীত পড়েছিল। পথ নির্জন। দোকানপাট প্রায় সবই বন্ধ। খোলা শুধু দু একটি বার এবং হোটেল। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ট্রাক অথবা বাসের ড্রাইভার এবং যাত্রীদের জন্যেই হোটেলগুলি খুলে রাখা হয় সারা রাত। বারগুলির ভেতর থেকে আসছে বিলেতী বাজনার শব্দ। দু'একটির সামনে কমবয়েসী ছেলেমেয়ের ভিড়। কিছু বড় লোকের ছেলেমেয়ে। তাদের অনেকেই নেশায় বুঁদ।

আলাপ হয়েছিল একজনের সঙ্গে। বছর তিরিশ বয়েস। ভদ্র-লোকের কাঠের ব্যবসা। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই বুঝলাম বেশ খানিকটা বে-হেড হয়ে রয়েছেন।

পথ চলতি আলাপ। একটি পানের দোকানে। এক খিলি পান মুখে পুরে লাইটারে যখন সিগারেট ধরাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার মনে হল, একটি নয়, আমার লাইটারের আগুনের সামনে যেন আরও একটি সিগারেট। নিজেরটিতে আগুন ধরানো শেষ হতেই দ্বিতীয় সিগারেটটিতেও আগুন ধরালাম আমি।

তারপরই শুনতে পেলাম, থ্যাঙ্ক্যু!

'বুঝলেন কী না, এই একটু ওখানে গিয়েছিলাম।' সামনের বারটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন তিনি।

আমি 'বুঝলাম'—এমন একটি ভাব দেখিয়ে মৃদু হাসলাম।

অতঃপর কয়েক মিনিট সংলাপ।

নিজের মনেই বলে গেলেন: বিজনেস করি, মশায়। কাঠের কারবার। পয়সা আছে ঠিক, কিন্তু লাইফ হেল। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরো, কাঠ আর পাথুরে পথ। বাঁচা যায় এভাবে? তাই মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই এদিকে চলে আসি। একটু পান ভোজন। অ্যাণ্ড দে আর সাইটিজ। খাসি গার্লস, বুঝলেন কি না। দে আর প্রেটি!

দেখ ব্যাপার! এক খিলি পান খেতে এসে এখন কি সারা রাত গল্প শুনতে হবে?

এ সব ক্ষেত্রে বেশি কথা বলতে নেই। কথা বললেই প্রতিপক্ষের কথা বেড়ে যায়। বরং চুপ করে থাকলে এক সময়ে ওরাই কেটে পড়ে। পড়লও তাই।

ছোট্ট অভিজ্ঞতা। পরে এক ভদ্রলোককে শুনিয়েছিলাম। শোনার পর তিনি মন্তব্য করেছিলেন, এ আর এমন বিচিত্র কী! কামিনী এবং কাঞ্চন নিয়েই তো ইতিহাসের বড় বড় ঘটনা। শোনেন নি, যুদ্ধের সময় সেনারা দুটি জিনিস লুঠ করতে আসে। মেয়েছেলে এবং টাকা পয়সা। আর এইভাবেই তো শেকড় গাড়ে যত সব বিদ্বেষ।

ঠিক একই ধরনের কথা শুনেছিলাম অরুণাচলেও। সে প্রসঙ্গে পরে আসব।

পর দিন ঘুম ভাঙল সকাল ছটায়।

ঝকঝকে সকাল। মনে হল, এরই মধ্যে বেলা অনেক বেড়ে গেছে। আমাদের গেস্ট হাউসটা এক পাশ থেকে দেখলে মনে হবে, যেন একটা টিবির ওপর দাঁড়িয়ে। টিবির ঢাল নেমে গেছে নীচের উপত্যকা বরাবর। এদিকটার ঢালে থরে থরে সাজানো গরীব মানুষদের বসতি। বেশির ভাগই নেপালী। উপত্যকার ওপারে খাড়াই পাহাড়। পাইনের জঙ্গলে আচ্ছন্ন। গেস্ট হাউস থেকে অল্প দূরে ওয়ার্ড লেক। তার ধারে মখমলের মত ঘাসের শয্যা। তার জলে বিভিন্ন বর্ণের মাছ। মাছগুলি টুরিস্টদের হয়তো চেনে। তাই জলের ধারে কেউ এসে যখন দাঁড়ায় তারা সেখানে ভিড় করে। হয়তো কিছু খাবারের আশায়। খাবার পায় বলে। এই লেকের ধারে গিয়ে বসুন। মনে হবে, জীবনের সব ক্লান্তি, সব ভাবনা কোথায় চলে গেছে। প্রকৃতি এখানে প্রশস্ত। শান্ত।

আছে হাইড পার্ক। আছে পাথরের খাঁজে খাঁজে অজস্র জলপ্রপাত। চলতে চলতে কখনও তাদের চোখে পড়ে, কখনও বা পাথর অথবা ঝোপঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়। তখন কানে আসে তাদের একটানা ঝিরঝির শব্দ। দেখবেন, স্প্রেড-ঈগল, বিশপ, বীডন, এলিফ্যাণ্ট এবং সুইট জলপ্রপাত। এদের নিরুপম সৌন্দর্য স্কটল্যাণ্ডের সৌন্দর্য মনে করিয়ে দেয় বলেই এক সময়ে শিলংকে বলা হত, 'স্কটল্যাণ্ড অব দ্য ইস্ট'।

ব্রেকফাস্ট সেরে সকাল আটটার মধ্যেই আমরা প্রস্তুত।-শম্ভুবাবু এলেন। সঙ্গে সুজিতবাবু, অমরবাবু এবং সমরজিৎ চক্রবর্তী।

শম্ভুবাবু তাঁর স্বভাবসুলভ ব্যস্ততা নিয়ে বললেন, 'শরীর ফিট তো? চলুন, আজ আপনাকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোকে নিয়ে যাই।

রডোডেনড্রন দেখবেন, চলুন। রঙীন ছবি তুলব।’

রডোডেনড্রনের কথা শুনতেই মনটা নেচে উঠল।

শিলং-এ আজ বেশিক্ষণ কাটানো যাবে না। কারণ, আজকের প্রোগ্রামটি বড় লম্বা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের ভেলাগঞ্জের পথে রওনা হতে হবে।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই রওনা হলাম। হাইওয়ে ধরে লেডী হায়দারি পার্কের পাশ দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে গেল। বাঁদিকে লাবং। একটু এগিয়েই হ্যাপি ভ্যালি। প্রশস্ত উপত্যকা। শিলং বেড়ে চলেছে। নতুন নতুন কলোনী গড়ে উঠছে। হ্যাপি ভ্যালি তার একটি বড় রকমের উদাহরণ। এদিকটায় ধনীদের পল্লী।

শিলং-ডাউকি পথ ধরে আমরা চলেছি। এগিয়ে যাচ্ছি আপার শিলং-এর দিকে। পথের উচ্চতা বাড়ছে। সেই সঙ্গে জনবসতিও কমছে। পথের দু পাশে শুধু নেপালীদের ঘর-বাড়ি। দু-একটি খাসি কলোনীও আছে দু’এক জায়গায়।

এ দিকটায় ভীষণ জলকষ্ট। কাছে কোলে ঝরনা নেই। পাম্প করে এত উঁচুতে পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জল সরবরাহ করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। অতএব সাধারণ মানুষ যারা, তারা জলের জন্যে নির্ভর করে ভিন্নতর উৎসের ওপর। সে উৎস বৃষ্টি। এ দিকে বৃষ্টি নামে যখন তখন। সেটুকুই যা ভরসা। বৃষ্টির জল সংগ্রহ করার জন্যে ওরা বড় বড় বাঁশ লম্বা বরাবর আধখানা করে চিরে নেয়। চেরা বাঁশের ভেতরে গাঁটের কাছে যে পাঁচিলের মত অংশ থাকে তাদের পরিষ্কার করে। লম্বা বাঁশের খণ্ডটি তখন তৈরি হয়ে যায় একটি নালার মত। এবার বাঁশটিকে তারা ঝুলিয়ে দেয় ঘরের টিনের চালের সঙ্গে। বৃষ্টির জল চাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ে বাঁশের নালায়। আর নালা

থেকে ঝরে পড়ে নীচে বসিয়ে রাখা একটি পাত্রে। এই জলেই স্নান, এই জলেই গৃহস্থালির কাজ। এই জল তারা পানও করে।

শিলং-পিকের দূরত্ব মূল শহর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার। এ অঞ্চলে এটাই উচ্চতম শৃঙ্গ। উচ্চতা ৬৪৩৩ ফুট। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে দূরে হিমালয় শৃঙ্গের বরফ দেখা যায়। সে দৃশ্য আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয় নি। দূর দিগন্ত তখন মেঘে ঢাকা ছিল। এদিকটা জঙ্গলে ভরা, রিয়াত লাবং ফরেস্ট। কাছেই বিশফ জলপ্রপাত। এখানকার জল সুদূর বরপানিতে গিয়ে কপিলি নদীতে মিশছে।

এ অঞ্চলটা সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে পড়ে। এখানে রয়েছে সেনাদলের ছাউনি। শক্তিশালী মাইক্রোওয়েভ টাওয়ার। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এদিকে আসতে গেলে কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়।

শম্ভুবাবুর গাড়ির সামনে ছিল অশোক স্তম্ভ। অতএব মিলিটারি চেকপোস্ট পার হতে অসুবিধে হল না। আমাদের পেছনে দুটি জিপে আর সবাই অনুগামী হলেন। চেকপোস্ট থেকে ডান দিকে ঘুরে জঙ্গল। পাইন এবং আরও নানান নাম-না-জানা গাছ। এই পথ ধরে মিনিট পাঁচেক চলার পর আমাদের গাড়ি একটি ঢিবির মত জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

'এই হল শিলং পিক। আর ওই যে লম্বা লম্বা গাছ, পাতার ফাঁকে অদ্ভুত লাল রঙের ফুল। গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে ঝুলছে—ওই রডোডেনড্রন! ইস। ফুলই যে নেই দেখছি।' গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে চক্কর দিতে লাগলেন শম্ভুবাবু। সঙ্গে সঙ্গে ক্লিকের পর ক্লিক্। নাগাড়ে রঙীন ছবি তুলতে লাগলেন।

রডোডেনড্রন!

নামটা কানে যেতেই কেমন যেন এক শিহরণ। পলকে চাইতেই মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র কয়েকটি কলি : প্রভাত-বেলায় হেলাভরে করে / অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ / উদ্ধত যত শাখার শিখরে / রডোডেনড্রন গুচ্ছ। নিবারণ চক্রবর্তীর এই বর্ণনার অনুপ্রেরণা ছিল লাবণ্য। আর আমার প্রেরণা? সঙ্গে তো কয়েকজন জিওলজিস্ট! ডরোথি ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'ইয়ারো ভিজিটেড'-এর কথা মনে পড়ল। স্কটল্যাণ্ডের শীর্ণা পার্বত্য সেই নদীকে দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন : 'ইজ দিস দ্য ইয়ারো অব হুম মাই ড্রিম চেরিসড?' পরে বুঝতে পেরেছিলেন, 'ইয়ারো'কে দেখতে হলে চাই অন্য চোখ। হৃদয় এবং কল্পনা।

শুনেছিলাম, সার্থক শিল্প সব সময়ই নাকি স্বতঃস্ফূর্ত হয়! কথাটা যে কতখানি সত্যি তার পরিচয় পেয়েছিলাম একবার প্যারিসের ল্যাভর মিউজিয়ামে। মনে পড়ে, বিরাট ঘর। তার দেওয়াল জুড়ে ঐতিহাসিক সেই ছবি : লাস্ট সাপার। তার সামনে দাঁড়িয়ে বুকটা যেন ধড়াস করে উঠেছিল আমার। কতকাল আগে আঁকা। তবু ছবির সেই চরিত্রগুলি এত জীবন্ত? মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল সেই 'সাপারে' আমি যেন একজন অতিথি। সেই প্রথম বুঝেছিলাম, যাঁরা বলেন, ছবির গ্রামার পড়ে তবে ছবির চরিত্র বুঝতে হয়, কথাটা হয়তো ঠিক নয়। সার্থক শিল্পের একটা শাশ্বত আবেদন আছে। এবং তা কালোত্তীর্ণ। আর প্রকৃতি নিজেই যেখানে শিল্পী, সেই শিল্পে আমি নিজেই তো অঙ্গীভূত?

হয়তো এই কারণেই সবুজ পাতার ফাঁকে স্নিগ্ধ লাল রডো-ডেনড্রনের গুচ্ছের দিকে চেয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ কানের পর্দায় কে যেন একটা পাথর ছুঁড়ে মারল।

কে যেন পাশ থেকে বলল, য্যা! য্যা! এর জন্যে এত সব কাণ্ড! এত পয়সা খরচা করে সেই শিলং থেকে এই বুনো ফুল দেখতে আসা?

চাইতেই দেখি কখন দুটি পরিবার এসে সেখানে হাজির হয়েছে। দুটি স্বামী দুটি স্ত্রী। এবং তাদের জনা তিন বাচ্চা। মহিলারা খুশি। কিন্তু ওঁদের মধ্যে এক ভদ্রলোককে দেখে মনে হল, যেন খুব বিরক্ত। দেখলাম, তিনিই তাঁর স্ত্রীকে বকছেন।

চোখাচোখি হতেই ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 'আপনারাও বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি? উঃ, মশায়, এখানে আসতে কী ধরল। গাড়ি পাওয়া যায় না। পেলেও ড্রাইভাররা চড়া ভাড়া চায়। কিন্তু এই রডোডেনড্রনের মধ্যে কী এমন আছে বলুন তো? আর ওই যে, 'এলিফেন্ট ফলস' না কী? আরে, রামো, রামো! স্রেফ পাথরের ফাঁক দিয়ে ঝিরঝির জল পড়ছে। এই হল 'এলিফেন্ট ফলস'। আমি ভেবেছিলাম, কী না, কী। এর জন্যে এত পয়সা খরচা?'

কথা শুনে কী আর বলব আমি। এতক্ষণ শম্ভুবাবু ক্যামেরায় ক্লিক করে চলছিলেন। তাঁর দিকে চাইতেই দেখলাম, তিনি বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। চোখাচোখি হতেই আমাকে লক্ষ করে চোখ টিপলেন তিনি। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'উটি কে? আমদানি কোত্থেকে?'

'মনে হচ্ছে কলকাতা—!' নীচু গলায় উত্তর দিলাম।

'আমরা আসছি কলকাতা থেকে। ব্যাঙ্কে চাকরি করি। ছুটি পেলাম, আর তার সঙ্গে আসা-যাওয়ার ভাড়াটাও স্যাংশন হয়ে গেল। তাই ভাবলাম. যাই শিলং থেকে ঘুরে আসি। শিলং-এর কথা সবাই বলে কী না—?' সম্ভবত আমার উত্তরটি কানে যাওয়ায় ভদ্রলোক নিজে থেকেই কথাগুলি বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে শম্ভুবাবুর স্বগতোক্তি শোনা গেল। বিড়বিড় করে নিজেকেই যেন বললেন তিনি : অ! নোট গুনতে গুনতে আর খাতা লিখতে লিখতে হিসেব গুলিয়েছে। ভেবেছিল ভিক্টোরিয়া, নায়াগ্রা একটা কিছু হবে। ওদের হিসেবটা অঙ্কে কী না?

প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিলাম এখানে। কিছুটা নীচে নেমে এলিফ্যাণ্ট ফলসও ঘুরে ঘুরে দেখলাম। তার জল কখনও পাথরের গা দিয়ে ঝরে পড়ছে। কখনও একটা বিরাট পাথরের চাঁই-এর মধ্যে এপাশ থেকে ঢুকে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

লোকালয় থেকে এতটা দূরে ছোট্ট একটি চা'য়ের দোকানও দিয়েছে একটি ছেলে। সেখানে চা, ডিম সেদ্ধ এবং কয়েক খণ্ড বিস্কুট খেয়ে আবার যাত্রা।

তখন প্রায় সাড়ে দশটা।

শম্ভুবাবু শিলং ফিরে গেলেন। আর দুখানা জিপ নিয়ে সুজিতবাবু অমরবাবু এবং সমরজিৎ চক্রবর্তী রওনা হলাম ভোলাগঞ্জ। সিলেট সীমানায়। সঙ্গে ক্যামেরা হাতে অজিতবাবু।

আঁকাবাঁকা পথ। মাঝে মাঝে পাহাড়ের প্রাচীর। এবার গাড়ি ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক হবে হয়ত।

আমার পাশেই বসে ছিলেন সুজিতবাবু।

আমরা মাওকডকে এসে গেছি। কাছেই ডিমপেপ। 'মিঃ কর, আসুন, এখানে আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাই।' কথা বললেন সুজিতবাবু। বলেই ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন, ডান দিকের ওই পথ ধরে ওই ডাকবাংলোর কাছে একটু চলো লিনডো।

আমরা চলেছি চেরাপুঞ্জির পথ ধরে। একটি বাঁকের কাছে এসে

লিনডো ডান পাশের একটা বাঁকা পথ ধরল। এবং মিনিট তিনেকের মধ্যেই পাহাড়ের ওপর একটা সমভূমির ওপর এসে আমরা হাজির হলাম।

জিপ থেকে নামলাম আমরা। বেশ ঠাণ্ডা।

সামনে বেশ বড়সড় একটি বাংলো। টালির চাল। বিলেতী প্যাটার্নের বাড়ি।

'দ্য ওলডেস্ট ডাকবাংলো ইন দ্য ইস্টার্ন রিজিয়ন।' বললেন সুজিতবাবু। ভাবতে পাবেন, 'এখানে ফ্লাইং সসার নেমেছিল?'

তার মানে? ফ্লাইং সসার মানে উড়ন্ত পিরিচ? যা নিয়ে গত দু তিন দশক ধরে সারা পৃথিবী জুড়ে হইচই চলছে? দূর নক্ষত্র জগতের কোন অধিবাসী যাতে চড়ে মাঝে মাঝে পৃথিবীতে আসে আপনি নিশ্চয় তার কথা বলছেন না?

তার কথাই তো বলছি। গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন সুজিতবাবু। তারপর বললেন, দাঁড়ান, সেই চৌকিদারটিকে এখানে পাওয়া যায় কিনা একবার দেখি। এটা পি ডব্লু ডি'র বাংলো। এরই চৌকিদার ছিল সে। জানি না বেঁচে আছে, কী না?

বাংলোর কিছু দূরে কয়েকটি বাড়ি। একটি লোককে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

সুজিতবাবু লিনডোকে ওই লোকটিকে ডাকতে বললেন।

লোকটি এল।

খাসি। বছর পঞ্চাশ বয়েস। ভাঙা ভাঙা হিন্দী বোঝে। সুজিতবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন শোন, আজ থেকে দশ এগারো বছর আগে এখানে যে চৌকিদার ছিল, সে এখন কোথায় আছে?

কে? পূর্ণকুমারের কথা বলছেন? সে তো এখানেই আছে, হুজুর?

ওই তার ঘর। বলল লোকটি।

'পূর্ণকুমার বাড়ি আছে?'

'আছে। ডাকব?'

'ডাকো দেখি একবার।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সঙ্গে একটি বৃদ্ধ এসে সেলাম করে দাঁড়াল আমাদের সামনে। বুঝলাম হঠাৎ এত গাড়ি এবং পোশাকী লোক দেখে সে যেন একটু ঘাবড়ে গেছে। বয়েস প্রায় সত্তরের মত হবে। খাসি।

'কী নাম তোমার?' সুজিতবাবুর জিজ্ঞাসা।

'পূর্ণকুমার রায়, হুজুর।' সে বলল।

'আচ্ছা পূর্ণকুমার তুমি এই ডাকবাংলোয় অনেক দিন চৌকিদারি করেছ, কেমন?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'আচ্ছা, তোমার মনে আছে, আজ থেকে প্রায় দশ এগারো বছর আগে আকাশ থেকে কী যেন একটা আলো এসে নেমেছিল এখানে?'

সুজিতবাবুর কথায় লোকটি মৃদু হাসল। একটু অন্যমনস্কও হল যেন। বলল, 'সে তো অনেক দিনের কথা।'

'জানি। সেই কথাটাই তো তোমার কাছে শুনতে চাই।'

'এদিকে আসুন বাবু।' বলে আমাদের নিয়ে বাংলোর লনের এক প্রান্তে এসে দাঁড়াল পূর্ণকুমার। যেখানে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম, সেখান থেকে পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে অনেক নীচে। অন্তত সাত আটশ' ফুট। সেখানে দেখা গেল একফালি সলতের মত পার্বত্য নদী। কোন গাছপালা নেই কাছাকাছি।

সেই জলের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, 'ওখানেই তো নেমেছিল সেটা। তখন সাঁঝের বেলা। এই ডাকবাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ দেখলাম, আলোর মত কী যেন ছুটে এদিকে ধেয়ে আসছে। কোন ভুল হয়নি আমার। পরিষ্কার দেখলাম একটা লম্বা চোঙার মত জিনিস। তার গা থেকে আলো ফুটে বেরোচ্ছে। চোঙাটা, এই যে, আমরা যেখানে এখন দাঁড়িয়ে আছি, এখান থেকে কিছু দূর পথে আকাশ থেকে নেমে সোজা গিয়ে হাজির হল ওই নদীটার ওপর। তবে নামে নি নীচে। নদীর ওপরই ঝুলন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। আর কী তার হিস্ হিস্ শব্দ। মনে হল জল শুষছে কোন পাগলা হাতী। খুব সামান্য সময়ের জন্যেই ছিল। তারপর আবছা আলোয় দেখলাম, সেটা সেই নদী থেকে উঠে একেবারে চোখের পাতা পড়তে না পড়তে ওই গাছগুলির পাশ দিয়ে পুব বরাবর আকাশের দিকে চলে গেল। আর দেখতে পেলাম না। যাওয়ার সময় কিছু গাছ কেটে ফেলে যায়।

পূর্ণকুমার যে জায়গাটা দেখাল তার দূরত্ব এখান থেকে এক ফার্লং-এর মত হবে। অর্থাৎ যে দূরত্ব থাকলে বড়সড় কোন জিনিসকে চোখের ভুল হওয়ার কথা নয়। পূর্ণকুমার বলল, 'মোটামোটা গাছ, হুজুর। এখন যেমন দেখছেন ঠিক তেমনই। ব্যাপারস্যাপার দেখে আমার তো ভিরমি খাওয়ার মত অবস্থা। পরদিন ওখানে গিয়ে দেখি, বেশ কয়েকটি গাছ কাটা অবস্থায় পড়ে আছে। দেখে মনে হল কে যেন করাত চালিয়ে পরিষ্কার করে গাছগুলি কেটে গেছে।'

১৯৬৬-৬৭ সালের ঘটনা। ঘটনাটা তখন আসামের কোন একটি ইংরেজি দৈনিকে বেরিয়েও ছিল। অনেকের ধারণা এটা একটা ফ্লাইং সসার। মন্তব্য করলেন সুজিতবাবু।

পূর্ণকুমারের দিকে চাইলাম। সে নির্লিপ্ত। এ ঘটনার কথা তার মনে এখনও পরিষ্কার—যেন গতকালের কোন কাণ্ড। এখন তার এই বয়েসেও বিশ্রাম নেই। ১৯৭৫-এর সেপ্টেম্বরে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর যৎসামান্য চাষের ওপর নির্ভর করে জীবন চলছে তার। ভেবেছিল অবসর নেওয়ার পর সরকার থেকে কিছু টাকা পাবে। দান না। হকের টাকা। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড-এর টাকা। কিন্তু দেখতে দেখতে বছর তিন চলে গেল সে টাকা এখনও পায়নি। কবে পাবে, জীবিত অবস্থায় আদৌ পাবে কী না তাও জানে না।

এই বঞ্চনা সে কতখানি উপলব্ধি করে জানি না। করলেও কে ভাবছে সে কথা? সরকারী অব্যবস্থা কখনও কখনও ব্যক্তিবিশেষকে কী নিদারুণ পরিস্থিতির মধ্যে ছুঁড়ে দিতে পারে পূর্ণকুমার তার একটি উদাহরণ মাত্র।

আর এর কয়েক ঘণ্টা পরই সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আরও একটি উদাহরণের। একটি তরুণী। তারুণ্যের পূর্ণতায় জীবনে যখন ভরা জোয়ার ঠিক সেই সময় মানুষকে কখনও কখনও যে কতখানি আপস করে চলতে হয়, সে উদাহরণ তারই সাক্ষ্য। সেটা ভোলাগঞ্জে। যেখানে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইনডিয়া চালাচ্ছে চুনা পাথরের বুকে কঠিন ড্রিলের কাজ। আর মানুষ দিন গোণে, একটির পর এক।

পাঁচ

পেছনে পড়ে রইল মাওকডকের ডাকবাংলো। বাঁ পাশে গিরিখাত। সেখানে সলতের মত নদীটি নীরবে বয়ে চলেছে। আর আমাদের ডান পাশে জীপের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চৌকিদার পূর্ণকুমার। দারিদ্র্য তার সর্বাঙ্গে। রিক্ততায় যেন পাথরের মূর্তি। মাওকডকের এই পাহাড়ের মত তার কাছে অতীতই একমাত্র বাস্তব। সেই অতীতকে নিয়েই তার বর্তমান।

পকেট থেকে ছোট্ট একটা নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, পূর্ণ, আমরা এবার যাচ্ছি। একটু মিষ্টি খেও।

কথাটা বলেই মনে হল, নিজের গালেই কষে থাপ্পড় মারলাম আমি। মিষ্টি! মিষ্টি পাবে কোথায় সে এখানে? মাওকডক কি শহর যে, এখানকার পথের দুধারে সাজান থাকবে মিষ্টির বিপণী? এক মুঠো চাল জোটানই তো এখানে শক্ত। যেমন শক্ত পাথর নিংড়ে জল বের করা?

দু হাত পেতে টাকাটা নিয়ে মাথা নোয়ালো পূর্ণ চৌকিদার।

কৃতজ্ঞতা? হয়ত তাই। কিন্তু কিসের এ কৃতজ্ঞতা? যে মানুষের দিনে এক মুঠো হয়ত খুদ জোটে না তাকে মিষ্টি খেতে বলে আমি নিজেই কি চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিলাম না? এর পর পূর্ণকুমারের দিকে আর চাইতে পারি নি।

সুজিতবাবু বললেন, চলুন অনেকটা পথ। দেরি করলে

ফিরতে রাত হবে।

এরপর আর অপেক্ষা করিনি।

মাওকডক থেকে ডিমফে। দু কিলোমিটার পথ। তারপর শিলং চেরাপুঞ্জি রোড।

ভাল রাস্তা। মসৃণ, পিচ ঢালা। বেশ চওড়াও সেই সঙ্গে। এদিকে বন জঙ্গল অনেক কম। যা আছে তাকে ঝোপঝাড়ই বলা চলে। শিলং-এর আশপাশে উঁচু পর্বত চূড়া বেশি। এদিকে মাঝে চূড়ার সে বৈচিত্র্য চোখে পড়েনি। বরং বলা চলে বিস্তৃত প্রাচীরের মত পাহাড়। সে পাহাড়ের ওপরের অংশ সমতলের মত বিস্তৃত। সেই সমতলে মাইলের পর মাইল উদ্ভিদ বলতে যা বোঝায়—একমাত্র সবুজ ঘাস। প্রাকৃতিক অবক্ষয়ে পাথর মাটিতে পরিণত হয়েছে। পাহাড়ের মাথায় সেই মাটির স্তরে আগাছা আর ঘন ঘাসের দঙ্গল।

মাঝে মাঝে গভীর গিরিখাত। এদিকে পর্বতমালা। পর্বতমালা ওদিকে। মাঝে গিরিখাত। নিচে, অনেক নিচে নেমে গেছে। আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে, এ ধরনের গিরিখাত যে এখানে ছিল না, তারও প্রমাণ পেয়েছেন ভূতাত্ত্বিকরা। পার্বত্য নদীর খরস্রোতে পাহাড় ক্ষয়ে গিয়ে যেখানে ছিল একখণ্ড শিলাস্তূপ সেখানে তৈরি হয়েছে খাত। সেই খাত পরিধিতে বেড়েছে। ফলে পাহাড়ের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে ব্যবধান। খাত গভীর হয়েছে। সেই সঙ্গে আরও প্রশস্ত। ফলে গিরিখাতের দুপাশে তৈরি হয়েছে দুটি পৃথক পর্বত শ্রেণী।

এদিকের পর্বতশ্রেণী তুলনায় নতুন। রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে চোখে পড়ে স্তরে স্তরে সাজান তার ভূখণ্ড। কোন স্তরে স্লেট। কোন

স্তরে নুড়ির সমাবেশ। নুড়ির ওপর কঠিন কোয়ার্টজ পাথরের সমাবেশ।

সমরজিৎ চক্রবর্তী বললেন, একটু লক্ষ করুন, দেখবেন, স্তরগুলি কেমন পর্যায়ক্রমে সাজান। গিরিখাতের ওপারে যে একটানা পাহাড় দেখছেন, যা আমাদের এই রাস্তারই সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলেছে, সেখানে গেলেও দেখবেন তারও শিলাস্তরগুলি ঠিক এইভাবেই সাজান রয়েছে। শুধু তাই নয়, এখানে যে স্তরটি যতটা উঁচুতে, সেখানেও সেই স্তর ঠিক ততটা উঁচুতেই দেখতে পাবেন। দুটি পর্বতশ্রেণী যে একদিন একসঙ্গে জুড়ে ছিল এটাই তার প্রমাণ।

আধুনিক পিচঢালা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে মাঝে মাঝে চোখে পড়বে পায়ে চলা পথ। পাথর কেটে খাড়াই উঠে গেছে। চওড়ায় পাঁচ থেকে ছয় ফুট। এ ধরনের একটি রাস্তার সামনে এসে জীপ থামালাম আমরা।

পথটিকে দেখিয়ে সুজিতবাবু বললেন, দেখে নিন, মশাই। একেবারে ইতিহাসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। এখন তো পিচ ঢালা পথে উড়ে চলেছি। কিন্তু ভাবতে পারেন, আজ থেকে একশ' বছরেরও আগে ১৮৬৯ সালে পাহাড়ের ওপর এই যে খাড়াই রাস্তাটা দেখছেন এই রাস্তা ধরেই এ অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন এইচ বি মেডলিকট? তখন তো আর এখনকার মত জিপ ছিল না। এধরনের পথ অনেক পাবেন। এ পথে হয় পায়ে হেঁটে চলা, নইলে খচ্চরই একমাত্র বাহক। প্রচুর কষ্ট করতে হয়েছে তাঁদের। এসব অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রের কাজ তাঁরাই শুরু করেছিলেন প্রথম।

অবাক হয়ে দেখছিলাম সেই রাস্তা জ্ঞানের অন্বেষণে মানুষকে যে

কতটা পরিশ্রম করতে হয়, এ পথ যেন তারই নিদর্শন।

'আর ওই যে দেখছেন, ওরই নাম উমশোরিংখিউ নদী।' বললেন সুজিতবাবু। '১৮৫৯ সাল নাগাদ ওই নদীর পাশ দিয়ে চলতে গিয়েই ওল্ডহাম প্রথম আবিষ্কার করেন, খরস্রোতা পার্বত্য নদী ৩২৭ টন ওজনের পাথরের চাঁই-ও ধাক্কা মেরে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই ঘটনা নদীর অপরিসীম বহন ক্ষমতার প্রথম প্রমাণ। ভূমির অবক্ষয়ের ব্যাপারে নদীর ভূমিকা কতটা এই ঘটনা পরবর্তীকালে ভূতাত্ত্বিকদের সে সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছে।'

আমরা চেরাপুঞ্জির কাছে এসে পড়েছি প্রায়। মাঝে ছোট্ট একটি খাসি গ্রাম পেরিয়ে এলাম। নাম সোহ্‌রারিম। বড় গ্রাম। কায়দাকানুন সমতলভূমির গ্রামেরই মত। লোকগুলিও মনে হল অনেক বেশি আলোকপ্রাপ্ত। এর কিছু দূরেই লাইতবিংগকিউ আর একটি গ্রাম। এখান থেকে শুরু হয়েছে কয়লাখনি। তবে সে কয়লা-খনি আমরা ঝরিয়া, রানীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে যেমন দেখি, তেমন নয়। এ অঞ্চলের পাহাড়ে পাথর বলতে বেসল্ট এবং গ্র্যানাইট! এই সব পাথরের স্তরের ফাঁকে কয়লার স্তর। সে স্তর পুরুও তেমন নয়। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতেই দেখা যায়। কয়লা সংগ্রহ করাও বেশ পরিশ্রমের কাজ দেখলাম। পাহাড়ের মাঝে মাঝে গর্ত করা হয়েছে। আচমকা দেখলে মনে হবে গুহা। হয়ত জন্তু জানোয়ারের আড্ডা। স্থানীয় অধিবাসীরা সেই গর্তের মধ্যে ঠিক পশুর মতই হামা দিয়ে ঢুকে কয়লার টুকরো সংগ্রহ করছে। সে কয়লায় গন্ধক প্রচুর। শতকরা চার থেকে ছয় ভাগ। তবু এই কয়লার কল্যাণে কিছু কিছু শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে এখানে। আশপাশে আছে উঁচু মানের চুনা পাথর। আর এই কয়লা। এদের সাহায্যে চেরাপুঞ্জিতে চলেছে

সিমেন্টের কারখানা। সারা মেঘালয়ে খনিজ পদার্থকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে এটাই এখন একমাত্র কারখানা। এর দৈনিক উৎপাদন ২৫০ টন। এই উৎপাদন দৈনিক যাতে ৯৫০ টনে বাড়ান যায় তার চেষ্টা চলছে।

আরও কিছু দূরে এগিয়ে রাস্তাটা বাঁ দিকে মোড় নিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল আধুনিক লোকালয়। একেবারে পাকা শহর।

আর সুজিতবাবু যখন বললেন, 'অ্যাণ্ড হিয়ার উই কাম। দিস ইজ চেরাপুঞ্জি'—আমার যেন কান্না পেল। মনে পড়ল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সেই কবিতার কলি: চেরাপুঞ্জির থেকে এক ফালি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি সাহারার বুকে ?

হায় ভগবান! কোথায় মেঘ? চেরাপুঞ্জিতে আমার এই প্রথম আসা। ছোট বয়স থেকে শুনে এসেছি চেরাপুঞ্জির কথা। বার বার শুনেছি। শুনেছি, পৃথিবীতে চেরাপুঞ্জিই একমাত্র জায়গা যেখানে নাকি সবচেয়ে বৃষ্টি পড়ে বেশি। বছরে গড়ে ১১৪৩ সেন্টিমিটারের মত। ইদানিং অবশ্য বলা হচ্ছে ঠিক চেরাপুঞ্জি নয়, এ গৌরব চেরাপুঞ্জিরই কাছে আর একটি জায়গার ওপরই বর্তায় বেশি। তার নাম মৌসিনরাম। সেখানকার বৃষ্টি চেরাপুঞ্জিকেও ছাপিয়ে যায়। তবু চেরাপুঞ্জি চেরাপুঞ্জিই। তার স্বপ্ন ভুলি কী করে।

চেরাপুঞ্জির কথা মনে এলেই ভাবতাম পাহাড় আর পাহাড়। সেখানে আকাশচুম্বী গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মাথার ওপর রাশি রাশি মেঘ। ঘন কালো মেঘের আড়ালে সূর্য পুরোপুরি অদৃশ্য। থেকে থেকে বাজ পড়ছে। আর সেই সঙ্গে অবিরাম বর্ষণ। সেখানে কোন জনবসতি নেই। থাকলেও, হয়ত দু একটি ডাক-বাংলো। কৌতূহলী কোন ট্যুরিস্ট অথবা সরকারী কর্মচারী সেই

ডাকবাংলোয় আশ্রয় নিয়ে গৃহবন্দী হয়ে প্রতিটি মুহূর্ত যাপন করে। পথে জোঁক, এবং সাপ। আর কোন প্রাণী নেই। এবং—

কিন্তু কোথায় গেল সেই কল্পনা। কয়েক ঝুড়ি বালি ফেললে বাস্তব চেরাপুঞ্জির সঙ্গে গোবি সাহারার মধ্যে সত্যিই কি কোন পার্থক্য দেখা যাবে?

এ তো শুকনো পাহাড়! না আছে গাছপালা। থাকলেও যৎসামান্য। তাকে অন্তত জঙ্গল বলা চলে না। খটখটে লাল পাথর। আকাশে একফালি মেঘও নেই। খটখটে রোদ্দুরে গলদঘর্ম অবস্থা। ছোট্ট একটা পাহাড়ী নদী। তার জল এসে এক জায়গায় সংকীর্ণ পুকুর তৈরি করেছে। তার হাঁটু অব্দি জল। স্থানীয় অধিবাসীরা সেই জলে স্নান করছে। কাপড় কাচছে। নতুন নতুন ঘরবাড়ি। একটি স্কুলও চোখে পড়ল। আর আছে অফিস কাছারি। এসব নিয়ে দিব্যি একটি ছোটখাটো শহর।

সুজিতবাবুকে বললাম, মশাই চেরাপুঞ্জিতে এলাম, অথচ এক ফোঁটা বৃষ্টির স্পর্শ পেলাম না?

কী করে পাবেন, বলুন? এ তো এপ্রিল মাস। এপ্রিলের গোড়ায় চেরাপুঞ্জি শুকনো, খটখটে। মন্তব্য করলেন সুজিতবাবু।

মনে মনে চেরাপুঞ্জির যে ছবিটি এতদিন এঁকে রেখেছিলাম, তাঁকে বললাম। আমার কথা শুনে তিনি তো প্রায় হো হো করে হেসেই উঠলেন। বললেন, মশাই এত বৃষ্টি হলে মাটির কিছু থাকে? পাহাড় ক্ষয়ে যেটুকু টপ সয়েল তৈরি হয়, প্রবল বর্ষণে তার সবটাই তো ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। গাছ জন্মাবে কোথায়?

রাস্তাটা এগিয়ে গেছে শহরের মধ্যে দিয়ে। তারপর চেরাপুঞ্জির ভিউ-পয়েন্ট। এখানটা ফাঁকা জায়গায়। বাঁ পাশে উপত্যকা। প্রায়

এক হাজার ফুট নিচে নেমে গেছে। সেখানে দু একটি গ্রাম। জঙ্গল। কলা বন। মাইল খানেক দূরে মৌসমী ফলস্। তার জলের ধারা এদিক থেকে অনেক কষ্ট করেই দেখতে হয় এখন। তবে সে জলের ঝিরঝির শব্দ পাহাড়ের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে এখানেও ভেসে আসে। চেরাপুঞ্জির এদিক থেকে পাহাড় হঠাৎ যেন শেষ হয়ে গেছে। খাড়াই ঢাল সৃষ্টি করে গিয়ে মিশেছে সুরমা উপত্যকায়। ভিউ-পয়েন্ট থেকে দেখলাম সমভূমি। বাংলাদেশ। বিস্তৃত সুরমা নদী। শতধা তার শাখা-প্রশাখা। সেদিকে চোখ পড়তেই কেমন যেন রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। সোনার বাংলা। বাংলাদেশ।

বেলা বাড়ছিল। ঘড়িতে তখন প্রায় একটা। কথা ছিল একটার মধ্যে আমরা ভোলাগঞ্জ পৌঁছব। দুপুরেব খাবারের ব্যবস্থা সেখানেই করার কথা। সেখানে অনেকেই অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্যে। অতএব ভিউ-পয়েন্টের কাছে ছোট্ট একটি দোকানে উঠে চা এবং কিছু স্ন্যাকস উদরস্থ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হলাম।

এবার নিচে নামার পালা। তিন হাজার ফুট থেকে একেবারে সমতলে। আঁকা-বাঁকা পথ। দূরে সুরমা নদী। এক জায়গায় এসে সিলেট জেলার ছাটক সিমেন্টের কারখানা চোখে পড়ল। এই কারখানার জন্যে যত চুনা পাথর দরকার তা প্রায় এদিক থেকেই। ভোলাগঞ্জের কাছে কোমোরা। ভারত প্রতি বছর সেখান থেকে দুই লক্ষ টনের মত চুনা পাথর বাংলাদেশে রপ্তানি করে আসছে।

যতই নিচে নামছি জঙ্গল বাড়ছে। ঘণ্টা আড়াই-এর মধ্যেই আমরা সেলা, ইশামতী ছাড়িয়ে ভোলাগঞ্জ পৌঁছলাম। এদিকের বনে বনে কাঁঠাল গাছের জঙ্গল। কাঁঠাল গাছ এদিকে ওয়াইলড্ প্ল্যাণ্টের মধ্যে পড়ে। খাবার লোক নেই। আম গাছেরও সেই

অবস্থা। দেখলাম সুজিতবাবু প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। সঙ্গে বস্তা! বললেন, শিলং-এ এ বস্তুটি চট করে পাওয়া যায় না, মশাই। আসার সময় গিন্নী তুটো থলে ধরিয়ে দিয়েছেন। এঁচড় আর কচি আম নিয়ে যেতে হবে।

আম কাঁঠালের বাগান। কয়েকটি ছিটে বেড়ার তৈরি হাট। এই নিয়ে ভোলাগঞ্জ ড্রিলিং স্টেশন। যাতায়াতের জন্যে সম্বল তুটি জীপ। ড্রিলিং স্টেশনের পাশে জিওলজিস্টদের ক্যাম্প। আমরা যেতেই বেশ সোরগোল পড়ে গেল। শিলং থেকে জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ড্রিলিং বিভাগের প্রধান শ্রীমুনীশ্বর দত্ত অনেক আগেই এসে হাজির হয়েছিলেন। প্রচণ্ড উৎসাহী ভদ্রলোক। আমাদের দেখেই সদলবলে ছুটে এলেন তিনি। বললেন, মশাই, সেই একটা থেকে আমরা বসে আছি। খাবারদাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এত দেরি কেন?

ওঁদের মুখ দেখে বুঝলাম, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ওঁদের এখনও খাওয়া হয়নি।

খানিকটা কৈফিয়ৎ দেবার মত আমিই বললাম, উপায় ছিল না। কিছুটা দেরি হল সেন সাহেবের সঙ্গে রডোডেনড্রন এবং এলিফ্যাণ্ট ফলস দেখতে গিয়ে। পথে জীপ বিগড়েছিল। তার জন্যে গেল ঘণ্টা-খানেক সময়। তারপর মাওকডকে কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছিলাম আমরা।

মানে ক্লাইং সসারের গল্প শুনতে। হেসে ফেললেন মিঃ দত্ত। উত্তর প্রদেশের মানুষ। রসিকতা করতে জানেন।

গল্প মানে? ঘটনাটা তাহলে আপনি কি বিশ্বাস করেন না?

বিশ্বাস করি না বলব না। কারণ এক জ্যান্ত মানুষ আজও তার

সাক্ষী হিসেবে বেঁচে আছে। তাছাড়া কাগজেও ঘটনাটা বেরিয়েছিল তখন। তবে ব্যাপার কি জানেন? মনের দিক দিয়ে আমি ঠিক সমর্থন পাই না, এই যা। হেসে ফেললেন শ্রীদত্ত।

এরপর মিলিটারি কায়দায় পরিচয়ের পালা। প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিলেন ভোলাগঞ্জে যিনি ড্রিলিং-এর দায়িত্ব নিয়ে রয়েছেন তাঁর সঙ্গে। বললেন, ইনি শ্রীমজুমদার। এখানকার ড্রিলিং সেকশনের ইনচার্জ। ইনি শ্রীপাত্র জিওলজিস্ট।

আবার মজুমদার? বললাম, মিঃ দত্ত, আপনাদের এখানে দেখছি মজুমদারের ছড়াছড়ি। গৌহাটিতে দেখা হল সুজিত এবং অমর মজুমদারের সঙ্গে। এখানেও দেখছি আর একজন মজুমদার। কাল শুনেছি দেখা হবে নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক করপোরেশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে। তিনিও এক মজুমদার। শ্রীসুব্রত মজুমদার। ব্যাপার কি বলুন তো? সব এক পাড়ার লোক নাকি?

আমার কথায় সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

এখন সমস্যা দাঁড়াল এই, আগে খাওয়া, না ড্রিলিং সাইটটা দেখা?

আমি বললাম, এক কাজ করুন। ড্রিলিং সাইটটাই আগে দেখা যাক। এব মধ্যে খাবারদাবার একটু গরম করে নিন। আমরা বরং এক ঘণ্টার মধ্যে দেখার কাজ সেরে মাকিন কায়দায় সন্ধ্যের আগেই ডিনার সারব।

বরং সেই ভাল। বললেন মুনীশ্বর দত্ত।—কাছেই তো। আমরা যাব আর আসব।

ড্রিলং-এর কাজ চলছিল। মুনীশ্বরবাবুর কথা শুনে ভাবলাম, যাক। কাছে যখন তখন আর ভাবনার কী আছে। জীপের সারি

চলল আবার বুনো পথে। সমতল ছেড়ে বাঁ দিকে একটি পথ। কিছুটা পাথর গলা মাটি। তারপরই দাঁত বের করা রাস্তা। হাড়পাঁজরা নড়বড়ে হওয়ার মত অবস্থা। জীপ কখনও বাঁ দিকে মোড় নেয়, কখনও ডান দিকে। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। ক্রমে উপরে উঠছি মনে হলো।

তা না হয়, হলো। কিন্তু গাড়ি যে আর থামে না রে, বাবা। মুনীশ্বরবাবুর কাছে এই কি 'নজদিক'? আমারই ঘাট হয়েছে। জিওলজিস্টদের বিশ্বাস করতে নেই। মনে পড়ে ঝাঝায় নেমে হাঁটা পথে একবার কোন এক গ্রামে যেতে হয়েছিল আমাকে। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। পথের আব শেষ নেই। যিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, দূর নেহি। এই বগলমে। স্টিশন সে দু ক্রোশ হোগা। মশাই, দুই ক্রোশ। শেষ পর্যন্ত মাইল দশেক পথ হাঁটিয়ে তবে আমায় সে ছেড়েছিল। এখন দেখছি এই পাথুরে সাহেবরাও তাই। কোথায় নজদিক্। আমি জীপের দূরত্বমাপার যন্ত্রটির ওপর ঠিক নজর রেখে চলেছি। গাড়ি যখন শেষ পর্যন্ত থামল, দেখলাম তার মধ্যে প্রায় সাত আট কিলোমিটার চলে এসেছি।

নির্জন জায়গা' ঝরনার জল আটকে এক জায়গায় ছোট্ট একটি জলাশয় কবা হয়েছে। সেখান থেকে পাম্প করে সেই জল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট ওপরে। ড্রিলের কাজ চলছে। কঠিন চুনা পাথবের স্তরের সন্ধানে কী প্রচণ্ড আয়োজন। জন দশেক ছেলে কাজ কবছে। তাদের বয়েস পনের থেকে কুড়ির মধ্যে সবাই খাসি। স্থানীয় গ্রামের অধিবাসী।

মুনীশ্বরবাবু বললেন, খুব চালাক, মশাই। বেশ কাজ বোঝে এরা। কাজ করছে বলে তবু ভাল আছে। নইলে নেশাভাঙ্ করে ঘুরে বেড়াত। এক একজন দৈনিক আয় করছে সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে

উপরে : কাজিরাঙ্গায় জলহস্তী

মধ্যে · কামেং-এর বুনো মোষ

নিচে : তিরাপে হাতীর সাহায্যে মানুষ কাজ করে
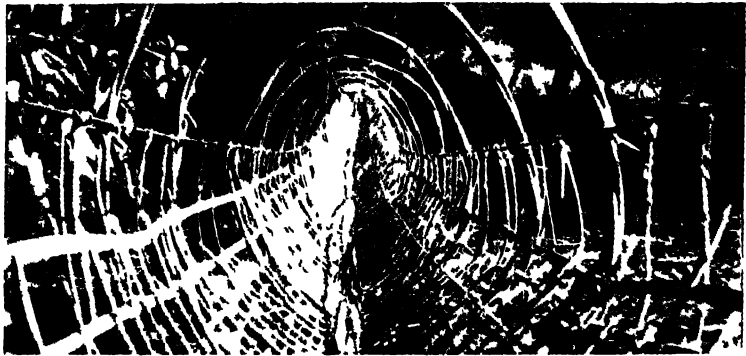
উপরে : কোহিমা

মধ্যে : এখানে নাকি ফ্লাইং সসার নেমেছিল

নিচে : সিয়াং জেলায় বেতের তৈরি ঝুলন্ত সেতু

সাত টাকা। তবে হ্যাঁ, কাজ খুব শক্ত।

খুব উঁচু মানের চুনা পাথরের নতুন স্তর পাওয়া গেছে এখানে। কাছাকাছি দুটি জায়গায় বসেছে দুটি ড্রিল। একটি মাঝারি এবং একটি হাল্কা ধরনের। ওঁরা সন্ধান করছেন এই স্তর কতদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে সে সম্পর্কে নিখুঁত তথ্য সংগ্রহের।

বুঝলেন মিঃ কর, তাত্ত্বিক জ্ঞান সংগ্রহ তো আছেই। তবে তাকে বাদ দিলে আমাদের আসল দায়িত্ব দাঁড়াবে তিনটি। প্রথমত এসব অঞ্চলে কতটা জায়গা জুড়ে চুনা পাথরের স্তর ছড়িয়ে রয়েছে, সেটা জানা। তারপর দেখতে হবে সেই চুনা পাথর গুণের দিক দিয়ে কতটা উচ্চমানের। এ দায়িত্ব আমাদের ভূ-রাসায়নিক বিভাগের। অবশেষে জানা দরকার মোট চুনা পাথরেব পরিমাণই বা কত।

ওঁবা বলেন স্ট্রীক। বাংলা ভাষায় যাকে বলা চলে এক ধরনের শিলাস্তর। এই স্তর উপরেও থাকতে পারে। কয়েক মিটার থেকে কয়েক শ' মিটার গভীরেও থাকতে পারে। চেরাপুঞ্জির পথে আসার সময় এই স্তরের কিছু কিছু বর্ণনা দিয়েছি। খনিজ পদার্থ হিসেবে শিলাস্তরের গঠনও হয় স্বতন্ত্র। চুনা পাথরের এক রকম, জিপসামের এক রকম, আবার লোহার আকরিক হিমেটাইট-ম্যাগনেটাইটের অন্য রকম। স্তরগুলি যেন বিছানার মত। একের পর এক তোশক, চাদর পেতে যেমন শয্যা রচনা করা হয়, তেমনি এক এক ধরনের শিলাস্তর পর পর সজ্জিত হয়ে তৈরি হয়েছে এক একটি পার্বত্য এলাকা। কেউ কম পুরু কেউ বেশি পুরু। কেউ সঙ্কীর্ণ একটি জায়গার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কেউ মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে রয়েছে। এই স্ট্রীকদের পরিসীমা বের করাও জিওলজিস্টদের একটা বড় রকমের দায়িত্ব।

ভোলাগঞ্জে চুনা পাথরের স্তরের ওপর দাঁড়িয়ে এসব কথাই আলোচনা করছিলাম মুনীশ্বর দত্তের সঙ্গে। ভদ্রলোক বললেন, ব্যাপার কি জানেন, এসব জানার জন্যে আমরা নানা রকম পদ্ধতির সাহায্য নিই ঠিকই। তবে যতক্ষণ না ড্রিল করা হচ্ছে, কোথায় কতটা খনিজ পদার্থ রয়েছে সে ব্যাপারে কিন্তু আমরা নিশ্চিত হতে পারি না।

জিজ্ঞেস করলাম, কত জায়গায় ড্রিল চালাচ্ছেন?

কত জায়গায় মানে? আপনি কি পুরো উত্তর-পূর্ব সীমান্তের কথা বলছেন? মুনীশ্বরবাবু প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, আমি সে কথাই জানতে চাইছি, মিঃ দত্ত। আমার জিজ্ঞাসা।

তা, এ পর্যন্ত আমরা মোট তেরোটি জায়গায় ড্রিলিং চালিয়ে যাচ্ছি। সোনাপাহাড়ে একটি হাল্কা ধরনের ড্রিলের কাজ তো দেখেই এসেছেন। এখানে আমরা কাজ করছি তুটি ড্রিল নিয়ে। একটি হাল্কা এবং একটি মাঝারি ড্রিল। এছাড়া এই মুহূর্তে আমরা ড্রিল চালিয়ে যাচ্ছি মেঘালয়ের স্নুং উপত্যকায়। সেখানে আমরা ক্রোমিয়াম, কোবল্ট. নিকেল এবং কিছুটা তেজস্ক্রিয় বস্তুর সন্ধান পেয়েছি।- মেঘালয়ের তিরসাদেও চলছে একটি ড্রিল। তামা, নিকেল প্রভৃতি ছাড়াও খানিকটা সোনার ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে সেখানে। আপনি তো অরুণাচলে যাচ্ছেনই। সেখানে কিমিনে গিয়ে দেখবেন আরও তুটি ড্রিলের কাজ। রাঙ্গানদীর দক্ষিণ ধারে তামার স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। বলতে পারেন, এটা প্রভড্ ডিপোজিট। এ ছাড়া বমডিলা রাস্তার ধারে টুং, নাগাল্যাণ্ডের পুকপুর এবং বরপানিতেও ড্রিলিং চলছে।

প্রশ্ন করলাম, এক একটা ড্রিল এবং তার সাজসরঞ্জাম ভারিও তো কম নয়। আর যেসব জায়গায় আপনারা কাজ করছেন তার সবই যে মোটর রাস্তার আওতায় পড়বে এমনও তো নয়। আপনাদের অসুবিধে হয় না ?

বলেন কি ? অসুবিধে হয় না আবার ? জিওলজি তো আর সব সময় শহরের আশেপাশে হয় না যে, আপনি পিচ ঢালা রাস্তা দিয়ে আরাম করে যাওয়া আসা করবেন। এই ধরুন না—কিছুদিন আগে নাগাল্যাণ্ডের পুকপুরে যখন ড্রিলিং-এর কথা উঠল, আমাদের তো মাথায় হাত। কী বলব, মশাই, কোহিমা হয়ে কিপফ্রে পর্যন্ত না হয় আপনি কষ্ট করেই গেলেন। তারপর ? কিপফ্রে থেকে পুকপুর—সে তো প্রায় আশি কিলোমিটারের মত রাস্তা। জীপে যেতেই ভয় করে। ওই রাস্তায় কী করে যে ভারি ড্রিল এবং তার সাজসরঞ্জাম নিয়ে যাব, আমরা ভেবেই পেলাম না। চলল মিটিং এর পর মিটিং। অবশেষে সমস্যার সমাধান হল। ভারত সরকারের বিমানবাহিনীর সাহায্য পেলাম। তাঁরাই হেলিকপ্টারে করে সব কিছু পুকপুরে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

আছে। সমস্যা আছে। অনেক সমস্যা। বিশেষ করে অরুণাচলের একচল্লিশ পয়েণ্টে গিয়ে এর পর যা দেখেছি, তাতে এটাই মনে হয়েছে, এঁদের অনেকেই রীতিমত প্রাণ হাতে করেই তো কাজ করে চলেছেন ?

ভোলাগঞ্জে এসে আর একটি জিনিস দেখলাম। ফসিল। জীবাশ্ম। লক্ষ লক্ষ বছর, হয়ত বা কোটি বছরেরও পুরনো। এক একটা পাথরের স্তর কেটে ফেলা হয়েছে। আর তার মধ্যে থেকে উঁকি মারছে ছোট ছোট প্রাণীর শিলীভূত অবশেষ। এক সময়ে এরা

সমুদ্রের জলে বাসা বেঁধেছিল। এখন শিলায় রূপান্তরিত।

পাঁচটা নাগাদ আমরা ফিরে এলাম। এবার সত্যিই খিদে পেয়েছে। ড্রিলিং ক্যাম্পে আসার পর মুখে কারোর আর কথা নেই। সবার পেটেই আগুন।

একটা আম গাছের নিচে টেবিল বিছিয়ে খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমরা সাত আটজন। জিওলজিস্ট এবং অন্যান্য কর্মী মিলিয়ে। আমাদের হোস্ট মিঃ মজুমদার।

খেতে বসলাম আমরা। মিঃ মজুমদার এই পাণ্ডববর্জিত জায়গাতেও ব্যবস্থার কোন ত্রুটি রাখেন নি। ভাত, চিকেন, দই, মিষ্টি থেকে শুরু করে, পুডিং এবং ফ্রুট স্যালাড। কিছুই বাদ নেই।

টেবিলের ওপর সাজান খাবার দেখে রসিকতা করে বললাম, উঁহুঁ! এত সব কাণ্ড পাথুরে সাহেবদের পক্ষে সম্ভব নয়। মিষ্টি হাতের দরকার।

মুনীশ্বরবাবু হেসে বললেন, নিশ্চয়। একেবারে নিখুঁত অনুমান। হিয়ার শী কামস্।

এবং পরক্ষণেই চমক।

অত্যন্ত শান্ত এবং মমতাময়ী এক মূর্তি। দু হাত জোড় করে নমস্কার করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

মিসেস মজুমদার। পরিচয় করিয়ে দিলেন মুনীশ্বরবাবু।

আমরা সবাই প্রতি নমস্কার করার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

নিজেকে অপরাধীই বলে মনে হল আমার। বেচারা সেই কখন এসব তৈরি করে সাজিয়ে বসে রয়েছেন। হয়ত নিজেও কিছু মুখে তোলেন নি এতক্ষণ।

শ্রীমজুমদার খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ। আমার পাশেই

দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, তা এক আধদিন একটু অনিয়ম হলোই-বা। আপনারা তো রোজ আসেন না। আপনারা এলে তবু নতুন মুখ দেখা যায়।

মিসেস মজুমদার বললেন, আপনারা বসুন। খেতে খেতে গল্প শুনব।

কিসের গল্প। গল্প মানে তো জিওলজি!

কত আর বয়েস মিসেস মজুমদারের। বড় জোর সাতাশ আটাশ? দেখলেই বোঝা যায়, অত্যন্ত রুচি সম্পন্না। স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে তাঁকে আসতে হয়েছে এই ভোলাগঞ্জে। এখানে মেয়ে বলতে তিনিই। না আছে প্রতিবেশী। অথবা অন্য কোন মহিলা সঙ্গী।

খেতে খেতে কথা বলছিলাম তাঁর সঙ্গে। বললেন, মাঝে মাঝে খুবই অস্বস্তি লাগে। কখনও কখনও ওঁকে রাতেও কাজ করতে হয়। না, অন্য কোন ভয় নেই। ভয় শুধু একাকিত্বের। না আছে একটি সিনেমা ঘর যে ছবি দেখব। কখনও সখনও খাসি মেয়েরা আসে। ওদের ভাষাই বুঝি না। আর কতক্ষণই বা ওদের সঙ্গে কথা বলা যায়? এসব দুর্গম এলাকায় ইচ্ছে করলেই যে কোন আত্মীয় স্বজন আসবে তারও উপায় নেই।

ভদ্রমহিলাকে দেখলেই মনে হয়, এক সময়ে বেশ স্পোর্টিভ ছিলেন। হ্যাঁ, ছিলেন। গান বাজনার দিকে ঝোঁক ছিল। এখন তার সবই গেছে।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার কর্মীদের পারিবারিক জীবনে এটাই একটা মস্ত বড় ট্র্যাজেডি, মিঃ কর। ইউ ক্যান নট কম্পেনসেট ইট। খেতে খেতে মন্তব্য করলেন সুজিতবাবু।

ঘণ্টা দেড়েক পর সেখান থেকে আমরা ফিরে এসেছিলাম।

আসার সময় মহিলাটি এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। পাথরের মূর্তির মত হাত জোড় করে বিদায়ী নমস্কার জানিয়ে বলেছিলেন, সম্ভব হলে আসবেন আবার।

আমাদের জীপ ছাড়ল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন পাহাড়ের গা বেয়ে। তার আবছা আলোয় তাঁর মুখের ওপর জীবন এবং জীবিকার অন্তর্দ্বন্দ্বের যে প্রকাশটি দেখে এলাম, হয়ত কোনদিন তা ভুলব না।

পথে আসতে আসতে সুজিতবাবু মন্তব্য করলেন, মশাই, এই কারণেই মেয়ের বাবারা ছেলে জিওলজি করে শুনলেই আর মেয়ে দিতে চায় না। জিওলজিস্টদের কোন ফ্যামিলি লাইফ আছে? বিশেষ করে যে বয়েসটায় লোকে বিয়ের সত্যিকারের আনন্দ উপভোগ করে, সেই বয়েসে বউ, পরিবারের আর পাঁচ জনকে ছেড়ে যদি বন বাদাড়ে শুধু পাথর ঠুকে বাঁচতে হয়, বলুন, জীবনের ট্র্যাজেডিটা একবার ভাবুন।

এ কথার আমি আর কী উত্তর দেব ?

সে রাত্রে শিলং ফিরে আসার পর বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। কথা ছিল, রাতে সুজিতবাবুর বাসায় খাব। কিন্তু সারাদিনের ঘোরা-ঘুরিতে অজিতবাবু এবং আমি দুজনই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সুজিতবাবুকে তাই বললাম, খাবারগুলি ফ্রিজে রেখে দেবেন, মশাই। নষ্ট হবে না। রাতের ডিনারটা না হয় কাল ভোরেই সারা যাবে।

আমাদের অবস্থাটা সুজিতবাবু বুঝতে পেরেছিলেন। আর পীড়াপীড়ি করলেন না।

পরদিন ঘুম ভাঙ্গল কিছুটা দেরিতে। ঘুম ভাঙ্গতেই দেখলাম, অজিতবাবু আমার আগেই উঠে পড়েছেন। স্নান সারা। পোঁটলা-

পুঁটলিও বাঁধা শেষ।

বিছানা থেকে উঠেই আমি শশব্যস্ত হলাম। ঘড়ির দিকে চেয়ে বললাম, ইস্! করেছেন কি মশাই। ছ'টা বেজে গেল, অথচ আমাকে ডাকেন নি? নিজে তো দেখছি একেবারে পা বাড়িয়েই বসে আছেন।

নরম প্রকৃতির ভদ্রলোক। আমার কথায় হাসলেন শুধু। তারপর বললেন, আপনি খুব ডীপ স্লিপ দিচ্ছিলেন, তাই আর ডাকি নি। কাল ধকলটা তো কম যায় নি?

আর মশাই, ধকল। এই তো শুরু। দেখুন দেখি, আটটার মধ্যে শম্ভুবাবু এসে যাবেন। ন'টার সময় নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক করপোরেশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে বসার কথা। তার আগে আবার রাতের ডিনারটি শেষ করতে হবে।

অতএব ভোর থেকেই শুরু হলো হুল্লোড়। দাড়ি কামানো, স্নান, জিনিসপত্র গোছানো সব শেষ করতে সাতটা বেজে গেল। সাড়ে সাতটা নাগাদ এলেন সুজিতবাবু। সঙ্গে অমরবাবু এবং সমরজিৎ চক্রবর্তী। বুঝলাম ফ্লিট রেডি।

সুজিতবাবুর বাসায় খাওয়া-দাওয়া শেষ হলো সাড়ে আটটা নাগাদ। তারপরই এলেন শম্ভু সেন। সেই প্রাণচঞ্চল মানুষটি। মুখে হাসির প্রাচুর্য।

এসেই হাঁকডাক শুরু করলেন তিনি। বললেন, বলুন, মিঃ কর, শরীর ফিট তো? শুনলাম রাতের দিকে একটু ইনডিসপোজড হয়ে পড়েছিলেন।

বললাম, না, তেমন কিছু নয়। এখন ঠিক আছি।

না, না, মশাই, লজ্জা করবেন না। সঙ্গে ওষুধপত্র ঠিক আছে। ডঃ চক্রবর্তীর কাছে সবরকম ওষুধ পাবেন। অসুবিধে হলে বলবেন।

বিচিত্র চরিত্র। সর্বদিকেই নজর।

আজকের প্রোগ্রাম গরমপানি যাওয়া। প্রায় পাঁচ ছয় ঘণ্টার পথ। কপিলি নদীকে বেঁধে সেখানে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কাজ চলছে।

গরমপানি যাওয়ার আগে ঘণ্টাখানিকের জন্যে ছোট একটি বৈঠক।

শিলং-এ পা দেয়ার পর থেকেই প্রসঙ্গটা মাথায় ঘুরছিল। ভারতের এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় সমস্যা—এদিকে এখনও পর্যন্ত আধুনিক শিল্প সম্প্রসারণের ব্যাপারে তেমন কিছুই করা হয় নি। এবং তার ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এ অঞ্চলের মানুষ এখনও পর্যন্ত বহু বছর পিছিয়ে রয়েছে। মুশকিল এই কল-কারখানা তৈরি করতে গেলে দরকার বিদ্যুৎ শক্তি। অথচ এ বস্তুটিরই এখানে অভাব।

মনে পড়ে বছর চার আগে ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর ডঃ রাজা রামান্নার সঙ্গে প্রসঙ্গটি নিয়ে কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, স্বাধীনতার পর দেশে অনেক কিছুরই উৎপাদন বেড়েছে। সমস্যা শুধু তাদের সম-বণ্টনের অভাব। এই দেখুন না, বিদ্যুতের কথাই ধরুন। বিদ্যুতের অভাবে আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড—এ সব জায়গায় কল-কারখানাই গড়ে তোলা যাচ্ছে না। তেমন কয়লা নেই যে, ওই সব অঞ্চলে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা যাবে। তাই যদি হয়, সেখানে আপনারা একটি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র তো তৈরি করে দিতে পারেন।

আমার কথা শুনে ডঃ রামান্না বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। তারপর মন্তব্য করেছিলেন, বলছ কী? দে হ্যাভ এনাফ্ হাইডেল

পাওয়ার সোরসেস। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আসাম, অরুণাচল, মেঘালয়—সর্বত্র অজস্র পার্বত্য নদী, ঝরনা, প্রস্রবণ। তাদের জলকে ধরে আমরা যদি বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা করতাম, শুধু ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল নয়, সে বিদ্যুৎ সারা দেশের চাহিদা মেটাতে পারত। তা ছাড়া, ছোট বড় এক একটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে গিয়ে যে সব স্থায়ী জলাশয় তৈরি হতো, সেখানে প্রচুর মাছ চাষ করে ওই অঞ্চলে প্রোটিন সমস্যারও সমাধান করা যেতো।

কথাটা শুনে সত্যিই তখন আশান্বিত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তাই তো, এত বড় সমস্যার একটা সমাধান যে এত সহজ, সে কথা তো আগে মাথায় আসে নি?

গরমপানি যাওয়ার আগে ঘন্টাখানেকের এক বৈঠকে এ প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম নর্থ-ইস্টার্ন ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীসুব্রত মজুমদারের সঙ্গে।

বয়েস পাঁচের কোঠায়। প্রচণ্ড আশাবাদী ভদ্রলোক। শম্ভু সেন পরিচয় করিয়ে দিতেই ডঃ রামান্নার মন্তব্যটি তুলে ধরলাম তাঁর সামনে।

সুব্রতবাবু বললেন, ডঃ রামান্না ঠিকই বলেছেন। আসলে এ অঞ্চলে কতটা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, এতদিন সে কথা নিয়ে কেউ ভাবেনই নি, মিঃ কর। আমাদের এই কর্পোরেশনের জন্মই তো হলো সেদিন। বছর দেড় আগে। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা একটা হাই-পাওয়ার কমিটি করেছি। এই কমিটিই ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখছেন।

পূর্বাঞ্চলের এই সমস্যাটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি তাঁর সঙ্গে। তিনি বললেন এই সব জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির পেছনে

সমস্যাও যে নেই, তা বলব না। যেমন ধরুন, শুধু অরুণাচলেই পনের হাজার মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা যায়। কিন্তু করবেন কী করে। প্রথমত, সেখানে এমন জায়গা আছে, যেখানে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বসালে প্রচুর লাভ। কিন্তু এত দুর্গম সে সব জায়গা, না আছে পথ, না আছে সহজে পথ করার অবস্থা। পায়ে হেঁটে যাবেন, তাতেও সময় লাগবে দশ থেকে পনের দিন। এখন ভাবুন, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে গেলে সিমেন্ট চাই, লোহা চাই, বড় বড় যন্ত্রপাতি চাই। সে সব সেখানে নিয়ে যাবেনই বা কী করে? তবে আমাদেব ধারণা, সারা পূর্বাঞ্চলে পাঁচ থেকে সাত হাজার মেগাওয়াটেব মত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করাটা হয়ত অসুবিধে হবে না। এই বিদ্যুতের এদিকের চাহিদা মিটিয়েও পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহাবের বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটান যায়।

সুব্রতবাবু বললেন, ১৯৮৫ সালের মধ্যে এ অঞ্চলে কম করেও যাতে ৬০০ থেকে ৭০০ মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায়, আমরা তার চেষ্টা করছি। কাজ চলছে বনগাইগাঁও, কপিলি, রাঙ্গা নদী এবং আরও কয়েকটি জায়গায়। এছাড়া নির্ঝর এবং ছোট ছোট নদীর জল বেঁধে ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কথাও আমরা ভাবছি। যাদের উৎপাদন ক্ষমতা হবে তিন মেগাওয়াটের মত।

সমস্যা আরও আছে। বললেন, শম্ভু সেন। শুনেছেন হয়ত, ব্রহ্মপুত্রেব জল ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করে আসাম অঞ্চলের বন্যাটা নিয়ন্ত্রণের কথাও ভাবা হচ্ছে। এর জন্যে ডিহং-কে বাঁধতে হবে। সে বাঁধের উচ্চতা হয়ত দাঁড়াবে আটশ' ফুটের মত। তার জন্যে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান দরকার।

শম্ভুবাবুর কথায় মৃদু হাসলেন সুব্রতবাবু। মন্তব্য করলেন, যদি কোন দিন তা সম্ভব হয়, শুধু ডিহং-এর জল ধরেই যতটা বিদ্যুৎ আমরা তৈরি করতে পারব, তা দিয়ে সারা ভারতের চাহিদা হয়ত মিটিয়ে দেয়া যাবে। তবে সেই তৈরি করার আগে দেখতে হবে, তার চাপ সহ্য করার মত অবস্থা ওখানকার ভূস্তরে আছে কী না।

শুধু ডিহং নয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজেও হাত মিলিয়েছেন জিওলজিক্যাল সার্ভের ভূতাত্ত্বিকরা। আর তাঁদের সেই ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছি গরম-পানিতে গিয়ে। কপিলি বাঁধের কাজ দেখতে দেখতে। সেও আর এক অভিজ্ঞতা।

শিলং থেকে কপিলি যাত্রার মুখেই নামল বৃষ্টি। শম্ভু সেন জীপ চালকদের বললেন, সাবধানে যাবে, ভাই। তাড়াহুড়োর দরকার নেই। তারপরই ডান হাতের সেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিদায়। আমাকে বললেন, আপনার সঙ্গে ফের দেখা হবে কোহিমায়।

এবার জোয়াই-এর পথ। মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্যে কাটালাম মাওরিংনেংগ-এ। দেখলাম, জিওলজিক্যাল সার্ভের এখানেও তাঁবু পড়েছে। দেখা হল ডঃ নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ওঁরা এখানে কাজ করছেন আলট্রাম্যাফিক কার্বোনেটাইটের সন্ধানে। হ্যাঁ পাওয়া গেছে সন্ধান। এ ধরনের শিলাস্তর ভারতের উত্তর অঞ্চলে আর কোথাও পাওয়া যায় নি। ভূতাত্ত্বিকদের ধারণা, পৃথিবীর প্রায় ২০০ কিলোমিটার অভ্যন্তর থেকে গলিত অবস্থায় কিছু বস্তু একদা উপরে উঠে এসেছিল। তারপর কঠিন শিলায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

নির্মলবাবু বললেন, বসুন, মশাই। অন্তত চা তো খেয়ে যাবেন?

প্রস্তাব খারাপ নয়। এরই মধ্যেই ঘণ্টা দুই একটানা জীপে চড়া

হয়ে গেছে। বৃষ্টি আর নেই। তবে আকাশে মেঘ আছে। একটু শীত শীতও করছিল।

ওদিকে সুজিতবাবুর তাড়া। হারি-আপ। আমাদের দেরি হয়ে যাবে।

আমি বললাম, হোক দেরি। চা না খেয়ে এক পাও নড়ছি না।

আসলে ওটা উপলক্ষ্য। মতলবটা ছিল কিন্তু অন্য। সুজিতবাবুর কাছে মাওরিংনেংগ-এর নামটা শুনেই চমকে উঠেছিলাম আমি। মনে মনে দু-তিনবার নামটি আওড়ে নিলাম। হ্যাঁ, ঠিক আছে। মোটেই ভুল হয় নি আমার। এই তো সেই জায়গা।

তরলের মধ্যে ভারি বস্তু থাকলে সেই ভারি বস্তু যেমন নিচে নেমে যায়, আর হাল্কা বস্তু উপরে ভেসে ওঠে, অতীতে পৃথিবী যখন তপ্ত গলিত অবস্থায় ছিল, তখনও ব্যাপারটা ঘটেছিল ঠিক এই রকমই। সোডিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি রাজ্যের হালকা পদার্থ ভেসে রইল তার উপরের স্তরে। আর লোহা, তামা, নিওডিমিয়ম প্রভৃতি ভারি বস্তু পৃথিবীর গভীর অঞ্চলে নেমে গেল। পরবর্তীকালে তা ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন শিলায় রূপান্তরিত হয়ে তৈরি করে আলট্রামাফিক রক। দুশ' কিলোমিটার গভীর থেকে যে আলট্রাম্যাফিক শিলা এখানে পাওয়া গেছে তার মধ্যে আছে শতকরা দুই ভাগের মত নিওডিমিয়ম অকসাইড। বাণিজ্যিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে এর মান অত্যন্ত উঁচু। এছাড়া পাওয়া গেছে ট্যাণ্টালাম, সিজিয়াম, সিরিয়ম প্রভৃতি অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু। তবে যে কারণে আমি চমকে উঠেছিলাম, সে ব্যাপারে কেউই কিন্তু মুখ খুললেন না। পরে নির্ভরযোগ্য মহল থেকে জেনেছি, এই সেই জায়গা। তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে এখানে। থোরিয়াম এবং ইউরেনিয়াম। এখানকার এক জায়গায়

৬৫০ মিটার লম্বা এবং ১৫০ থেকে ২৫০ মিটার চওড়া একটি শিলাখণ্ড পাওয়া গেছে। তার গভীরতা কত এখনও তা জানা সম্ভব না হলেও এটুকু জানা গেছে ওই শিলার প্রতি দশ লক্ষ ভাগের তিনশ' ভাগ থোরিয়াম এবং পঞ্চাশ ভাগ ইউরেনিয়াম। এ তথ্য যদি সত্য হয়, বলতে হবে জিওলজিক্যাল সার্ভে একটি বড় রকম কাজ করেছেন।

মাওরিংনেংগ-এ আধ ঘণ্টার মত দাঁড়িয়ে আমরা জোয়াইর দিকে এগিয়ে গেলাম। পৌছলাম ঘণ্টাখানিকের মধ্যে। সুন্দর শহর। আশপাশের বনে নানান রঙের অর্কিড। প্রাচীন একটি গীর্জা। স্কুল, কলেজ, বিপণী। একটি মিষ্টির দোকানে চা খেতে গিয়ে মনে হল, আমরা ইটালি অথবা স্পেনের কোন কাফেটারিয়ায় ঢুকে পড়েছি। খাসিয়া ছেলেমেয়েরা চা খাচ্ছে। জটলা করছে। রেকর্ড প্লেয়ারে বাজছে জাজ। তার তালে তালে তাদের চলা ফেরা। ছেলে মেয়েদের মুখে কোন পার্থক্য নেই। কারোর কারোর পোশাক, চুল ইত্যাদিতেও। সত্যি কথা বলতে কি একজনকে আমি তো প্রায় 'মিস' বলেই সম্বোধন করতে চলেছিলাম। করেও ফেলতাম হয়ত যদি না তার দেহের বিশেষ অংশের দিকে আমার নজর পড়ত। নইলে না আছে দাড়ি, না গোঁফ—ভুল করাটা অন্যায় কী? মানে পরিবেশটা পুরোপুরি কনটিনেনট্যাল। ওদের কাছে আমরা বিদেশী। ইনডিয়ান।

স্ত্রী পুরুষ গুলিয়ে ফেলার ব্যাপারে পুরনো একটি স্মৃতি মনে পড়ল। গত বছর পশ্চিম বার্লিন গিয়েছিলাম। ওই সময় একদিন ঠিক করলাম পুব বার্লিনে একবার ঘুরে এলে কেমন হয়? ভাবার সঙ্গে সঙ্গে কনডাকটেড ট্যুরের টিকিট কেটে ফেললাম। তারপর যথাসময়ে বাসের সিটে বসতে গিয়ে দেখি, আমার পাশের সিটে কে একজন বসে রয়েছেন। বেশ ছোটখাটো চেহারা। বোধ হয়

শীতকাতুরেও কিছুটা। আপাদমস্তক গরম পোশাকে ঢাকা। পাশা-পাশি বসে থাকতে থাকতে এক সময় আলাপ হল। তারপর অনর্গল কথাবার্তা। বেশির ভাগই নাটকের কথা। অথবা সিনেমার কথা। প্রসঙ্গত কলকাতার রঙ্গমঞ্চ এবং যাত্রার কথা উঠল। সত্যজিৎ রায়ও বাদ গেলেন না। দেখলাম অনেক খবরই তিনি রাখেন। কথা বলতে ভাল লাগছিল। আমিও সারা পথটা মুখর হয়ে ছিলাম। কখনও উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁর পিঠে করাঘাতও করেছি।

তারপর যাত্রার শেষে আবার যখন পশ্চিম বার্লিনে ফিরে এসে তাঁর দু-হাত সজোরে চেপে এবং পিঠে মৃদু কর বুলিয়ে বললাম, মিঃ, নাটক নিয়ে কথা বলে দারুণ কাটল সময়টা। আমার কথা শুনে তিনি তো হাঁ। দু' চোখ কপালে তুলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের সুরে তিনি বললেন, আমি জানি, এ ভুলটা আপনি গোড়া থেকেই করে যাচ্ছেন, মশাই। আমি মিস্টার নই, মিস্।

আমি তো থ। বলেন কী? তাঁকে দেখে কে বুঝবে যে তিনি মিস্, মিস্টার নন। না। শেষ পর্যন্ত জটিলতা কিছু হয় নি। আমরা হেসেই পরস্পর বিদায় নিয়েছিলাম।

জোয়াই-এর রেস্তোরাঁয় এ ধরনের পরিস্থিতি যে ঘটেনি, ভাগ্য ভাল।

জোয়াই-এর পর পাহাড়ী ঢাল নিচের দিকে। এবার সমভূমি না হলেও উচ্চতা অনেক কমে এসেছে। মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত। পুকুর। আর সেই সঙ্গে রাস্তার লাল মাটি। এদিকের রাস্তায় এখনও পিচ পড়েনি। ফলে ঘণ্টাখানিক চলতেই আমাদের চেহারাটা পালটে গেল।

বিকেল চারটে নাগাদ পৌঁছলাম কপিলি নদীর ধরে। কাকচক্ষু

জল। অগভীর নদী। কিন্তু স্রোতস্বিনী। ফেরির সাহায্যে ওপারে চলে গেলাম।

সুজিতবাবু বললেন, আমরা মেঘালয় ছেড়ে এলাম। এ-পাড়টা আসাম। আর আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে তার নাম গরমপানি। আসুন, এখানকার ইনসপেকশন বাংলোতে আমাদের আশ্রয়টা নিয়ে নিই। তারপর একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার মিঃ বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলাই আছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে। কপিলি প্রোজেক্ট ঘুরে দেখাব সব ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন।

মজবুত বাঁধ দিলেও বিবাট একটি জলাধারের জল যে কত রহস্য-জনকভাবে অদৃশ্য পথে হারিয়ে যেতে পারে, কপিলিতে না এলে সে অভিজ্ঞতা হয়ত কোনোদিনই আমি পেতাম না। মানুষের কাহিনীতে রোমাঞ্চ থাকে। মনে হল কপিলিই বা কম রোমাঞ্চকর কি?

ছয়

এক পাশে কপিলি, আর এক পাশে উমরং। এই দুই নদীর স্নিগ্ধ জলধারার উপর নির্ভর করেই গড়ে তোলা হচ্ছে কপিলি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। স্নিগ্ধ! হ্যাঁ, স্নিগ্ধ বলেই মনে হয় এখন। এই এপ্রিলে। স্রোত আছে। কিন্তু সে স্রোতে তেমন বেগ নেই। তার দুপাশে উঁচু পাহাড়। জঙ্গলাকীর্ণ। গ্র্যানাইট পাথরের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। তেমন গভীরও নয়। নদীর বুকে কোন কোন জায়গায় ছোট ছোট পাথুরে দ্বীপ। সেখানে এ ধরনের দৃশ্য এই এপ্রিলেই দেখা

যায়। এব পর নামবে বর্ষা। ব্রীড়ানম্র কপিলি তখন •রাক্ষসী পাথুরে দ্বীপগুলি তখন অদৃশ্য হয়। কপিলির গভীরতা এখানে দাঁড়ায় দুশ' ফুটের মত। তার প্রচণ্ড স্রোত, প্রচণ্ড গর্জন বনের পশুপাখিদের বুকও যেন শুকিয়ে দেয়।

গরমপানি ইনসপেকশন বাংলোয় এতটুকু দেরি করি নি। বিকেল অনেকটা গড়িয়ে গেছে। সন্ধে নামার আগেই আমাদের কপিলি বাঁধের কাজ দেখার কথা।

বাংলোর লাউঞ্জেই দেখা হল শ্রীসুকান্ত রায়ের সঙ্গে। সুকান্তবাবু সিনিয়র জিওলজিস্ট। পাতলা চেহারা। চারের কোঠায় বয়েস। প্রথম সাক্ষাতেই মনে হল, পেশায় ভূতাত্ত্বিক হলেও এ লোকটি আরও অনেক কিছু নিয়েই ভাবেন। অনেক কিছুর সঙ্গেই তিনি অন্তরঙ্গ। তবে বাইরে থেকে চট করে বুঝে ওঠা শক্ত। প্রচণ্ড আত্মসচেতন।

সুকান্তবাবু বললেন, আসুন। আপনারা অনেক দেরি করে ফেলেছেন। হ্যাঁ, ইনি মিঃ প্রকাশ। কপিলি প্রজেক্টের রেসিডেনসিয়াল জিওলজিস্ট।

বলেই তাঁর পাশের ভদ্রলোকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মিঃ প্রকাশের বয়স তিরিশের কোঠায়। আগে জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ্ ইনডিয়াতেই কাজ কবতেন। এখন নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের রেসিডেনসিয়াল জিওলজিস্ট হিসেবে কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের হয়ে কাজ করছেন।

প্রকাশ বললেন, সুকান্তবাবু, সময় তো কম। এখন বরং কপিলি বাঁধটার কাছ থেকে ঘুরে আসি আমরা। মিঃ বিশ্বাসকে সেখানে তাঁর অফিসেই হয়ত আমরা পেয়ে যাব। তাঁকে আমি খবর দিয়ে রেখেছি।

সেই ভাল। বললেন সুকান্তবাবু।

বাংলোর চত্বর থেকে আমাদের জীপের দৌড় শুরু হলো আবার। বাংলোর গেট থেকে ঢালু রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে বাঁ দিকে গলি পথ। সেই গলি পথ ধরেই আমরা চলতে লাগলাম।

বাঁকের মুখ পেরনোর সময় সুকান্তবাবু ডান দিকের একটি মেটে পথ দেখিয়ে বললেন, মিঃ কর, এই গলি ধরে মিনিট তিনেক হাঁটলেই দেখতে পাবেন একটি প্রস্রবণ। উষ্ণ প্রস্রবণ। তা, মশাই, জল প্রায় ষাট থেকে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসের মত গরম। স্থানীয় লোকেরা প্রস্রবণটিকে বলে গরমপানি। তার থেকেই জায়গায়টার নাম গরম-পানি হয়েছে। এটা আসামের উত্তর কাছার জেলার মধ্যে পড়ে। কাল সকালে এসে প্রস্রবণটা দেখে নেবেন একবার। ইচ্ছে করলে চানও করতে পারেন। বহু লোকই তো এখানে চান করতে আসে।

আসে তবে বেশির ভাগই তারা স্থানীয় অধিবাসী। কোনদিন এ অঞ্চলে কোন লোকালয় ছিল বলে মনে হয় না। আর দুর্গম এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষ কী নিয়েই বা বাঁচবে? না আছে চাষের জমি। শুধু আগাছার বন। এর থেকে একটু এগিয়ে গেলে চোখে পড়বে বিরাট জঙ্গল। সে জঙ্গলের বিস্তার কাজিরাঙ্গা পর্যন্ত।

মাত্র কয়েক বছর আগে ঠিক হলো, রাক্ষসী কপিলিকে বাঁধতে হবে। তৈরি করতে হবে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। প্ল্যান পাকা হতে গেলে আরও কিছুদিন। তারপর কাজের শুরু। জনহীন এই অঞ্চলে একে একে শোনা গেল মানুষের পদধ্বনি। পাথর কেটে, মাটি চাষ শুরু হল পথ তৈরির কাজ। দলে দলে মজুর এল। তাদের ছাউনি পড়ল কপিলি নদীর উঁচু পাড় বরাবর।

শিলং-এ কথা প্রসঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিদ্যুৎ পর্ষৎ-এর চেয়ারম্যান

সুব্রত মজুমদার মন্তব্য করেছিলেন, এদিকে বড় বড় প্রজেক্টে হাত দেওয়ার সময় একটা মস্ত বড় সমস্যা ওই মজুরদের নিয়ে। আপনি স্থানীয় মজুর পাবেন না। কনস্ট্রাকশন বলুন, আর মাইনিং-ই বলুন, আপনাকে নির্ভর করতে হবে প্লেনের মজুরদের ওপর। ওদের জোগাড় করে আনে কনট্র্যাকটররা। বেশির ভাগই মালদহ অথবা মুর্শিদাবাদ জেলার লোক। ওড়িশা থেকেও আসে প্রচুর। এসব মজুর আনতে গিয়ে নানা রকম বায়নাক্কা সহ্য করতে হয় আমাদের। তাদের আগাম গাড়িভাড়া দেওয়া, থাকার ব্যবস্থা, এমন অনেক কিছু। বংশ পরম্পরায় ওরা দলবদ্ধভাবে কাজ করতে আসে। কোন জায়গায় হয়ত দেখবেন শুধু মুর্শিদাবাদেব লোক। এসেছে ফারাক্কা, কিংবা ধুলিয়ানা গ্যাঞ্জেস থেকে। কোথাও বা গঞ্জামের লোকে ভর্তি।

গরমপানির পথ চলতে গিয়ে তার প্রমাণ পেলাম। প্রজেকটের কাজে যে সব মজুর কাজ করছে তারা সবই প্রায় মুর্শিদাবাদ এবং ওড়িশা থেকে এসেছে।

তৈরি হয়েছে দৈনিক বাজার। দোকানপাট পর্যন্ত বসেছে। তৈরি হয়েছে সরকারী কর্মীদের বাসা, পোস্ট অফিস এবং থানা। খড়ের চালের নিচে চায়ের দোকান অথবা রেস্তোরাঁ, তাও চোখে পড়বে আপনার। অসমিয়া, বাঙালী, নেপালী, আরও অনেক সম্প্রদায়ের মানুষই এখানে দোকান হাট খুলে বসে আছে। একদার বনরাজ্য 'গরমপানি' ক্রমে শহর হয়ে উঠেছে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই আমাদের জীপ এসে দাঁড়াল একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপ্রণব বিশ্বাসের অফিসের সামনে। আশপাশের তুলনায় এ দিকটা অনেক উঁচু। খানিকটা দুর্গমও বটে।

জীপের শব্দে প্রণববাবু অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন।

সুকান্তবাবু তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনিই মিঃ প্রণব বিশ্বাস। কপিলি প্রজেকটের কনস্ট্রাকশনের দায়িত্ব এঁর হাতে।

বয়েসে তরুণ। এবং অত্যন্ত আমুদে। সুকান্তবাবুর কথায় মন্তব্য করলেন, আর দায়িত্ব! দায়িত্ব এখানে কার নেই, বলতে পারেন? এখন আমরা মস্ত বড় সমস্যার সামনে পড়ে গেছি! রীতিমত ভূ-তাত্ত্বিক সমস্যা। বলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুকান্তবাবুর দিকে চাইলেন তিনি।

লক্ষ করলাম, মুহূর্তে সুকান্তবাবু যেন গম্ভীর হয়ে উঠলেন! তারপর নিম্ন কণ্ঠে বললেন, জানি। সিংক হোল ইজ এ বিগ প্রবলেম।

সিংক হোল মানে? কথাটা কানে যেতেই প্রশ্ন না করে পারলাম না।

কাল সকালে নিয়ে যাব এখন। নিজে চোখেই দেখুন না, সিংক হোল কাকে বলে? জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে এখানে বিরাট জলাধার তৈরির কাজ চলছে ঠিকই, কিন্তু জলাধারের নিচে যদি এতো ফুটো থাকে, জানি না কতটা জল শেষ পর্যন্ত আমরা জমিয়ে রাখতে পারব! বললেন সুকান্ত রায়।

প্রণববাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমরা যেখানে বাঁধ তৈরি হচ্ছে সে দিকে এগিয়ে গেলাম।

প্রণববাবু বলছিলেন, কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে আমরা দুটি স্তরে ভাগ করে নিয়েছি, মিঃ কর। এখানে তো কপিলিকে দেখছেন? আর ওই যে, পশ্চিম দিকের ও দিকটায় আছে আরও একটি নদী। নাম উমরং। কপিলি এবং উমরং দুটি নদীকেই আমরা বেঁধে ফেলার কাজ শুরু করেছি।

এদিকটায় পাহাড়ের উচ্চতা কিছু বেশি। এ-পাড়ে পাঁহাড়, ও-পাড়ে পাহাড়। পাহাড়ের পাড় খাড়াই নেমে গেছে। বলতে পাবেন একেবারে নব্বই ডিগ্রি খাড়াই। পাড়ের ধার বরাবর পা বাড়াতেই সুজিতবাবু খপ করে আমার হাতটি চেপে ধরলেন।—না, না। দাস ফার, নো ফারদার। ডিনামাইট দিয়ে পাথর কাটা হয়েছে, মশাই। কোথায় কোন্ চাঙড় আলগা হয়ে আছে, কে জানে? পা পড়লে একেবারে পাতালে প্রবেশ।

মুহূর্তে শরীরের শিরা-উপশিরার মধ্যেকাব রক্ত যেন জমে হিম হয়ে গেল। কি সাংঘাতিক! আমি তো প্রায় ছিটকেই পিছু সবে এলাম।

হাসলেন সুজিতবাবু।—ভয় পেলেন না কি? অতটা ভয় পাওয়ার কারণ নেই। তবে এসব জায়গায় চলাফেরা করতে গেলে যতটা সম্ভব সাবধান হতেই হয়। তবে তাতেও যে বিপদ এড়ানো যায় সব সময়, তা বলব না। পায়ের নিচে দেখছেন কঠিন পাথর। কিন্তু তাব নিচে যে কী আছে সব সময় আগাম কি সেটা আমরা বুঝতে পারি? যেমন ওই সিংক হোলের কথাই ধরুন।

বাঁধ তৈরি হচ্ছে দুটি। কপিলির বুকে তৈরি হচ্ছে খানডং বাঁধ। এটাই বড়। প্রায় আট শ’ ফুট লম্বা। আর উঁচু প্রায় দু শ’ আশি ফুট। বাঁধের বুকে থাকবে নয়টি দরজা। কপিলির জলাধার থেকে ওই দরজা থেকে প্রচণ্ড বেগে জলের তোড় নেমে আসবে। এদিকের মূল পাথর বলতে কঠিন গ্র্যানাইট। ডান পাড়ে পাথরের ফাঁকে কিছুটা অভ্রের স্তরও আছে। আছে পেগমাটাইট পাথরের স্তর। ভূতাত্ত্বিকদের ভাষায় যাকে বলা হয় ‘ভেইন’। প্রায় তিন ফুট পুরু। তবে উঁচু পাড়ের ওপরের দিকে মাটির স্তরই বেশি। উমরং বাঁধের

ভূ-প্রকৃতিও কতকটা এই রকম।

একই সঙ্গে চলেছে ছুটি টানেল তৈরিরও কাজ। একটি খানডং বাঁধের সঙ্গে জোড়া। এটি লম্বায় হবে ২·৬ কিলোমিটার। খানডং জলাধারের জল এই টানেলের মধ্যে দিয়েই গিয়ে হাজির হবে জেনারেটার কক্ষে। পরিবর্তে দেবে বিদ্যুৎ শক্তি।

তবে উমরং বাঁধের টানেলটি আরও বড় হবে। প্রায় ৫·১ কিলো-মিটার। উমরং জলাধারের জল এই টানেলের মধ্যে দিয়ে ৫·১ কিলো-মিটার পথ এগিয়ে গিয়ে তবেই চালু করবে আর একটি জেনারেটার।

না প্রচুর মেহনত। প্রচুর অর্থ ব্যয়। তার অপচয় যতটা বাঁচানো যায় সে দিকটাও দেখতে হবে বইকি? আর তার জন্যেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে বিস্তর। টানেলের মধ্যে দিয়ে খানডং-এর জল নিয়ে গিয়ে প্রথম জেনারেটার স্টেশনের কাজ শেষ করার পর সেই জল ঢালু বইয়ে দেওয়া হবে উমরং জলাধারের দিকে। ফলে শুধু উমরং নদীর জলই নয়, উমরং জলাধার কপিলি নদীর জলেও পরিপুষ্ট হতে পারবে।

পাড় থেকে প্রায় আট শ' ফুট নিচে খানডং বাঁধ তৈরির কাজ চলছিল তখন। শত শত মজুর পাথর আর কংক্রিটের ঝুড়ি মাথায় করে যন্ত্রের মত চলাফেরা করছে। ওদিকে পাথরের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে আসছে কপিলির জলধারা। বাঁধের এক পাশে তৈরি করা হয়েছে একটি টানেল। সেই জল আল বেঁধে এক পাশে সরিয়ে এনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই টানেলের মধ্যে। টানেল-পথে জল বিভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। ফলে বাঁধ তৈরির জায়গাটা শুকনো। শুকনো পাথরের বুকে কংক্রিট আর আশপাশের পাহাড় থেকে কেটে আনা গ্র্যানাইটের চাঁই বসিয়ে চলছে বাঁধ তৈরির কাজ।

খানডং জলাধার থেকে কতটা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবেন

বলে মনে করছেন আপনারা ? প্রণববাবুকে জিজ্ঞেস করলাম।

প্রণববাবু বললেন, প্রথম দিকে অকটোবর থেকে মে মাসের মধ্যে পবিমাণটা বারো মেগাওয়াটের মত দাঁড়াবে বলেই মনে হয়। তবে জুন থেকে সেপ্টেম্বরে এই পরিমাণ বেড়ে পঞ্চাশ মেগাওয়াটের মত হবে। পরে এই পরিমাণ যথাক্রমে ৪০ এবং ৫০ মেগাওয়াটে দাঁড়াবে।

১৯৮১ সালের মধ্যে উমরং বাঁধের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তবে খানডং শেষ হতে সময় লাগবে আরও কিছুটা বেশি।

প্রকাশ বললেন, এই সব অঞ্চলে কাজ কবার ঝামেলা অনেক, মিঃ কর। খানডং-এব পাথবের গঠন দেখে গোড়ায় কনস্ট্রাকশনেব কাজ তো আমরা ঠিকই চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ কিছু দিন আগে এই বাঁধের কাছেই ধরা পড়ল একটি ফল্ট। চ্যুতি। এই ফল্টটিকে এখন আমাদের ভালভাবে পবীক্ষা করতে হবে। নইলে এত খরচ, এত মেহনত সব পণ্ডশ্রমে দাঁড়াবে। এছাড়া সিংক হোল-ও একটা বড় রকমের সমস্যা।

গত কয়েক বছর ধরে জিওলজিক্যাল সার্ভে এ অঞ্চলে অনুসন্ধান চালিয়ে আসছে। খানডং এবং উমবং—ছুটি জলাধারই তৈরি হচ্ছে পাহাড় পরিবেষ্টিত ছুটি উপত্যকায়। অবশ্য উপত্যকা বললে ভুল হবে। বরং বলি গিরিখাত। এই খাতের ভেতর দিয়েই বয়ে চলেছে কপিলি এবং উমরং। নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে জল আটকিয়ে তৈরি হচ্ছে জলাধার। তা হোক। কিন্তু হঠাৎ একটি বড় রকমের সমস্যা দেখা দিল। জলাধার ছুটি যে যে জায়গায় তৈবি হচ্ছে তাদের কাছেই ডিয়াং উপত্যকা। ভূতাত্ত্বিকরা দেখলেন, এই উপত্যকাই শুধু নয়, ওই ছুই জলাধারের জায়গা থেকে এ অঞ্চলের বেশ কিছু জায়গায় ভূ-

স্তরের নিচে রয়েছে অজস্র ফাটল। কোন কোন জায়গায় টানেলের মত সুড়ঙ্গ। এই সুড়ঙ্গকেই আমরা সিংক হোল বলি। কোথাও বা বড় বড় গুহা। এসব জায়গায় কঠিন গ্র্যানাইটের পরিবর্তে ছড়িয়ে রয়েছে চুনা পাথরের স্তর।

ভোলাগঞ্জে যে চুনা পাথরের পাহাড় দেখছেন, সেই পাহাড়েরই একটি অংশ মাটির নিচ দিয়ে কঠিন ভূস্তর হিসেবে এগিয়ে এসেছে এখানে। মন্তব্য করলেন সুকান্তবাবু। জলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে এই চুনা পাথরের স্তরে তৈরি হয়েছে বড় বড় সুড়ঙ্গ।

তাতে অসুবিধেটা কোথায় ? আমার প্রশ্ন।

বিরাট অসুবিধে। বললেন সুকান্তবাবু। ভাবুন, জলাধার তৈরি হল। বাঁধ দিয়ে তার জল আটকালেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল জলাধারের নিচে যে কঠিন ভূস্তর তার সামান্য নিচেই এক-একটি সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ হয়ত ভূস্তরের আরও গভীরে নেমে গেছে। তারপর এক জায়গায় ওই বাঁধের ভিত্তিরও নিচ দিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে পড়েছে। যেন আপনার জলের ট্যাঙ্কের নিচে কতকগুলি অদৃশ্য নল। এতে অবস্থাটা কী দাঁড়াতে পারে একবার চিন্তা করুন। চোরা পথে জলাধারে জমিয়ে রাখা জল যদি চলে যায়, জলাধারে জলের পরিমাণ খুব তাড়াতাড়ি কমে যাবে। যা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করবে।

কতগুলি সিংক হোলের এ পর্যন্ত আপনারা সন্ধান পেয়েছেন ?

১৯৮টি ! তবে মনে হচ্ছে, সন্ধান করলে আমরা আরও পাব। ট্রেসারের সাহায্যে আমাদের কাজ চলছে। ট্রেসার বলতে আমি তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক যৌগের কথা বলছি। এখানকার নদীর জলে কিংবা অন্য কোন জলধারায় সেই রাসায়নিক বস্তুর যৎসামান্য আমরা

ছেড়ে দিই তারপর কাউণ্টারের সাহায্যে দেখে নিই কতদূর পর্যন্ত তার তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়ছে। আর তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়া মানেই বুঝতে হবে সেখানে জল-প্রবাহের সঙ্গে সেই রাসায়নিক যৌগটি গিয়ে হাজির হয়েছে। যদি দেখা যায় এমন জায়গায় সেই রাসায়নিক যৌগের অস্তিত্ব ধরা পড়ল যেখানে নদীর জলাধার চোখে পড়ার মত কোন পথেই এগিয়ে যায় নি, তখন বুঝতে হবে, অন্য কোন পথে রাসায়নিক যৌগ সেখানে এসে হাজির হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সিংক হোল তেমন একটি পথ হতে পারে।

প্রণববাবু বললেন, এর জন্যেই খানডং ড্যামের জল যে টানেলের মধ্যে দিয়ে উমরং ড্যামে নিয়ে গিয়ে ফেলার আমরা পরিকল্পনা করেছি তার কাজ পিছিয়ে যাবে, মিঃ কর। কারণ, যে পথ ধরে ওই টানেলটি তৈরি করার কথা তার আশপাশে বেশ কিছু সিংক হোলের আমরা সন্ধান পেয়েছি। জিওলজিক্যাল সার্ভের সহযোগিতায় এ নিয়ে আরও অনুসন্ধান চলছে। অনুসন্ধানের পর দেখতে হবে, কত কম খরচে ওই সুড়ঙ্গগুলি বন্ধ করে দেওয়া যায়। তারপর খানডং এবং উমরং ড্যামের সংযোগ-টানেলটি তৈরি করব।

কথা বলতে বলতে অদূর অরণ্যের আড়ালে সূর্য কখন অদৃশ্য হয়েছে, বুঝতেই পারি নি।

সুজিতবাবু তাঁর স্বভাবসুলভ মিলিটারি কায়দায় বললেন, আজকের মত ডিস্মিস। সারাদিন বহুৎ হয়েছে দৌড়-ঝাঁপ।

কপিলির পাড় থেকে আমরা ফিবলাম। প্রণববাবুর অফিসের পাশ দিয়ে একটু সামনে এগোলেই পাওয়ার হাউস। জলবিদ্যুৎ এখনও আসেনি। সেই বিদ্যুৎকে আবাহন জানানর জন্যেই বুঝি ডিজেল জেনারেটার জ্বালিয়ে দিয়েছে বিদ্যুতের আলো। কাজ।

আরও কাজ। বিশ্রামের সময় নেই। কাজ চলছে ওয়ার্কশপে। বাঁধে। দিন রাত। অত্যন্ত আরও কিছুদিন। যতদিন না বর্ষা আসে। তন্বী, লাস্যময়ী কপিলি যতক্ষণ না রাক্ষসীর রূপ ধারণ করে। তখন বাঁধের কাজে ভাঁটা পড়বে। সে এক মস্ত বড় অপচয়।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলাম, প্রণববাবু, কপিলির জলের মাত্রা কত, বলুন তো?

অবাক হবেন, মশাই। বললেন প্রণববাবু। এখন আর কত, বড় জোর নব্বই কিউসেক। কিন্তু এই নদীই ভরা বর্ষণে জল বইবে ৪,৮৮,০০০ কিউসেকের মত।

পার্বত্য নদীর যে কী প্রচণ্ড ক্ষমতা, ভাবাই যায় না।

মুহূর্তে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম হয়ত। ক্ষণিকের জন্যে মনের কোণায় একটা ছবি ভেসে উঠেছিল। ভাবছিলাম, আজ থেকে দশ বছরের মধ্যে কপিলি প্রজেকটের কাজ হয়ত শেষ হবে। তখন এ অঞ্চলে গড়ে উঠবে একটি পরিকল্পিত শিল্পনগরী। হাতের কাছে চুনা পাথর। আছে গ্র্যানাইট। তাদের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠবে সিমেন্টের কারখানা। পাশেই বিরাট অরণ্য। সেই অরণ্যের কাঠ, লতাপাতা—এদের নিয়ে হয়ত গড়ে উঠবে কাগজের কল অথবা রাসায়নিক কারখানা। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে তখন এ অঞ্চলের মুখে হাসি ফুটবে।

সম্বিৎ ফিরে পেলাম প্রণববাবুর কথায়। ভদ্রলোক অদূরে বিরাট জঙ্গলের দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, যখন প্রথম এখানে আসি তখন তো ভয়ই করত। দলে দলে হাতি আসত এদিকে। কত রকমের গাছপালা ওই জঙ্গলে। শাল, মাকাই, নাগেশ্বর আরও কত কী। বাঁশ পাবেন অফুরন্ত। এই জঙ্গল কাজিরাঙ্গা পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে।

আমাদের এই কনসট্রাকশন সাইটেই ওই জঙ্গল থেকে দিনের দিকেই কত হরিণ আসতে দেখেছি। আর বন মুরগীর তো কথাই নেই। মাঝে মাঝে চিতাও আসত এদিকটায়। তবে মানুষের ভিড় বাড়ায় ওইসব বন্য পশু এদিকটায় বড় কম আসছে এখন।

সন্ধে সাতটা নাগাদ আমরা বাংলোয় ফিরলাম। প্রণববাবু তাঁর বাসায় চলে গেলেন। মিঃ প্রকাশ এলেন আমাদের সঙ্গে। তিনি এখনও বাসা পান নি। সপরিবার তিনি বাংলোতেই উঠেছেন। পরিবার বলতে অবশ্য তাঁর স্ত্রী এবং ছোট্ট একটি বাচ্চা।

বাংলোতে এসেই প্রথমে স্নান। সারাদিনে গায়ের ওপর প্রায় এক ইঞ্চি পুরু লাল মাটির আস্তরণ জমে গিয়েছিল। শুধু আমরাই নয়, সবারই। মনে হল স্নানের পর কিছুটা ভদ্রস্থ হয়েছি। এখন রিল্যাকস্ করা। সমরজিৎ চক্রবর্তী তাঁর ট্র্যানজিস্টার চালিয়ে দিলেন। অমরবাবু তাঁর ঝোলা থেকে বের করলেন দু প্যাকেট তাস। বললেন, রিক্রিয়েশন বলতে আমাদের তো কিছু নেই। কাজের অবসরে ট্র্যানজিসটার শোনো, আর পার্টনার পেলে তাস খেলো। চলে নাকি মশাই, তাসটাস ?

জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে বলছেন ?

হ্যাঁ, আপনাকেই তো বলছি। অমরবাবুর উত্তর।

কী খেলবেন ?

ব্রীজ।

সসঙ্কোচে বললাম, খেলতে পারি, কিন্তু ভুলচুক হলে বকবেন না যেন।

হেসে উঠলেন অমরবাবু। বললেন, পাগল হয়েছেন। কে কাকে বকে। আমরাও নভিস। আসুন, দু হাত হয়ে যাক।

বসতে হলো। আমার পার্টনার হলেন সমরজিৎ চক্রবর্তী। আর অমরবাবুর সঙ্গে বসলেন অপূর্ব চৌধুরী। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মনে হল, হচ্ছেটা কী? তাস খেলা হচ্ছে, না জিওলজির ক্লাস চলছে। তাস খেলার ফাঁকে ফাঁকে আমার ভূতাত্ত্বিক বন্ধুরা কখন যে সিলেট ট্র্যাপ, স্যানগুস্টোন, লাইমস্টোন এসব নিয়ে সংলাপ শুরু কবেছেন, প্রথমে আমি খেয়ালই করি নি। খেয়াল করলাম তখন, যখন দেখলাম খেলায় সবাই আমরা আকছার ভুল করতে শুরু করেছি। আর পরক্ষণেই আবিষ্কার করলাম, ভূতত্ত্ব সম্ভবত ওঁদের মজ্জার মধ্যে গেঁথে গেছে। ঘুমেব সময়ও হয়ত ওঁরা স্বপ্ন দেখেন পশ্চিম গারো পাহাড়ের গণ্ডেয়ানা পাথরের; মিকির পাহাড়ের বাইওটাইট অথবা জয়ন্তিয়া পাহাড়েব দিসাং শিলাস্তবের ধূসব বেলে পাথর।

এক সময় হাতেব তাস টেবিলেন ওপর ছড়িয়ে ফেলে বললাম, সুজিতবাবু, আপনার অনুকরণেই বলি, ডিসমিস। বুঝতে পারছি, আপনারা হোল টাইম প্রোফেশনাল। আমার শুধু ভয়, আপনাদের গিন্নিরা হয়ত মাঝে মাঝে পাথর নিয়ে তাড়া করেন আপনাদের!

কী বললেন? গিন্নিরা তাড়া করবে—হাতের কাছে পেলে তো? আমবা তো সব সময় পাথরের আড়ালেই থাকি, মশাই। আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন তিনি। মাঝ পথে থেমে পড়ে বাঁকা চোখে চেয়ে নিলেন আমাকে একবার। তারপর বললেন, দুঃখিত। বুঝতে পারছি, খেলাটি মাটি করলাম আমরা।

বাধা পড়ল। ক্যানটিনের ছেলেটি এসে জানালো, রাত সাড়ে দশটা, স্যার। খাবার ঠাণ্ডা হাচ্ছে।

অতএব সেদিনের মত এখানেই ইতি।

সাত

পরদিন ঘুম ভাঙ্গল ভোর পাঁচটা নাগাদ। সমরজিৎ চক্রবর্তী তার আগেই বাংলোর লনে প্রাতঃভ্রমণ শুরু করে দিয়েছেন। মুখে ব্রাশ।

আমাকে দেখেই হাঁক মেরে উঠলেন তিনি। আরে আসুন, আসুন। ব্রাশ করতে করতে প্রস্রবণ দেখে আসি।

গতকাল থেকেই উষ্ণ প্রস্রবণ দেখার জন্যে উন্মুখ হয়েছিলাম। বললাম, এক মিনিট দাঁড়ান। ব্রাশ নিয়ে আসি। দেখলাম অমর-বাবুও উঠেছেন এরই মধ্যে। অজিতবাবুও ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত। মানে ব্যাটেলিয়ানের ব্যাপার।

দেরি না করে আমরা সবাই গেলাম গরমপানির উষ্ণ প্রস্রবণ দেখতে। হাঁটা পথে মাত্র কয়েক মিনিট।

গিয়ে দেখি এরই মধ্যে স্নানার্থীর ভিড় জমে গেছে। দশ ফুট চওড়া এবং পনের ফুট লম্বা একটি চৌবাচ্চা। এক সময়ে পাথরের বুক থেকেই গড়িয়ে পড়ত জল। সম্প্রতি চৌবাচ্চার মত বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই চৌবাচ্চায় ভূগর্ভ থেকে এসে জমছে গরম জল। জলে গন্ধকের তীব্র গন্ধ। ভূস্তর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে গ্যাস। সেই গ্যাস ঝলকে ঝলকে রাশি রাশি বুদবুদ সৃষ্টি করে জলের মধ্যে দিয়ে এসে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে উঠছে উষ্ণ বাষ্প। চৌবাচ্চার সঙ্গে লাগান হয়েছে নল। প্রস্রবণের জল সেই

নল বেয়ে বাইরে পড়ছে। সেই জলেই স্নান করছে সবাই।

গরমপানির এই উষ্ণ প্রস্রবণে উষ্ণ জলের সঙ্গে গভীর ভূস্তর থেকে বেরিয়ে আসছে নানা রকম গ্যাস। তার মধ্যে প্রধান সালফার ডাই-অকসাইড। সে নিয়ে কোন চিন্তা নেই। ভূতাত্ত্বিকরা চিন্তিত আর একটি গ্যাসের ব্যাপারে গ্যাসটির নাম র‍্যাডন।

ব্যাপার কি জানেন? বললেন অমরবাবু। প্রায়, সব উষ্ণ প্রস্রবণ থেকেই কিছুটা র‍্যাডন পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে র‍্যাডনের মাত্রা বেশি। আর অতিরিক্ত র‍্যাডন মানেই ভূমিকম্পের ইঙ্গিত। এর জন্যেই এখানকার র‍্যাডনের মাত্রা নিয়মিত মোনিটর করার ব্যবস্থা চলছে।

কথাটা শুনে কেমন যেন খটকা লাগল আমার। তাই যদি হয়, তাহলে এত তোড়জোড় করে এখানে ড্যাম তৈরি করা হচ্ছে কেন? ঈশ্বর না করুন, যদি কখনও এখানে তেমন বড় রকমের কোন ভূমিকম্প ঘটে, ড্যামের কোন ক্ষতি হবে না তো? আমি কোন মন্তব্য করি নি।

সাতটা নাগাদ প্রস্রবণ দেখে ফিরলাম। তারপর ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা সদলে গেলাম এখানকার বিখ্যাত ইয়েল জলপ্রপাত দেখতে। এ যাত্রায় জীপে আমার সঙ্গী হলেন সুকান্তবাবু।

এবার আর রাজপথ নয়। জঙ্গলা রাস্তা। বড় বড় গাছ পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। বেশির ভাগই ওয়াইলড্ ওক। সবুজ ওক বনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে একটা কথা মনে পড়ল। সুকান্তবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন জায়গার গাছপালা দেখেও তো সেখানকার ভূতাত্ত্বিক চরিত্র বোঝা যায়?

সুকান্তবাবু বললেন, যায়। এই দেখুন না, আমরা এই যে ওক

বনের মধ্যে দিয়ে চলেছি, এখানকার মাটি খুঁড়ুন, দেখবেন 'সেল' বেরিয়ে পড়ছে। তার মানে এ অঞ্চলটি এক সময়ে সমুদ্রের নিচে ছিল। সমুদ্রের নিচের মাটির সঙ্গে তখন মিশে গেছে জীবদেহ। প্রাণী এবং উদ্ভিদ। তারাই ক্রমে ক্রমে বিশেষ এক ধরনের ভূস্তর সৃষ্টি করেছে। যাদের বলতে পারেন 'সেল'। এই সেলের মধ্যেই খনিজ তেল এবং গ্যাস পাওয়া যায়। এখানে যে 'সেল' আছে ওই ওক গাছ দেখে তা অনুমান করা যায়। আর একটু এগিয়ে যাই, দেখবেন আমলকি বন। আমলকি গাছ চুনা পাথরের সাক্ষ্য বহন করে।

দেখেছি। ওয়াইলড ওকের বিরাট জঙ্গল দেখেছি এই গরম-পানিতে। শুনেছিলাম, চীনে এই ওক গাছেই চাষ করা হয় সিল্কের মথ। এই গাছের ওপর নির্ভর করেই সে দেশে বেশ বড় রকমের সিল্ক-শিল্প গড়ে উঠেছে। এখানে এসে শুনলাম সরকার এখানেও ওই ধরনের সিল্ক উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করার কাজে হাত দিয়েছেন। ওঁদের ধারণা, চিনার গাছকে অবলম্বন করে কাশ্মীরে যেমন উৎকৃষ্ট সিল্কের উৎপাদন চলছে গরমপানির ওক গাছের সাহায্যে ঠিক তেমন উৎকৃষ্ট ধরনের সিল্কও তৈরি করা হয়ত একদিন অসম্ভব হবে না।

এই বন এক সময়ে ছিল হাতির চারণক্ষেত্র। এখন আর নেই। হাতি এদিকে আর আসে না। এখানে চিতার অত্যাচার ছিল যথেষ্ট। এখন চিতা আর চোখে পড়ে না। ভালুকও এক সময়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতো। এখন কদাচিৎ দেখা যায়। আর ছিল হরিণ। হরিণের খাবার আমলকি। আমলকি পাতা, আমলকি ফল। অবশ্য এখানে বন্য আমলকি অজস্র। কিছুদিন আগেও এ বনের গভীরতা

আরও বেশি ছিল। এখন কমছে। সেই সঙ্গে হরিণের সংখ্যাও কমছে।

অদূব ভবিষ্যতে আরও কমবে। খানডং বাঁধ তৈরির কাজ শেষ হবে একদিন। তখন কপিলির জল জমতে শুরু করবে বাঁধের এপাশে। জমতে জমতে সেই জল এসে ঢুকবে আরও বিরাট এলাকায়। এখন যেখানে ডাকবাংলো সে জায়গাটাও ডুবে যাবে। ডুবে যাবে গরম-পানিব উষ্ণ প্রস্রবণ। এখন যেখানে পুলিস স্টেশন, পোস্ট অফিস বা বাজাব বসেছে সে সব জায়গাও ডুবে যাবে। আর বিরাট সেই জলভূমিকে নিয়েই গড়ে উঠবে এখানকার জলাধার। তখন এই বনই রূপান্তরিত হবে লোকালয়ে। পুরোটা না হলেও, অংশত। আর মানুষের স্পর্শ মানেই তো বন্য-প্রাণীর অবলুপ্তি।

প্রায় নয় কিলোমিটাবের মত দূরত্ব। অবশেষে সেই জঙ্গলা পথ এক জায়গায় শেষ হয়ে গেল। এর পর বালির পাড় বেয়ে পায়ে হেঁটে মিনিট পাঁচেক এগিয়ে যেতেই ইয়েল জলপ্রপাত।

আমরা সরাসরি গিয়ে দাঁড়ালাম রিভারবেডের ওপর। বেড মানে ধূসরকালো গ্র্যানাইট পাথরের ভূমি।

সিকি মাইল দূরে বাঁ পাশ থেকে এসে হাজির হয়েছে একটি শাখা নদী। নাম কিয়রকর। কিয়বকর এসে মিশেছে কপিলির সঙ্গে। তারপর বন্ধুব গ্র্যানাইট পাথরেব মেঝের ওপর দিয়ে কাকচক্ষু কপিলির জল সরাসবি ঝাপিয়ে পড়ছে প্রায় ষাট ফুট নিচে গিরি-গহ্বরের মধ্যে। এই হল ইয়েল জলপ্রপাত।

রাচির হুড্রু জলপ্রপাতের সুখ্যাতি করেন অনেকে। ইয়েল তুলনায় তার চেয়ে বড়। ইয়েলের জলের পরিমাণ আরও বেশি। আরও রোমাঞ্চকর। জলের তোড়ে কঠিন পাথর কেটে তৈরি হয়েছে

গহ্বর। আশপাশে কুয়োর মত গর্তও চোখে পড়ল অনেক। কী মসৃণ, কী নিখুঁত বৃত্তাকার। কোন কোন কুয়ো তিরিশ ফুটের মত গভীর। প্রকৃতি যে কত বড় দক্ষ কারিগর এই কুয়োগুলিই তার প্রমাণ।

সুকান্তবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, কে কাটলো এই কুয়ো ?

কেন ? কপিলি। আমার কথায় হেসে জবাব দিলেন সুকান্তবাবু। এক-একটা কঠিন পাথরের চাঁই রিভারবেডের ওপর আটকে যায়। তার ওপর দিয়ে বয়ে চলে প্রচণ্ড জলধারা। তার তোড়ে সেই পাথর রিভারবেডের কঠিন স্তরের ওপর ঘুরতে থাকে। চলতে থাকে ঘর্ষণ। আর এইভাবে চলতে চলতে এক সময় তৈরি হয় এমনি এক-একটি কুয়ো। এসব হাজার বছরের কীর্তি।

প্রবাদ, এ অঞ্চলটি এক সময়ে ছিল জয়ন্তিয়া রাজার খাসমহল। তখন অপরাধীদের শাস্তি দেবার জন্যে এই জলপ্রপাতের ধারে নিয়ে আসা হতো। তার পর ঘটা করে প্রচুর দর্শকের সামনে তাকে নিক্ষেপ করা হত এই জলপ্রপাতে। জলের প্রচণ্ড তোড়ে সে যে কোথায় ভেসে যেতো, কেউ তার হদিশই পেত না।

প্রবাদ, স্থানীয় এক ট্রাইব বহুদিন আগে এই জলপ্রপাতটি আবিষ্কার করে। তার ছিল এক সুন্দরী মেয়ে। মেয়েটি এই জল-প্রপাতে পড়ে মারা যায়। মেয়েটির নাম ছিল ইয়েল। মেয়ের স্মৃতি স্মরণ করে সেই বাবাই এর নাম রেখেছিল ইয়েল জলপ্রপাত।

অপূর্ব। ইয়েলের বুকে সূর্যের আলো প্রতিমুহূর্তে যে রামধনু রচনা করছিল কোন দিন সে দৃশ্য কি ভুলতে পারবো ?

মশাই, আর নয়। এবার ফিরতে হবে। পেছন থেকে সুজিতবাবুর হাঁক।

ঠিক কথা। ফিরতেই তো হবে। আজ সারাদিনই তো পথ চলা।

গরমপানি ছেড়ে যাওয়ার আগে আমাদের ছুটি জিনিস দেখার ছিল। এক, 'সিংক হোল'। ছুই, উমরং নদীর ওপর যেখানে বাঁধের কাজ চলছিল, সেই জায়গাটা।

'সিংক হোল' দেখেছি। সত্যিই ভয়াবহ ব্যাপার। উমরং বাঁধের কিছু দূরেই দেখলাম। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। গভীর বনের মধ্যে পাহাড়। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন গহ্বর। সেই গহ্বরের মধ্যে ঢুকে হাঁটতে শুরু করলাম। মনে হলো ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছি। ভেতরে একটা ভাপসা গন্ধ। টানেলের মত এগিয়ে গেছে। কোথাও বেশ উঁচু, স্বচ্ছন্দে হেঁটে যাওয়া যায়। কোথাও চলতে হয় মাথা হেঁট করে। এক জায়গায় দেখলাম, আব একটি টানেল আর এক পাশ থেকে এসে যে টানেলটি ধরে এগোচ্ছিলাম তার সঙ্গে এসে মিশেছে। অন্ধকার আরও ঘনিয়ে এলো। প্রায় আশি ফুটের মত এগিয়ে গেছি যখন, ওঁবা এগোতে বারণ করলেন। সঙ্গে যদিও টর্চ ছিল, ভরসা পেলাম না! কী জানি বাবা, কোন জন্তু জানোয়ার ঘাপটি মেরে যদি বসে থাকে কোথাও? অনেক সময় এ ধরনের সিংকের মধ্যে ভালুক, চিতা, এমন অনেক জানোয়ারই আশ্রয় নেয়। বড় বড় সাপও দেখা গেছে কখনও কখনও। কথাটা ভাবতেও গা সির সির করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক্ মার্চ।

ড্যাম তৈরির ব্যাপারে 'সিংক হোল' যে কী মারাত্মক প্রতিবন্ধক এই অভিজ্ঞতাটুকু না পেলে হয়ত বুঝতে পারতাম না। জিওলজিক্যাল সার্ভে এদেব খুঁজে বের করার জন্যে যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে।

এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে উমরং ড্যামের কাজ চলছে।

সরু নালার মত এই নদীর পাড়ের উচ্চতা প্রায় উনিশ শ' ফুট। তবে বাঁধের উচ্চতা অত হবে না। হবে পঁচাত্তর ফুটের মত। আমাদের জীপ তার চৌহদ্দির কাছে যেতেই কানে এল সাইরেনের শব্দ। দেখলাম একটি লোক লাল নিশান উড়িয়ে আমাদের দিকেই ছুটে আসছে।

আমার পাশে বসে ছিলেন সুজিতবাবু। ড্রাইভার সেই লিনডো। লিনডোকে তিনি ইশারা করে গাড়ি থামাতে বললেন। ইতিমধ্যে সেই লোকটিও আমাদের সামনে এসে পড়েছে।

কী ব্যাপার? প্রশ্ন করলেন সুজিতবাবু।

আর যাবেন না সাহেব। ওদিকে ফায়ার হচ্ছে।

ফায়ার মানে ডিনামাইটের চার্জ হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে আমরা কিছুটা পেছনে সরে এলাম।

পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দ। আর তার কয়েক সেকেণ্ড পর প্রচণ্ড গর্জন।

গর্জনের কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখলাম, বড় বড় পাথরের টুকরো আকাশের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

কি সাংঘাতিক ব্যাপার। এ সময়টা খুবই বিপজ্জনক। অনেকে অসাবধানতাবশত পাথরের ঘায়ে ঘায়েলও হয়ে থাকে।

এখানকার পাড় অনেক শক্ত। দু-ধারেই পাহাড় বলে। একমাত্র 'সিংক হোল'ই যা ফ্যাসাদ! নইলে ড্যামের ব্যাপারে এ জায়গাটা অনেক বেশি আদর্শস্থানীয়।

এবার বিদায়ের পালা। অমরবাবু, সুকান্তবাবু এবং অপূর্ববাবু এখান থেকে ফিরে যাবেন। আমরা মিলিটারি কায়দায় পরস্পরকে উইশ করে ছাড়াছাড়ি হলাম। আমরা মানে সুজিতবাবু সমরজিৎ

চক্রবর্তী, অজিতবাবু এবং আমি। তিনটি জীপ এবং একটি ট্রেইলর। উমরং থেকে কাজিরাঙ্গা।

সুজিতবাবু হাতঘড়ি দেখে বললেন অনেকটা পথ, মিঃ কর। এখন প্রায় সাড়ে বারোটা। মনে হচ্ছে রাত আটটার আগে আমরা পৌঁছতে পারব না। সো লেট আস মুভ।

আসলে কাজিরাঙ্গা যাওয়াটা একটা বোনাস বলা যেতে পারে। আমাদের সত্যিকারের গন্তব্যস্থল তেজপুর। মাঝপথে এই চান্সটুকু করে দিয়েছেন শম্ভু সেন। অতএব এটুকু আমাদের সারতে হলো 'হারিকেন ট্যুরের' মত।

উমরং থেকে রওনা হয়ে আমরা গেলাম লঙ্কায়। দূরত্ব প্রায় আশি কিলোমিটার। জঘন্য রাস্তা। বড় বড় পাথরের চাঁই ফেলে পথ তৈরি হচ্ছে। তার ওপর দিয়ে জীপ নিয়ে চলা মানে শরীরের হাড়গোড় নড়বড়ে হাওয়ার মত অবস্থা। এ দিকটা পড়ে মিকির হিলস এলাকার মধ্যে। স্থানীয় অধিবাসীরা মিকির। এরা বেশির ভাগই হিন্দু। এবং দরিদ্র।

লঙ্কার পর থেকেই সমতল। আসামের উর্বর শস্যক্ষেত্র। আম, কাঁঠাল এবং সুপারির বন। ছয়চালা, আটচাল টিনের বাড়ি। বড় বড় গ্রাম। লঙ্কা ব্যবসা-ক্ষেত্র। লঙ্কা থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে নওগাঁ। সমৃদ্ধ এবং আসামের অন্যতম সংস্কৃতির পীঠস্থান এই শহরটি পেরিয়ে আমরা গিয়ে পড়লাম জাকলাবান্দায়। জোরহাট রাস্তা ধরে। জাকলাবান্দায় যেতে যেতে রাত প্রায় আটটা বেজে গেল। এখানে রাতের খাওয়া শেষ করতে হলো আমাদের। কারণ আমাদের আশঙ্কা, বেশি রাতে কাজিরাঙ্গা গিয়ে কোন খাবারই হয়ত জুটবে না।

জাকলাবান্দা থেকে আর মাত্র পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পথ। রাত দশটা নাগাদ গিয়ে পৌঁছলাম বাগুরি বনবিভাগের ডাকবাংলোয়। আগে থেকে খবর দেওয়া ছিল বলে অসুবিধে কিছু হয়নি।

আমরা গিয়েই জানতে পারলাম, ঘর ঠিক আছে। তিনটে হাতিও ভাড়া করা হয়েছে। তবে আমাদের উঠতে হবে ভোর চারটের মধ্যে। বেশি দেরি হলে কাজিরাঙ্গার বন্য-জীবন দেখায় হয়ত অসুবিধে হতে পারে।

বলতে বাধা নেই, সে রাতটা খুব উত্তেজনার মধ্যে দিয়েই কাটিয়েছি।

যখন ঘুম ভাঙ্গল, ভোরের আলো সবে দেখা দিয়েছে। আমি এবং অজিতবাবু এক ঘরেই শুয়েছিলাম। আমার ডাকে তিনিও উঠে পড়লেন; সুজিতবাবু এবং সমরজিৎ চক্রবর্তীও প্রস্তুত। ঘড়িতে যখন চার, মাহুত এসে জানালো হাতি প্রস্তুত সাহেব। অজিতবাবু তাঁর মুভি এবং স্টিল ক্যামেরা ভাল করে দেখে নিলেন শেষবারের মত। এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে কাজিরাঙ্গার জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছলাম।

মাহুত সাবধান করে দিল, স্যার, একদম শব্দ করবেন না। তা হলে ওরা সরে যাবে।

এক চিলতে খাল পেরিয়েই জঙ্গল। প্রকৃতির উন্মুক্ত আঙ্গিনায় আমরা সবাই তখন রুদ্ধশ্বাস।

বড় বড় ঘাসের বন। ছয় থেকে সাত হাত লম্বা। যতদূর চোখ যায় শুধু সেই ঘাস আর ঘাস। ঘাসের বন ঠেলে আমাদের হাতি এগিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ, মিনিট দুয়েক পরই—কী বলব, সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। আর সেখানে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ একটি

গণ্ডার। এক-শিংওয়ালা গণ্ডার। গণ্ডার আর আমাদের মধ্যে দূরত্ব মাত্র একশ' ফুট। গণ্ডারটি থমকে দাঁড়িয়ে পিট পিট করে আমাদের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর একপাশে দুলে বনের মধ্যে হাওয়া।

একটা নয় গণ্ডারের দলও দেখলাম। সপরিবার। মাঝে মাঝে চিতল হরিণের লুকোচুরি। এক জায়গায় দেখলাম গোটা পঞ্চাশ হরিণ ভোরের রোদে পিঠ ছড়িয়ে বসে জাবর কাটছে। বন্য শুয়োর; পাশে খালের জলে একটি পেলিকানকেও ভেসে থাকতে দেখলাম। দেখলাম ঈগল। উঁচু এক গাছের ডালে বসে রয়েছে।

এক জায়গায় এসে মাহুত আমাদের হাতি আবার থামিয়ে দিল। অদূরে নিঃসঙ্গ একটি বন্য হাতি। বলল, দাঁড়ান স্যার, ভাল করে দেখে নিই। হাতি একলা থাকলেই ভয়। সাধারণত পাগলা হাতিরাই একা একা থাকে। দারুণ হিংস্র হয় তখন তারা।

না। পাগলা নয়। ভাল হাতিই। প্রচুর বুনো মোষও দেখলাম এখানে। সুজিতবাবুকে বললাম, মশাই, ভেবেছিলাম বুনো মোষ মানে, সাংঘাতিক কিছু হবে। কিন্তু এতো দেখছি আমাদের কলকাতার খাটালের মোষের মতই চেহারা। অজিতবাবুকে বললাম মশাই, এদের ছবি ভাল না উঠলে ক্ষতি নেই। কলকাতার খাটাল থেকে মোষ ধরে ঝোপ-ঝাড়ের পালে দাঁড় করিয়ে ছবি তুলে বলে দেবেন এই হলো কাজিরাঙ্গার বুনো মোষ।

মাহুত আমার কথায় হেসে উঠল। বলল, একেবারে আস্ত শয়তান সাহেব। দেখতে এই রকম। কিন্তু দারুণ রাগী। সামনে গিয়ে দাঁড়ান দেখবেন হিংস্র কাকে বলে।

মাহুতের মুখে শুনলাম, এখানে গণ্ডারের সংখ্যা বেড়েছে।

ঘণ্টা দুয়েক ঘোরার পর ফিরে এলাম আমরা। তারপর হাতি পিছু তিরিশ টাকা ভাড়া এবং মাহুতদের কিছু বখশিস করে রওনা হলাম শিলঘাটের পথে। পথে আসতে আসতে সুজিতবাবু বললেন, অনেকে কাজিরাঙ্গা থেকে জঙ্গল দেখতে যায়। কিন্তু সেখান থেকে জঙ্গলে ঢুকে এত গণ্ডারই তারা দেখতে পায় না। বরং বাগুরি থেকেই জঙ্গলে যাওয়া ভাল দেখছি।

এক ঘণ্টার মধ্যেই শিলঘাট পৌঁছে গেলাম। এই শিলঘাট থেকে ব্রহ্মপুত্রের ওপর নতুন সেতু তৈরির কথা হচ্ছে। এখানে দাঁড়ালে এই এপ্রিলেও বুক কাঁপে। নদীর এত ভয়ঙ্কর চেহারা!

প্রচুর যাত্রীর ভিড়। এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। কাছেই বিরাট চর। যেন একটি দ্বীপ। মাঝ নদীতে দেখলাম স্টিমার আসছে। ওই স্টিমারে চড়েই জীপ শুদ্ধ পার হয়ে আমরা ওপারে ভোমরাঘাটে যাব। সেখান থেকে যাব তেজপুর।

সুজিতবাবু পাশে এসে দাঁড়ালেন। সেই একই মিলিটারি কায়দায়। যেমন দাঁড়িয়েছিলেন গৌহাটি এয়ার পোর্টে প্রথম দেখা হওয়ার সময়।

বললেন, এবার আমার ছুটি। আমার সার্কেলে আপনার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। এবার আপনি অরুণাচল সার্কেলে যাচ্ছেন। গুড বাই।

এখান থেকে বিদায় নিয়ে তিনি চলে গেলেন। এখন যাবেন শিলং।

হঠাৎ এই বিচ্ছেদে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। মনে হলো, শুধু ভূতাত্ত্বিক হিসেবেও নয়, মানুষ হিসেবেও এমন বিচক্ষণ একজন আজকাল খুব কমই চোখে পড়ে।

দেখতে দেখতে স্টিমার ভিড়ল ঘাটে। এবার তেজপুর। আর সেখান থেকে অরুণাচল।

আট

পাহাড়ের সান্নিধ্য মানুষকে গম্ভীর করে তোলে। তার বাইরের চাঞ্চল্য, তার উচ্ছল আবেগ হয় অন্তর্মুখী। আর নদী মানুষকে করে তোলে প্রাণচঞ্চল। হৃদয় সেখানে উদাত্ত। মন বহির্মুখী। নদীর স্রোত মনকে কেড়ে নেয়। তার সান্নিধ্যে মানুষের মন তার স্রোতের মতই গতিশীল।

শিলঘাটের কাছে পাহাড়ের কোলে বসেছে মেলা। বিহু উৎসবের মেলা। সেখানে মণিহারী দোকান বসেছে। খেলনা, রঙ বেরঙী চুড়ি, শাড়ির বাজারের মধ্যে মেয়েদের ভিড়, বাঁশের টুপি। সারকাসের তাঁবু পড়েছে। তার সামনে বহুরূপী সেজে জন তিনেক লোক দর্শকদের মনোরঞ্জন করছে। নাগরদোলা, ম্যাজিকের আখড়া, খাবারের দোকান—আর এদের ঘিরে অজস্র মানুষের হট্টগোল। তবে পাহাড়ের গাম্ভীর্যের কাছে তার সব কিছুই যেন লাগাম-টানা ঘোড়ার মত।

আর এই শিলঘাটে? এখানে জীবন মানেই উচ্ছ্বাস। জীবন মানেই গতি। জীবন এখানে ওই ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের মতই যেন থেমে থাকতে নারাজ।

ফেরিঘাটে প্রচণ্ড ভিড়। ঘাটের সামনেই ছোট্ট একটা খড়ের

ঘর। তার মধ্যে বসে টিকিটবাবু। এক একজন যাত্রী আসছে, পয়সা গুণে নিয়ে তিনি টিকিট দিয়ে যাচ্ছেন। মানুষের টিকিট। আবার ট্রাক, প্রাইভেট কার এবং স্কুটার বা মোটর সাইকেলেরও টিকিট।

সমরজিৎ চক্রবর্তী বললেন, মিঃ কর, আপনি এবং অজিতবাবু বরং ওই চায়ের দোকানটায় বসুন। আমি জেনে আসি আমাদের জীপ দুটি এবং ট্রেইলারের অ্যাকোমোডেশন ঠিক আছে কী, না। খবর আমরা আগেই পাঠিয়েছি। তবু বলা যায় না। বিহু উৎসব চলছে। বড্ড বেশি ভিড় দেখছি।

হ্যাঁ, ডজন দুয়েক চায়ের দোকানও এখানে আছে। তবে সবই খড়ের চালাঘর। এক একটা দোকানের সামনে খানকতক নড়বড়ে বেঞ্চি, চেয়ার এবং টেবিল পাতা। এক পাশে ড্রামে বোঝাই জল। উনুনের ওপর। চায়ের জল গরম হচ্ছে। চায়ের সঙ্গে শিঙ্গাড়া, ছানার মিষ্টিও পাবেন সেখানে। স্টিমারে চাপার আগে, এসব দোকানে বসে কেউ কেউ ভাতও খেয়ে নেন।

একটা দোকানে গিয়ে বসলাম আমরা। অজিতবাবু চা আর ডিম সেদ্ধর অর্ডার দিলেন।

এই দোকানে বসেই দেখছিলাম ব্রহ্মপুত্রকে। নদী যে ভয়ঙ্কর হতে পারে নিজে চোখে না দেখলে যেন বিশ্বাস হয় না। উজানে কোথাও হয়ত বৃষ্টি হয়েছিল। ফলে ব্রহ্মপুত্রের স্রোত বেড়েছে। সেই স্রোতে ভেসে চলেছে গাছের টুকরো, কচুরিপানা। মাঝখানে বিরাট চর। ছোটখাটো একটা দ্বীপের মত। প্রায় মাইল দুই লম্বা। চওড়াও প্রায় এক মাইল। চর যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে ব্রহ্মপুত্র প্রায় তিন মাইল চওড়া।

জনৈক ভদ্রলোক বললেন, দেখছেন কি মশাই, এ তো কিছুই না।

আরও কয়েকটা দিন যেতে দিন, তারপর দেখবেন, ব্রহ্মপুত্র কাকে বলে। এসব দোকানপাট তখন এখানে কি থাকবে? এ-কূল ও-কূল ছাপিয়ে ব্রহ্মপুত্রের তখন ভৈরব মূর্তি। জলের কী ডাক তখন! শিলঘাট তখন উঠে গিয়ে বসবে ওই পাহাড়ের কোলে। আর এসব দোকানও তখন উঠে গিয়ে তার আশপাশে জড়ো হবে।

চায়ের দোকানের মালিক আমাদের পাশেই বসেছিলেন। ভদ্রলোকের মুখের কথা লুফে নিয়ে তিনি বললেন, বলবেন না, স্যার। সংসারের দায়ে এখানে দোকান করা। নইলে আসে কেউ এই নদীর ধারে দোকান করতে? কিছু পাবেন না, স্যার, এখানে কিছু পাবেন না। দোকানের সমস্ত মালপত্র আমাদের বয়ে আনতে হয় সেই জাকলাবান্দা থেকে। না হলে জাহাজে করে চলুন তেজপুর। বর্ষার সময় সাংঘাতিক কাণ্ড। একেবারে প্রাণ হাতে করে জাহাজ চড়া।

কিন্তু এতো গেল এক দিক। এই নদী নিয়ে রিভার ইঞ্জিনিয়াররাও কি মাথা ঘামিয়েছেন কম? প্রায় ২৯০০ কিলোমিটার লম্বা এই নদী তিব্বত, ভারত এবং বাংলাদেশের প্রায় ৫,৮০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা কতকাল ধরে ভাসিয়ে চলেছে, তার হিসেব রাখেন ক'জন? হিমালয় পর্বতমালার ৫১৫০ মিটার উঁচুতে হিমবাহর জলে পরিপুষ্ট এই নদী পূর্ববাহিনী। রিভার ইঞ্জিনিয়ারদের ভাষায় হোয়াং হো, ইয়াংসে কিয়াং, মেকং এবং ব্রহ্মপুত্র একই পরিবারভুক্ত নদী। তিব্বতে এর নাম সাংপো। তিব্বতে দক্ষিণ সীমানা দিয়ে সোজা পুব দিকে বয়ে গেছে প্রায় ১৮০০ কিলোমিটার। যতই এগিয়েছে, ক্রমে এর সঙ্গে এসে মিশেছে আরও একাধিক পার্বত্য নদী। তিব্বতের বৃহত্তম বাণিজ্যকেন্দ্র লাতসে জং-এর পাশ দিয়ে বইছে গাংচু নদী। শিগাৎসে শহরের কিছু দক্ষিণে সাংপোর সঙ্গে তার মিলন। তারপর

উত্তর থেকে এসে মিশেছে কাইচু নদী। লাতসে জং থেকে প্রায় ৬৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত সাংপো নদী হিমালয়ের ৩৬৫০ মিটার উঁচু দিয়ে বয়ে গেছে। এই অংশে নদী অনেক বেশি প্রশস্ত। নৌ বাহনেরও যোগ্য। সমুদ্রতল থেকে এত উঁচুতে পৃথিবীর আর কোন নদীতে নৌকো চলে না।

সেলা জং-এর কাছে উত্তর দিক থেকে এসে মিশেছে গ্রিয়ামদাচু নদী। তারপর পে পেরিয়ে প্রথমে উত্তর-পূর্বে পরে উত্তরদিকে গিয়ালা পেরি এবং নামচা বারোয়া পর্বত দুটির অন্তর্বর্তী অঞ্চল দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়েই প্রথমে দক্ষিণে, তারপর দক্ষিণ-পশ্চিমে বেঁকে হিমালয়ের নিম্নভূমির দিকে নেমে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেছে নামও। সাংপোর পরিচয় প্রথমে সিয়ং। অতঃপর এই সিয়ং সইদিয়া শহরের পশ্চিম দিক দিয়ে আসাম উপত্যকায় নেমে এসে মিলিত হয়েছে আরও দুটি নদীর সঙ্গে। ডিবং এবং লোহিত। আর ডিহং, ডিবং এবং লোহিত এই তিন নদীই মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে ব্রহ্মপুত্র।

এরপর থেকেই ব্রহ্মপুত্রের বিভীষণ মূর্তি। আসাম উপত্যকার ৭২০ কিলোমিটার গতিপথে দু পাশ থেকে একে একে অজস্র নদীর ধারা এর সঙ্গে এসে মিশে সৃষ্টি করেছে ভয়াবহ পরিস্থিতি। যেমন, উত্তর দিক থেকে এসে মিশেছে সুবনসিরি, কামেং, ধানশ্রী, মানস, চম্পামাটি, সরলভাঙ্গা এবং সাকোস। দক্ষিণ দিক থেকে এসে মিশেছে নোয়াডিহং, বুড়িডিহং, দিসাং, ডিখু এবং কপিলি।

জনৈক রিভার ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে ওই চায়ের দোকানেই আলাপ হলো। ব্রহ্মপুত্রের কথা তুলতেই ভদ্রলোক বললেন, মারাত্মক নদী, মশাই। এর মতিগতি বোঝা শিবের বাবারও দুঃসাধ্য। ক্যাটার‍্যাকট্

এফেক্ট কাকে বলে জানেন তো ?

ক্যাটার‍্যাকট্ এফেক্ট ? সে আবার কী ? ভদ্রলোকের কথায় চমকে উঠলাম আমি। ক্যাটার‍্যাকটের একটা মানে জানি। সাদা বাংলায় যাকে বলে ছানি। যা চোখের দৃষ্টি ঝাপসা করে তোলে। কিন্তু তাই বলে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ?

চোখেব ছানি ? আমার কথা শুনে ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। বললেন তা, এও ওই রকম বইকি ! ব্যাপার কি জানেন, আমরা সবাই জানি, কোন বেগবতী নদী যতই এগিয়ে যায়, যাওয়ার পথে মাটি কাটতে কাটতে সে খাদ সৃষ্টি করতে থাকে। নদী গভীর হয়। আবার কখনও কখনও তার উল্টোটাও ঘটে। বেগবতী নদী সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময় তার গতিপথের উল্টো দিকেও মাটি বা পাথর কাটতে পারে। আমরা একেই বলি ক্যাটার‍্যাকট এফেকট্। আমাদের ধারণা, ব্রহ্মপুত্র হয়ত কোনদিনই আসামের দিকে বেঁকত না। প্রবাহিত হচ্ছিল পুব দিকে। পুব দিকেই হয়ত প্রবাহিত হতো চিরকাল। কিন্তু মাঝপথে কাণ্ড করে বসল ওই ডিহং। ক্যাটার‍্যাকট্ এফেকটের দরুন পাথর কাটতে কাটতে এক সময়ে সম্ভবত ছয়, কিংবা সাতের শতকে ডিহং গিয়ে মিশল সাংপোর সঙ্গে। তখন সাংপোর ধারা পুব দিকে না গিয়ে ডিহং বেয়ে নেমে এলো।

ভদ্রলোক বললেন, অরুণাচলের ইয়াজালি যাচ্ছেন তো ? পথে পড়বে সুবনসিরি নদী। ইদানীং এই নদীতেও ক্যাটার‍্যাকট এফেকট্ ধরা পড়েছে। বলতে কি, সাংপোর পঁচিশ মাইলের মধ্যে এই নদীটি সরে এসেছে এরই মধ্যে। ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, কে জানে, মশাই, শেষ পর্যন্ত সুবনসিরিও হয়ত একদিন সাংপোর সঙ্গে মিশে যেতে পারে। আর তা যদি হয়, ডিহং হয়ে যাবে নালা। ব্রহ্মপুত্রের

ধারা অনেক পশ্চিমে সরে আসবে।

১৯৫০ সালের ভূমিকম্পের পর ব্রহ্মপুত্র তার গতিপথ কিছুটা পালটেছে। সুবনসিরিও যদি তেমন কিছু ঘটায়, তখন একটা ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে বিপর্যয় নেমে আসবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

সমরজিৎ চক্রবর্তী এলেন মিনিট পনের পর। এসেই ঘোষণা করলেন, এভরিথিং ও কে। ওঁরা আমাদের মেসেজটি পেয়েছেন। জীপের টিকিট হয়ে গেছে। বোটও এসে গেল প্রায়। ওই দেখুন, প্রায় ভিড়ব ভিড়ব করছে।

তাই তো! গল্পে গল্পে খেয়ালই করি নি। চায়ের দোকানে বসে আসলে ঠাহর করতে পারি নি। আড়াল করে ছিল ওই টিকিট ঘর। সমরজিৎ চক্রবর্তীকে বললাম, আপনি নাসতা সেরে নিন। অজিতবাবু আর আমি পারঘাটে গিয়ে দাঁড়াই।

বলেই উঠে পড়লাম দোকান থেকে। বাইরে বেরিয়ে আসতেই চোখে পড়ল যে যাত্রীদের মধ্যে ততক্ষণে হইচই পড়ে গেছে। সবুজ রঙের বিরাট ফেরি-বোট কিছুক্ষণ আগেই নোঙর করেছে। এরই মধ্যে অনেকেই উঠে গেছেন বোটে।

মিনিট পাঁচেক পর আমরাও উঠলাম। জীপ, ট্রাক এবং শ পাঁচেক যাত্রী নিয়ে স্টিমার ছাড়ল।

অদ্ভুত রোমাঞ্চ। পাড় থেকে ব্রহ্মপুত্রকে দেখেছি। এবার স্বয়ং ব্রহ্মপুত্রের বুকে। স্রোতের অনুকূলে ভেসে চলেছি আমরা। মাঝে মাঝে ঘূর্ণি। দেখলে বুক যেন শুকিয়ে যায়। ডান দিকে সেই বিরাট চরটিকে রেখে আমরা এগিয়ে গেলাম। এ-পাড় থেকে ও-পাড়ের মধ্যে সমুদ্রের ব্যাপকতা। দূরে বাঁ দিকে এক খণ্ড পাহাড় নদীর বুক ফুঁড়ে দ্বীপের মত দাঁড়িয়ে। দীর্ঘ আট কিলোমিটার পথ।

আড়াআড়ি এগিয়ে গেলাম আমরা। তারপর ডান দিকে আবার দেখা গেল পাহাড়। এই পাহাড় থেকেই শুরু তেজপুরের সীমানা।

প্রায় এক ঘণ্টা পর আমাদের স্টিমার এসে ভিড়ল ভোমরাপুরি ঘাটে।

সমরজিৎ চক্রবর্তী ঘড়ি দেখে বললেন, ভাল হলো, মশাই। বেলায় বেলায় এসে গেলাম। শিলঘাট থেকে ভোমরাপুরির মধ্যে ফেরি চলে মাত্র দু-বার। সকালে আর বিকেলে। বিকেলে এলে সন্ধে হয়ে যেতো। আমাদের আর বিশ্রাম নেওয়া হতো না।

ভোমরাপুরি থেকে তেজপুর শহর আরও প্রায় সাত আট কিলোমিটার পথ। এখান থেকে আমরা প্রথমে গেলাম জিওলজি-ক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার অরুণাচল সার্কেলের অফিসে।

পৌঁছতে কিছুটা দেরি হলো আমাদের। স্টিমারই দেরি করল প্রায় এক ঘণ্টা। তারপর ভোমরাপুরি ঘাটে প্যাকড স্টিমার থেকে গাড়ি নিয়ে নামতে আরও কিছুটা সময় গেল।

অফিসের ভেতর পা দিতেই খানিকটা দমে গেলাম। এটা অফিস না রিফিউজি ক্যাম্প? নাকি শিলঘাটের দোকানপাটের মত একটা কিছু, ব্রহ্মপুত্রে বন্যা এলে যাকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হবে? পুরনো বাড়ি। তা হোক। এই তো সেদিন জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়া তাদের এক শ' পঁচিশ বছর জন্ম জয়ন্তী পালন করল। অতএব এ-বাড়ির বয়েস যদি এক শ' বছরও হয়, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তাই বলে এমন হাল হবে কেন?

জন পাঁচেক কর্মী। মরচে ধরা স্টিলের চেয়ার, আর নড়বড়ে টেবিল। এক জনকে দেখলাম প্যাকিং বাকসের ওপর বসে কাজ করছেন। খান দুয়েক ছোট আলমারি।

সমরজিৎ চক্রবর্তী হাঁক ডাক করে ভেতরে ঢুকতেই সবাই প্রায় চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন।

আরে আসুন, আসুন, ডঃ চক্রবর্তী। তা এতো দেরি হলো যে? ওঁদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন ডঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে।

ডঃ চক্রবর্তী ওঁর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মুহূর্তে শোরগোল পড়ে গেল। শুরু হয়ে গেল পরস্পরের মধ্যে খবরাখবর বিনিময়। কে কোথায় আছেন, কে কোথায় বদলি হয়েছে, কলকাতায় ওঁদের হেড কোয়ার্টার্স থেকে কে কোথায় চলে যাচ্ছেন অথবা লোহিত একসপিডিশনে গিয়ে দুর্ঘটনায় যাঁরা মারা গিয়েছিলেন তাঁদের পরিবার সরকার থেকে সাহায্য পেলেন কী না —এমন নানান কথাবার্তা। যেন দুপুরে মেয়েদের আসর বসে গেল একটা। মেয়েরা এক সঙ্গে হলেই যেমন পরস্পরের এবং পরিচিত জনের কার বিয়ে হলো, কে বাড়ি করল, কার স্বামী প্রমোশন পেল, কার কটা বাচ্চা হলো এমন ধরনের বিষয়ে মুহূর্তে ডুবে যায়, জিওলজিক্যাল সার্ভের মানুষরাও যেন কথা বলেন ঠিক সেই একই ঢং-এ।

শুধু এখানেই নয়। আমার এই ট্যুরে যেখানে গেছি, এই একই ধরনের অভিজ্ঞতা পেয়েছি সর্বত্র।

কিমিন যাওয়ার পথে একবার একান্তে সমরজিৎ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মশাই, আপনাদের মধ্যে দেখছি একটা ব্রিদরেন ভাব আছে। কথা বলার সময় মনেই হয় না, কে কার সঙ্গে কথা বলছেন। কে অফিসার, কে অফিসার নয়, বোঝাই যায় না। চমৎকার সম্পর্ক আপনাদের মধ্যে, না?

ডঃ চক্রবর্তী টিপ্পনি কেটে বলেছিলেন, সবাই যে মনে মনে চমৎকার সে কথা বলব না। তবে হ্যাঁ, ওই যে অফিসার নন-অফিসার কথাটা বললেন না, ঠ্যালায় পড়লে ওসব ঘুচে যায়, মশায়। একসপিডিশনে চলুন না, মজা দেখবেন। দুর্গম এলাকায় যখন পা দেবেন, তখন একজন কুলির ওপরও আপনাকে নিজের প্রাণের জন্যে নির্ভর করতে হবে। আসল কথা কী জানেন, মিঃ কর, কোন বিপজ্জনক সমস্যা যখন একযোগে সবার সামনে এসে হাজির হয়, তখন কারোর আর মনে থাকে না, কে বড়, কে ছোট, কে ধনী, কে নির্ধন। তখন শুধু বাঁচার তাগিদেই সবাই আত্মীয় বনে যায়। এর জন্যেই ওই যে বললেন, ব্রিদরেন ব্রিদরেন ভাব আমাদের মধ্যে সেটা গড়ে উঠেছে।

আমাদের ত্রিপাঠী সাহেব কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন সমরজিৎ চক্রবর্তী।

এই যে আমি, এখানেই আছি। আসুন। পাশের ঘর থেকে বাজখাঁই গলার চিৎকার ভেসে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে ডঃ চক্রবর্তী আমাকে নিয়ে পাশের ঘরে এলেন। বললেন, সে কী, আমরা এতক্ষণ কথা বলছি, আর আপনি এখানে বসেও সাড়া দিচ্ছেন না?

ইচ্ছে করে দিই নি। দেখছিলাম, আপনারা ডিরেকটারের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন কী না। বলেই আবার সেই বাজখাঁই গলার শব্দ।

কপট গাম্ভীর্য নিয়ে ডঃ চক্রবর্তী বললেন, বলুন, আড়ি পাতছিলেন। পাতুন, কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দয়া করে অমন দম ফাটানো হাসি হাসবেন না। কয়েকদিন আগেই আপনার শরীর খারাপ গেল না?

হঠাৎ একটু গম্ভীর হলেন তিনি। তারপর খানিকটা স্বগতোক্তির মতই নিচু গলায় বললেন, হাসিতে মানুষের শরীর খারাপ হয় না, ডাক্তার (ডক্টরের আদুরে ডাক) তবে হ্যাঁ, একটা ক্রাইসিস গেল। বাট আই ডোণ্ট মাইনড।

ইনি ডঃ চিন্তামণি ত্রিপাঠী, ডিরেক্টর, জি এস আই অরুণাচল সারকেল। এখন আমাদের হোস্ট। ডঃ চক্রবর্তী আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

দেখলাম, ভদ্রলোক প্রচণ্ড আমুদে। বললেন, বসুন, মিঃ কর। আমাদের অফিসের হাল তো দেখছেন। বসার ভাল একটা চেয়ার পর্যন্ত নেই।

মৃদু হেসে আমি মন্তব্য করলাম, আমার মনে হয়েছিল আমি রিফিউজি ক্যাম্পে এসেছি। জিওলজিক্যাল সার্ভের তো প্রচুর পয়সা-কড়ি। তা এখানে এমন হাল কেন?

নো, নো, মিঃ কর। আপনার প্রথম মন্তব্যটি কিন্তু আমাদের কাছে কমপ্লিমেণ্ট নয়। তবে হ্যাঁ, রিফিউজি ক্যাম্পের সঙ্গে আমি এক মত। এখন আমরা রিফিউজিই বলতে পারেন। আমরা সিফট্ করছি এখন। অরুণাচল সারকেল খোলার পর এতদিন আমাদের অফিস এখানেই ছিল। এবার আমরা রাজধানী ইটানগরে উঠে যাচ্ছি। রেকর্ডপত্র থেকে আসবাবপত্র যা কিছু তার সবই সেখানে চলে গেছে। এখানকার সব কিছু গুটিয়ে আমিও দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে চলে যাব।

এ ঘরেও গোটা চারেক স্টিলের মরচে ধরা চেয়ার। আর টেবিল বলতে একটি কালো রঙের প্যাকিং বাক্স। বাকসের ওপর প্রায় দুই কিলোগ্রাম ওজনের ফ্যাকাশে সবুজ রঙের এক খণ্ড পাথর।

ডঃ চক্রবর্তী পাথরটি দেখে বললেন, কী ব্যাপার, ডঃ ত্রিপাঠী, এ বস্তুটি এখানে পেলেন কোথায়, দারুণ উঁচু মানের ডলোমাইট দেখছি ?

আপনাকে দেখানোর জন্যেই তো এখানে রেখেছি, ডঃ চক্রবর্তী। আনন্দে যেন আত্মহারা হলেন ডঃ ত্রিপাঠী। পাথরটি দু হাত দিয়ে সযত্নে তুলে নিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরলেন। বললেন, আপনার কি মনে হয় না, ইট ইজ এ সাকসেস ? এমন হাই গ্রেড ডলোমাইট আর কোথাও পেয়েছেন এদিকে ? সোনা, ডঃ চক্রবর্তী, ডলোমাইট তো নয় এ আমার কাছে সোনা। অরুণাচলে এমন উঁচু মানের ডলোমাইট থাকতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

মা যেমন বুকের কাছে আদরের বাচ্চাটিকে চেপে ধরে গায়ে হাত বোলায় আর বলে 'আমার সোনা, আমার সোনা,' আমার মনে হলো ডলোমাইটের টুকরোটি বুকে নিয়ে তেমন ভাবেই আদর করছিলেন ডঃ ত্রিপাঠী। আর মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছিলেন।

আমি কৌতুক করে বললাম, ডঃ ত্রিপাঠী, যেভাবে পাথরটিকে বুকে চেপে আদর করছেন, আমার সন্দেহ, আপনার নিজের ছেলেও অমন আদব কোনদিন পায়নি হয় তো।

আমার কথায় মুহূর্তের জন্যে আবার গম্ভীর হলেন ডঃ ত্রিপাঠী। হলেন আত্মস্থ।

বললেন, আমরা জিওলজিস্টরা, দুটি কারণে খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ি, মিঃ কর। আশাতীতভাবে কোন অঞ্চলে আমরা যখন এমন কোন ভূতাত্ত্বিক নমুনা পাই, ওই অঞ্চলে যার অস্তিত্ব আমাদের ভাবিয়ে তোলে, তখন। কী ভাবে সেখানে অমন ধরনের পাথর পাওয়া গেল, সে পাথর সেখানে তৈরিই বা হলো কী ভাবে, ভূ-

তত্ত্বের দিক দিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়ায় তখন জটিল সমস্যার মত্। সেই সমস্যা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হয়। তার সমাধানের জন্যে তখন আমাদের বসতে হয় তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্যে। যা ওই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস জানতে সাহায্য করে। আর আমরা, মানে এই 'পাথর সাহেবরা আরও আনন্দিত হই, যখন দেখি আমাদের আবিষ্কার মানুষের কল্যাণে কাজে লাগছে। 'পাথর সাহেব' কথাটা নিশ্চয় এরই মধ্যে শুনে থাকবেন দু একবার ?

বললাম, শুনেছি।

শুনেছেন ? খুব ভালো। তবে তার সঙ্গে আর একটি কথাও শুনে রাখুন। আমরা হলাম গিয়ে মেয়ের বাবা-মা'র মত। মেয়ে হলো, তাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলাম। তারপর যখন সে মানুষ হলো, উপযুক্ত হলো, পরের ছেলের হাতে তুলে দিলাম। তখন ওই ছেলের বাবা-মা'ই আমার মেয়ের বাবা-মা। আমাদের আর কতটুকু অধিকার থাকে তার ওপর। মানে কি না, এই যে পাহাড় পর্বত দেখছেন। আমরা পরিশ্রম করে, জীবন হাতে নিয়ে অনুসন্ধান করব ভূতাত্ত্বিক সম্পদ। দেখব কোথায় পাওয়া যায় লোহা, কোথায় তামা বা অন্য কিছু। শুধু পেলেই আবার চলবে না, রাসায়নিক পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে হবে, যতটা লোহা তামা পেলাম ব্যবসার দিক দিয়ে সেটা লাভজনক হবে কী, না। লাভজনক হলে এবার তুলে দাও ডিপার্টমেন্ট অভ মাইনস-এর হাতে। ওই খনিজ সম্পদ নিয়ে যা কিছু করার তাঁরাই করবেন। তাঁরাই তখন মেয়ের বাবা-মা। তা হোক। আমাদের তাতে দুঃখ নেই। আমাদের সন্ধান পাঁচ জনের উপকারে লাগলেই আমাদের আনন্দ।

সেন্টিমেন্ট ? হয়ত তাই। সেন্টিমেন্টের মধ্যে দিয়েই তো আমরা

আমাদের সেই 'আমিত্ব'টুকুর সন্ধান পাই, যা না থাকলে কোন কিছুকে আমরা নিজের করে নিতে পারি না। জিওলজিস্ট মাত্রই ভীষণ সেন্টিমেণ্টাল। আর সেই সেন্টিমেন্টের উৎস হয়ত এক টুকরো পাথর, এক মুঠো বালি, অথবা কয়েক কোটি বছরের এক চিলতে জীবাশ্ম। এদের নিয়েই তাঁদের ভালবাসা। পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক রহস্য উদ্ঘাটনের দিকে পদক্ষেপ।

শুনুন, মিঃ কর। নানা কারণে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এসব দিকে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজ তেমন এগোয় নি। নতুন রিজিয়ন খোলার পর এখন ব্যাপকভাবে এ কাজে হাত দিয়েছি আমরা। শুনে আনন্দিত হবেন, এপর্যন্ত যতটুকু কাজ হয়েছে, তাতে আমরা যথেষ্ট আশান্বিত। খনিজ সম্পদ, তেল এবং জলবিদ্যুৎ—এদিকে এদের সম্ভাবনা প্রচুর। দেখলেন তো—এই যে ডলোমাইটের টুকরোটা—আরও কত আছে কে জানে? এদের খুঁজে বের করতে পারলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামোটাই হয়ত পালটে যাবে। 'ইট মে বি ওয়ান অভ দ্য রিচেস্ট রিজিয়নস ইন ইনডিয়া।'

সন্দেহ হলো। ডঃ ত্রিপাঠী কি স্বপ্ন দেখেন?

জানি না। তবে তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছিল, অরুণাচলের সঙ্গে তিনি যেন একাত্ম হয়ে গেছেন।

বললেন, কাল সকালে আমরা তো ইয়াজালি যাচ্ছি, সেই পথেই আপনি সুবনসিরি নদী দেখতে পাবেন। আর তার আগেই আপনাকে আমি দেখিয়ে দেব, এশিয়ার সুপ্রাচীন পাথরের স্তর নবীন শিবালিক স্তরের সঙ্গে পাশাপাশি লেগে রয়েছে। তাদের ফাঁকে অ্যানথ্রেসাইট কয়লাও চোখে পড়বে আপনার।

সে কি, ত্রিপাঠী সাহেব? আপনিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না-

কি ? ডঃ চক্রবর্তী যেন বিস্ময়ের সঙ্গেই প্রশ্ন করে বসলেন।

নিশ্চয়। সেই সঙ্গে ইটানগরে আমাদের অফিসে কী চলছে, তাও দেখে আসি। আগামীকাল বিকেলে অরুণাচলের গভরনরের সঙ্গেও একটা এনগেজমেন্ট করা আছে। ওঁর সঙ্গে এদিকের খনিজ সম্পদ নিয়ে কথা বলব। বললেন ডঃ ত্রিপাঠী।

মৃদু হাসলেন ডঃ চক্রবর্তী।—তা হলে বাকি কিছুই রাখেন নি। কিন্তু আপনার শরীরটা হঠাৎ খারাপ গেল। এই শরীরে অতটা পথ আমাদের সঙ্গে যাওয়া কি ঠিক হবে ?

আরে, না, না। অত ভাবনার কি আছে ? একটু হার্টের কাছে ঠোক্কর খেয়েছি। বাট দ্যাট ইজ মাইনর।

ব্যাপারটা ঘটেছিল দিন সাতেক আগেই। তবু সে জন্যে যে দুর্ভাবনা, তার কোন লক্ষণই নেই তাঁর কথাবার্তায় চালচলনে।

বেলা বাড়ছিল। কিছুটা ক্লান্তও হয়ে পড়েছিলাম আমরা।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, পরে অনেক কথা হবে, মিঃ কর। এখন বরং আস্তানায় গিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিন আপনারা। আস্তানা মানে অরুণাচল গেস্ট হাউস। ব্যবস্থা ভাল। আপনাদের খারাপ লাগবে না। আমিই পৌঁছে দিয়ে আসছি, চলুন।

না, না, সে কি ? আপনাকে আর যেতে হবে না। আমরা নিজেরাই যেতে পারব। সমরজিৎ চক্রবর্তী বাধা দিলেন তাঁকে।

জীপের ড্রাইভার দাস বলল, ও আমার চেনা জায়গা, স্যার। আপনাকে ভাবতে হবে না। সাহেবদের আমিই নিয়ে যেতে পারব।

ডঃ ত্রিপাঠী কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি যাবেনই আমাদের সঙ্গে।

শেষ পর্যন্ত আমিই জবরদস্ত বাধা দিয়ে বললাম, সে হবে না, ডঃ ত্রিপাঠী। কিছুটা সময় আমাদের স্বাধীন মত ঘুরতে দিন। নো

জিওলজি, প্লিজ। চানটান সেরে আমরা একটু জায়গাটা দেখব।

আমার কথায় হেসে উঠলেন ডঃ ত্রিপাঠী। বললেন, তাই হবে। আমি বরং সন্ধ্যের দিকে গিয়ে একটু গল্প করে আসব।

তাঁর কথা আর পড়তে পেল না। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে প্রায় চ্যাংদোলা করে টেনে নিয়ে এসে জীপে বসিয়ে দিলেন সমরজিৎ চক্রবর্তী। দাস জীপও ছেড়ে দিল এতটুকু দেরি না করে।

ডঃ চক্রবর্তীর ব্যাপার স্যাপার দেখে হাসিই পেল আমার। বললাম, ব্যাপার কি বলুন তো? মনে হলো পালিয়ে আসার জন্যে আপনি একটা চান্স খুঁজছিলেন?

চান্স মানে? আপনি জানেন না ডঃ ত্রিপাঠীকে, তাই। আমাদের সঙ্গে এলে কি আর রক্ষে ছিল? পুরো অরুণাচলের ভূতত্ত্ব নিয়ে কথা বলেই কাটিয়ে দিতেন পুরো বিকেলটা। একেবারে পাগলা মশায়। ওঁর মাথায় ভূতত্ত্ব ছাড়া বুঝি কখনো আর কিছু থাকে না। এদিকে শরীরের অবস্থা তো দেখলেন। হার্ট অ্যাটাক্ হয়ে গেল সেদিন। বেশি কথা বলা কি ওঁর এখন উচিত? বললেন ডঃ চক্রবর্তী।

শুধু কি ত্রিপাঠী? গহন অরণ্য অথবা দুস্তর পাহাড়ের মাঝে ঘুরতে ঘুরতে ভূতাত্ত্বিক মাত্রই যেন পাথরের মতই মূক হয়ে যান। আর সেই মূক মানুষই যখন কারোর কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করার সুযোগ পান, তখন তিনি হয়ে ওঠেন রীতিমত মুখর।

মনে পড়ল তরুণ ভূতাত্ত্বিক ডি পি দাসের কথা। সোনা পাহাড়ে ক্যাম্পে বসে সিলিমেনাইটের কথা বলতে বলতে যিনি ভুলেই গিয়েছিলেন তাঁকে গৌহাটি যেতে হবে। বিহু উৎসবের পসরা সাজিয়ে যেখানে তাঁর স্ত্রী তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন। বলেছিলেন, কথা বলার লোক পাই না, মশায়। বাইরে থেকে কেউ এলে

আমাদের বড় আনন্দ হয়। তাঁর সঙ্গে দু দণ্ড কথা বলে তবু মনের পাথরটা একটু হাল্কা করে নিই।

অথবা অতনুবিহারী গোস্বামী? শিলং-এ জিওলজিক্যাল সার্ভের অফিসে বসে কোয়াটারনারি জিওলজি নিয়ে কথা বলতে বলতে যিনি ভুলেই গিয়েছিলেন ডিনারের সময় প্রায় এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে?

অরুণাচল গেস্ট হাউসের পথে যেতে যেতে অতনুবাবুর কথা মনে পড়ল আবার। মনে পড়ল, তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কাকে বলেন আপনারা কোয়াটারনারি জিওলজি, জিওমরফোলজি এবং এনভায়রনমেণ্ট জিওলজি?

এক নাগাড়ে পর পর তিনটি প্রশ্ন শুনে মুহূর্তের জন্যে যেন নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন অতনুবাবু। তারপর ধীরে ধীরে শুরু করেছিলেন স-ব্যাখ্যা উত্তর। গত দশ থেকে কুড়ি লক্ষ বছরের মধ্যে যে সব ভূতাত্ত্বিক গঠন পৃথিবীর বুকে দানা বেঁধেছিল ইংরেজীতে তাদেরই বলা হয় কোয়াটারনারি জিওলজি। এ ধরনের ভূতাত্ত্বিক গঠনের মধ্যে পড়ে পাললিক স্তর, মাটি, নুড়ি, পাথরকুচি, বালির স্তর, ইত্যাদি। আর যে বিজ্ঞান কোন অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে তাকেই বলা হয় জিওমরফোলজি। এ ছাড়া ভূতাত্ত্বিক গঠন এবং ভূস্তরের মধ্যে শিলীভূত অবস্থায় সংরক্ষিত প্রাচীন যুগের পরাগ, উদ্ভিত বা প্রাণীর জীবাশ্ম—এ সব পরীক্ষা করে আমরা অনুমান করতে পারি ভূতাত্ত্বিক যুগে কোন কোন অঞ্চলের পরিবেশ এবং আবহাওয়ার অবস্থা কেমন ছিল। এ সবের ওপর তথ্য অনু-সন্ধানই এনভায়রনমেণ্ট জিওলজিস্টদের কাজ।

হ্যাঁ, ভারতে কোয়াটারনারি জিওলজি নিয়ে প্রথম অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেছিল জিওলজিক্যাল সার্ভে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়।

১৯৭০ সালে। সে কাজ বলতে গেলে বিক্ষিপ্তভাবেই হয়েছিল। তারপর ১৯৭৪ সালে জিওলজিক্যাল সার্ভে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসালেন তাঁদের স্বয়ংসম্পূর্ণ আঞ্চলিক কেন্দ্র। তারপর থেকেই সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এ সব নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধানের কাজ চলছে। এ ধরনের উদ্যোগ ওই সব অঞ্চলে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, মৃত্তিকা-সংরক্ষণ, জমির অবক্ষয়, চাষ এবং বন সম্পদের জন্যে জমি উদ্ধার, জল সম্পদের অপচয় রোধ এবং পরিবেশ দূষণ—এমন অনেক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

অতনুবাবু বলেছিলেন, খুব শক্ত কাজ মশাই। হিমালয়ের পাদদেশের পার্বত্য অঞ্চলের কথাই ধরুন। মানে, আমি ডিব্রুগড়ের উত্তরাঞ্চলের কথা বলছি। প্রায় কুড়ি হাজার বর্গমাইল এলাকা। এবং প্রচণ্ড দুর্গম। পথঘাট নেই বললেই চলে। মাঝখান দিয়ে আবার ব্রহ্মপুত্র। পুরো এলাকায় ব্রহ্মপুত্র পেরনোর জায়গা মাত্র একটি। নদীর দক্ষিণ পাড়ে সইখাওঘাট। আর উত্তর পাড়ে সইডিয়া। সইখাওঘাট এবং সাইডিয়ার মধ্যে ফেরি সারভিস আছে। সম্বল এইটুকু। এই ফেরিপথটুকু না থাকলে ওই অঞ্চলে পারাপারের কোন প্রশ্নই থাকত না। সাইডিয়ার দক্ষিণের এলাকাটা মারঘারিয়াটার কাছ বরাবর নাগাপটকোই পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৭৫ পর্যন্ত ওদিকটায় কোন ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানই হয়নি। এ কাজে এখন আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি। গত তিন বছরে প্রায় ৫৬০০ বর্গ কিলোমিটারের মত এলাকার ম্যাপিংও শেষ করেছি আমরা।

সার্ভে অব ইনডিয়া লক্ষ করেছেন, ১৯২৩ থেকে ১৯৫৩-র মধ্যে ডিবং তীর প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পুব দিকে সরে গেছে। ওই একই সময়ে ডিহং-এর শাখা গ্যাংগো নদীর উৎপত্তিস্থল উত্তর দিকে এগিয়ে

গেছে দশ কিলোমিটারের মত। লোহিত নদীও দক্ষিণ দিকে সরে এসেছে ছয় কিলোমিটার। এই অগ্রসরতা ১৯৫০ সালের ভূমিকম্পের পর আরও বেড়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলি নিয়েও মাথা ঘামাতে হচ্ছে ভূতাত্ত্বিকদের। কোথাও কঠিন সমভূমি অথবা বালির স্তর। তাদের মধ্য দিয়ে পথ করে চলার সময় কোন নদী কীভাবে চলতে চায়, কিংবা চলতে পারে সে সব ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা। যা মানুষের নিরাপত্তার জন্যেও একান্ত প্রয়োজনীয়।

তেজপুর শহর হিসেবে বড় না হলেও পুরনো শহর। মাঝ দিয়ে গেছে হাইওয়ে। হাইওয়ের পাশে মিটার গেজ রেল লাইন। লাইনের পাশে কিছু কিছু কারখানা তৈরি হয়েছে। তেজপুর বিমান বন্দর পর্যন্ত। স্টেশনের কাছে গড়ে উঠছে নতুন নতুন বসতি। শহরের মাঝখানে নতুন বাণিজ্য-কেন্দ্র। জামাকাপড়, ট্র্যানজিস্টার থেকে শুরু করে সব কিছুই সেখানে পাবেন। আছে নানারকম হোটেল। ছোট বড়। আটপৌরে এবং আধুনিক। বাহুল্য নেই কোথাও। তবে নগরজীবনের ব্যস্ততার অভাবও নেই। পথে বাস নেই তেমন। যা আছে বেশির ভাগ দূরপাল্লার। বাহন বলতে রিকশা।

মিনিট দশেকের মধ্যে আমরা অরুণাচল গেস্ট হাউসে গিয়ে পৌঁছলাম। এদিকে শহরের হইচই নেই। সুন্দর বাগান। তার মধ্যে সাদাসিধে গেস্ট হাউস। কাছেই সরকারী কিছু অফিস। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। পথের দু পাশে। সমস্ত পরিবেশ যেন একান্ত আপনার।

স্নান, মধ্যাহ্ন ভোজন এবং বিশ্রামের পর এলেন ডঃ ত্রিপাঠী।

বললাম, আপনি দেখছি পাঁচটার মধ্যেই এসে গেছেন,

ডঃ ত্রিপাঠী।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই প্রাণখোলা হাসি। দু হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে আমার বিছানার ওপরই বসে পড়লেন। পাশের ঘর থেকে এলেন সমরজিৎ চক্রবর্তী। তিনি সহাস্যে বললেন, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আপনি একেবারে অফিস থেকে এসেছেন, ডঃ ত্রিপাঠী।

নিশ্চয়। ডঃ চক্রবর্তী তখন তো চটপট চলে এলেন। কিন্তু ইনার লাইন পাসের কী হলো, সে কথা তো একবারও জিজ্ঞেস করেননি আমাকে? সকৌতুক জিজ্ঞাসা ডঃ ত্রিপাঠীর।

ডঃ ত্রিপাঠীর প্রশ্নে ডঃ চক্রবর্তী এবার নির্বাক। বললেন, তাই তো, কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম।

ডঃ ত্রিপাঠী এবার কপট গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন, গেস্ট নিয়ে অরুণাচলের ভেতরে চলেছেন, অথচ ইনার লাইন পাসের কথাই ভুলে গেলেন?

কেন, কোন গোলমাল হল নাকি?

হয়েছিল। আজকাল নামে নামে পাস ইস্যু করেন কালেকটর সাহেব। তবে হ্যাঁ পেয়ে গেছি। এই দেখুন পাস। বলেই পাসগুলি পকেট থেকে বের করে দেখিয়ে দিলেন ডঃ ত্রিপাঠী।

আগেই শুনেছিলাম, জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোন কোন জায়গায় বিদেশী তো বটেই, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মানুষেরও চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে পড়ে অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম বিশেষ করে। এসব অঞ্চলে ঢুকতে গেলে সংরক্ষিত সীমানা অতিক্রম করতে হয়। যাদের বলা হয় ইনার লাইন। ইনার লাইনে ঢোকার বা বেরোবার পথে কড়া পুলিস পাহারা। যে অঞ্চলে ঢুকবেন, সেখানকার সরকারী

কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র ছাড়া সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

ডঃ ত্রিপাঠীর হাতে অরুণাচলের ইনার লাইনের ভেতরে যাওয়ার ছাড়পত্র দেখে বেশ রোমাঞ্চ বোধ করলাম। যেন সীমানা পেরিয়ে অজ্ঞাত কোন বিদেশী রাজ্যে চলেছি।

ডঃ ত্রিপাঠী বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করলেন না। নিজে থেকেই উঠলেন তিনি। বললেন, সমস্ত ব্যবস্থা পাকা। হঠাৎ আমার বাসায় একটু কাজ পড়েছে, আমি বরং এখন যাই, কাল সকাল সাড়ে সাতটায় তাহলে রেডি হয়ে থাকবেন।

ডঃ চক্রবর্তী অভয় দিয়ে জানালেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা সাড়ে সাতটায় প্রস্তুত থাকব।

নয়

ওকে। হ্যাভ এ গুড টাইম। বলেই বিদায় নিলেন ডঃ ত্রিপাঠী।

তিনি চলে গেলে আমি হাসতে হাসতে সমরজিৎ চক্রবর্তীকে বললাম, আর গুড্ টাইম! একি কলকাতা, না দিল্লি, যে রাতের দিকে একটু হইচই করে ঘুরে বেড়াবো? এসব ছোট শহরে সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ঘরমুখী হয়। বেড়াবেটা কোথায়?

অজিতবাবু এতক্ষণ নিজের ঘরের মধ্যেই সাজগোজ করায় ব্যস্ত ছিলেন। মাঝে ডঃ ত্রিপাঠী যে এসেছিলেন টেরই পাননি। এতক্ষণে গালের পাশে অতিরিক্ত লেগে থাকা পাউডার রুমাল দিয়ে ঘষতে ঘষতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আমি বললাম, সে কি, মশায় ? চল্লেন কোথায় সেজেগুজে ?

সলজ্জ হাসি হেসে অজিতবাবু বললেন, কী যে বলেন ? সাজগোজ দেখলেন কোথায় ? চান করার পর খুব ঘাম ঝরছিল, তাই একটু পাউডার ডলে নিয়েছি। ডঃ ত্রিপাঠীর গলা পেলাম যেন ?

যেন কেন ? ডঃ চক্রবর্তীর পাল্টা প্রশ্ন।—তিনি এসেছিলেন। আবার চলে গেলেন। তা আপনি এখন চলেছেন কোথায় ?

জলসা শুনব।

জলসা মানে ?

জলসা মানে আবার কি ? জলসা। আপনারা যখন ঘুমচ্ছিলেন, আমি বেরিয়েছিলাম একটু। এখান থেকে মাত্র কোয়ার্টার মাইল দূরে বিরাট প্যাণ্ডেল পড়েছে, মশাই। বিহুর জের তো এখনও চলছে। আজ নাকি জোর জলসা। ভূপেন হাজারিকা গান গাইবেন আজ। শুনে এলাম।

বাঃ বাঃ ! এর মধ্যে একা একা বেড়িয়েও এলেন ?

বেড়ানো ঠিক নয়। ফিলিম কিনতে গিয়েছিলাম, সেই পথেই দেখলাম জলসার প্যাণ্ডেল।

বললাম, খুব ভাল কথা। এখন ছ'টা। আমরাও চট করে একটু ফ্রেশ হয়ে নিই। আধ ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে। তারপর কোথাও একটু খাওয়াদাওয়া সেরে চলুন বরং জলসার আসরে গিয়ে বসি। আসামে এলাম অথচ এ পর্যন্ত এখানকার একটা কালচারাল প্রোগ্রাম দেখলাম না !

এরপর আর দেরি নয়। আধঘণ্টার মধ্যেই চট্‌পট্ বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

ততক্ষণ অন্ধকার হয়ে এসেছে। রাস্তার ধারে জ্বলে উঠেছে

ইলেকট্রিক আলো। গেস্ট হাউস থেকে পায়ে হেঁটে কিছুটা এগোতেই একটা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লাম আমরা। রাস্তায় পড়তেই পেছন থেকে ভেসে এল মাইকের শব্দ।

গেস্ট হাউসে আসার সময় অন্যপথ ধরে এসেছি। তাই ওদিকটা চোখে পড়েনি। এখন দেখলাম, এখানেও একটি জলসার প্যাণ্ডেল বসেছে।

অজিতবাবু বললেন, এখানটায় নয়, আমি যে প্যাণ্ডেলটা দেখে এসেছি, ভূপেনবাবু গাইবেন সেখানে। তাড়াতাড়ি চলুন। হাতে মাত্র এক ঘণ্টা সময়। খেয়ে দেয়ে আটটার মধ্যে জায়গা না নিলে কিছুই দেখতে পাবেন না।

ঠিক আটটার মধ্যেই জলসায় গিয়েছিলাম। দেখলাম, এরই মধ্যে প্রচণ্ড ভিড় জমেছে। ভিড়ের পেছনে খাবারদাবারের দোকান। পান বিড়ি সিগারেটও আছে। ওদিকে চলছে প্রোগ্রাম। স্থানীয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভ্যারাইটি শো। লোকনৃত্য, লোকগীত। দারুণ ভাল লাগল।

ভাল লাগল একটি কারণে। ভূপেন হাজারিকা এবং তাঁর দু-একজন সঙ্গী ছাড়া এই আসরে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা সবাই স্থায়ী অধিবাসী। স্কুল কলেজের ছেলে-মেয়ে। আর তাঁদের অনুষ্ঠানের মধ্যে ফুটে উঠেছিল আসামের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারাটি। যে গান স্টেজে দাঁড়িয়ে তাঁরা গাইলেন, তা আসামের গ্রামে, হাটে মানুষের গলায় ঘুরে বেড়ায়। তাঁদের নৃত্য আসামের সনাতন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। সেখানে হলিউড বা বোম্বের কোন স্পর্শই ছিল না। 'আমার মনে হলো, কলকাতায় তো কত সাংস্কৃতিক উৎসব হয়। কিন্তু বিহুর মত কলকাতার নববর্ষে, দোলে অথবা দুর্গাপুজোয় ক'টি

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চোখে পড়ে, যার শেকড়ের সঙ্গে আমাদের মননশীলতার সত্যিকারের কোন যোগ আছে!

বড় তৃপ্তি নিয়ে ফিরে এসেছিলাম অনুষ্ঠান থেকে।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গল। তারপর তাড়াতাড়ি আবার প্যাকিং। ডঃ ত্রিপাঠী তাঁর নিজের জীপ নিয়ে এলেন। তার কিছুক্ষণ পরই এল আমাদের জীপ দুটি। অর্থাৎ শিলং থেকে যারা আমাদের বাহক হয়ে আসছে। রুটিন মাফিক আমরা ঠিক সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যেই যাত্রা করলাম।

তেজপুর থেকে প্রথমে উত্তর লখীমপুর। দূরত্ব প্রায় ২৭৫ কিলো-মিটার। তবে রাস্তা ভাল। এটা হাইওয়ে। প্রথমে বেশ কিছুটা পথ আসাম উপত্যকার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে। পুরোপুরি সমভূমি। মাঝে মাঝে অজস্র সুপারি গাছের বাগানে ঘেরা এক একটি গ্রাম। যেখানে গ্রাম নেই, সেখানে দুপাশে আছে দিগন্ত বিস্তৃত ধানের ক্ষেত। পথ কখনও এগিয়ে চলেছে রঙ্গিয়ার দিকে যে রেলপথটি এগিয়ে গেছে তার পাশ বরাবর। ছোট বড় অজস্র নদী। একের পর একটি চা বাগান। পথে পড়ল চারিয়ালি, দারং, বেগমারী চা বাগিচা; বহুপুকরির ইমপিরিঅ্যাল টি এসটেট। বড়গাং নদী পেরিয়ে আরও কয়েকটি চা বাগান।

উত্তর লখীমপুরে পৌঁছতে বাজল দুপুর দেড়টা। বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র এই শহরটি। অজিতবাবু এবং সমরজিৎ চক্রবর্তী এখান থেকে আরও কিছু ফিলম কিনে নিলেন।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, পথে অরুণাচলের এক চিলতে জমি আমরা স্পর্শ করে এসেছি, লক্ষ করেছেন হয়ত, মিঃ কর। ওই যে, একটা পাহাড়ের কোলে এসে আমরা গাড়ির তেল নিলাম, সেখান থেকে

অরুণাচলের রাজধানী ইটানগর পঁচিশ তিরিশ কিলোমিটার হবে। আমরা আগামীকাল ফেরার সময় ইটানগর যাব। এখন দেখবেন চলুন, সুবনসিরি কাকে বলে। প্রকৃতির সঙ্গে কী প্রচণ্ড যুদ্ধ করেই না জিওলজিস্টদের কাজ করতে হয়।

উত্তর লখীমপুর যাওয়া মানে খানিকটা উজিয়ে যাওয়া। সেখানকার কেনাকাটা সেরে আবার মিনিট দশেক ভাটিয়ে আসতে হলো আমাদের। পথে রাঙ্গা নদী। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল থেকে নেমে আসা তার জল সব সময়ই স্রোতস্বিনী।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, সাংঘাতিক নদী, মশায়। এখন এপ্রিল তো? এখন কিছু বুঝবেন না। আর কয়েকটা দিন যাক। বর্ষা আসুক। এর সেতুর ওপর দিয়ে যেতেই তখন আমাদের বুক কাঁপে।

রাঙ্গা নদী অধ্যুষিত এই এলাকার নামই রাঙ্গা উপত্যকা। নদী পেরিয়ে মিনিট তিন এগিয়ে বাঁ পাশে সরু পথ। কিমিন যাওয়ার সড়ক। এই সড়ক ধরে প্রায় চার কিলোমিটার এগোতেই পড়ল আবার চা বাগান। চা বাগান শেষ হতেই পাহাড়ী রাস্তা। আমরা উপরে উঠতে লাগলাম।

আকাশে মেঘ জমেছে। মাঝে মাঝে ঘন কুয়াশার মত মেঘ উঁচু উঁচু গাছের ফাঁকে ঢুকে পড়ে চারপাশের পরিবেশ আরও রহস্যঘন করে তুলেছে।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন ডঃ ত্রিপাঠী, মিঃ কর, দেখুন, দেখুন। কী বাহারে গরু একবার দেখে নিন! সঙ্কর জাতের গরু। এ ধরনের গরু এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ট্রাইবদের মধ্যেই শুধু দেখতে পাবেন। আমরা এখন ট্রাইবদের পল্লীর মধ্য দিয়ে চলেছি।

অদ্ভুত। গরু না অন্য কিছু? বিশ্বাস করুন বনের মধ্যে অমন

প্রাণী দেখে আমি চমকেই উঠেছিলাম। একটি নয়। বেশ কয়েকটি দেখতে না মোষ, না গরু। মসৃণ গা। যেন তেল চকচক করছে। আর সবচাইতে বিস্ময়কর তাদের গায়ের রঙ।

দেখলাম কারোর রঙ পুরোপুরি হলদে। দেখলে মনে হয়, কে যেন সাদা গরুর গায়ে হলুদ মাখিয়ে দিয়েছে। কারোর গায়ের রং কালো। মাঝে মাঝে গোলাপী রঙের বড় বড় ছোপ।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, ট্রাইবরা এদের বলে মিথুন। ওদের কাছে মিথুন একটা বড় রকমের সম্পত্তি, মিঃ কর। আমাদের টাকা পয়সার মত। বিয়ের সময় কনের যৌতুকস্বরূপ কনের বাবাকে ওরা মিথুন উপহার দিয়ে থাকে। সামাজিক অনুষ্ঠানেও মিথুন লেনদেন হয়।

এক একটা মিথুনের অপূর্ব স্বাস্থ্য। বললাম, তা হলে চাষ-আবাদের ব্যাপারে তো এদের কোন অসুবিধে নেই ?

হাসলেন ডঃ ত্রিপাঠী। বললেন, চাষ-আবাদের মানে ? আপনি কি ভেবেছেন, গরু দিয়ে এবা লাঙ্গল টানে ? তাহলেই হয়েছে। মশায়, এদিকের কোন ট্রাইবই লাঙ্গলের ব্যবহার জানে না। ছোট ছোট এক ধরনের খন্তা দিয়ে চাষের মাটি তৈরি করে এরা। এমন কি মিথুনের দুধ অব্দি খায় না এরা। এরা মনে করে মায়ের দুধ তো তার বাচ্চার জন্যে। অন্যে কেন খাবে ? তবে হ্যাঁ, পাল-পার্বণে মিথুনের মাংস এরা খায়।

মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। গ্রাম মানে বড় বড় কাঠের গুঁড়ির ওপর ঘর। কোন কোন ঘরের বেড়া কাঠের। ছাদ কাঠের। মেঝে কাঠের। আবার কারোর কারোর ঘরের মেঝেই শুধু কাঠের। দেওয়াল এবং ছাদ খড়ে ছাওয়া। মানুষগুলি বেঁটে, খানিকটা স্থূল গঠন। কিন্তু প্রচণ্ড কর্মঠ সবাই। জীপের শব্দে কেউ কেউ ঘরের

বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাচ্চারা হাত নাচিয়ে কতকটা অভিনন্দনের ভঙ্গীতে চেঁচামেচি শুরু করেছিল।

উত্তর লখীমপুর থেকে কিমিনের দূরত্ব প্রায় আঠারো কিলো-মিটার। চারদিকে পাহাড়। তার মাঝে উপত্যকার মত ছোট্ট এই শহরটি যেন মায়ের কোলে শিশু। এখানে আছে মিলিটাবি ছাউনি। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে পরিবেশ। ব্যারাক, অফিসার্স কোয়ার্টার্স, অফিসার্স ক্লাব, ফুলের বাগান।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, আমরা এখন হিমালয়ান ফুট হিলসের ওপর দিয়ে চলেছি। আর একটু এগিয়ে চলুন, ওই যে বাঁকটা দেখছেন? বাঁকের পর একটা গেট। ওটা চেক পোস্ট। ওখানে ইনার লাইন পাস দেখাতে হবে আমাদের।

রীতিমত কড়া ব্যবস্থা। সরকারী গাডি দেখে যে গার্ডরা ছেড়ে দেবে, তার জো নেই। গাড়ি থামিয়ে ওরা পাসগুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নিল। তারপর প্রত্যেকটি গাড়ির কাছে এসে দেখে নিল সত্যিকারের ক'জন যাত্রী সংরক্ষিত অঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করছে।

কিমিন সমুদ্রতল থেকে প্রায় এক হাজার ফুট উঁচু। এর পর খাড়াই।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, আর কিছুদূর চলুন, আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাবো। দেখবেন, পাশাপাশি দুই পাথরের স্তর। একটি স্তরের সঙ্গে আর একটি স্তরের বয়েসের পার্থক্য লক্ষ লক্ষ বছর। আর একটি কথা। এখ্লান থেকে একচল্লিশ কিলোমিটার দূরে আমাদের ড্রিলিং ক্যাম্প। তবে সেখানে পৌঁছনোর আগেই দুটি মারাত্মক জিনিস সম্পর্কে আপনাকে সাবধান থাকতে হবে। একটি হলো জোঁক। আর একটি হলো ডিমডিম।

লোহিত উপত্যকায় মিশমি মা

ইয়ারজ্যালির বিরল উড়ন্ত প্রাণী

জোঁক না হয় বুঝলাম? কিন্তু ডিমডিম মানে? ডঃ ত্রিপাঠীর কথায় চমকে উঠলাম আমি।

এক ধরনের খুদে মাছি। কালো রঙ। অনেক সময় বুঝতেও পারবেন না, কখন গায়ে এসে বসেছে। আর বসা মানেই সাংঘাতিক ব্যাপার। যে জায়গায় বসবে সেখানটা জ্বালা করবে। ফুলেও যেতে পারে। তারপর ঘা হয়ে কষ্ট দেবে। দারুণ পাজী-মাছি, মশায়। এখানে কাজ করতে গিয়ে আমাদের জিওলজিস্টদের লাইফ হেল হয়ে যাচ্ছে। বললেন ডঃ ত্রিপাঠী।

ডিমডিমের দংশন থেকে আমি রেহাই পাইনি। যেন বৈদ্যুতিক শক্। সে অভিজ্ঞতা পরে বলছি। তবে তার চেয়েও অবাক করেছিল সেই উড়ন্ত বেড়ালটি। জীপের আলোয় চোখ ঝলসে নিশাচর সেই বেড়াল চলন্ত জীপে ধাক্কা খেয়ে সেই যে পড়ে গেল, আর উঠল না। সারা অরুণাচলে এই প্রাণীটি এখন বিরলের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

এক সময় আসামের হিমালয় অধ্যুষিত এলাকায় এক এক অঞ্চলের পরিচয় ছিল এক এক নামে। আকা হিলস্, ডাফ্লা হিলস্, মিরি হিলস্, মিশমি হিলস্, ইত্যাদি। এদের নিয়েই তৈরি এখানকার অরুণাচল প্রদেশ।

পশ্চিমে ভুটান। ভুটানের পুবদিকে অরুণাচল। গিরিরাজ হিমালয় এখানে উত্তর-পূর্বে এগিয়ে গেছে কামেং, সুবনসিরি এবং সিয়াং জেলার মধ্য দিয়ে। তারপর আরও খানিকটা পুব দিকে গিয়ে সিয়াং নদীর গিরিসঙ্কটের ওপারে বাঁক নিয়েছে দক্ষিণ বরাবর। বরং বলি, দক্ষিণ-পূর্বে লোহিত জেলায়। এবং তার কিছুটা অংশ ঢুকে পড়েছে তিরাপ জেলার পুব দিক বরাবর। এই তিরাপেই নাগা

পর্বতমালার সঙ্গে তার মিলন। পর্বতবহুল অরুণাচলের কোথাও গড় উচ্চতা ১৭০০ মিটার, কোথাও ৩৫০০ মিটার, কিংবা ৪৫০০ মিটারের চেয়েও বেশি। এই অঞ্চলের গ্রেটার হিমালয়ের দিকে যান। যেখানে গোরিচেনের মত শৃঙ্গও দেখতে পাবেন। যার উচ্চতা ৬৫৩৮ মিটার। অথবা কংতু গিরিশৃঙ্গ। উচ্চতা ৭০৯০ মিটার। ভূতাত্ত্বিকদের কাছেও এসব অঞ্চল অত্যন্ত দুর্গম।

দুর্গম। তবু ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজ থেমে থাকেনি। ১৮২৫ সালে লোহিত সীমান্তে একাজে প্রথম পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলেন উইলকক্স। তারপর এলেন রাওলেট এবং গডউইন অস্‌টিন (১৮৭৫), লা তাউচে (১৮৮৩), ম্যাক লারেন (১৯০৪) এবং কগিন ব্রাউন (১৯১১)। ওঁদের চেষ্টায় অরুণাচলের কিছু কিছু অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক তথ্য জানা গেল। বর্তমান শতকের চারের দশক পর্যন্ত ওঁদের অনুকরণে অভিযান চালিয়ে সন্ধান পাওয়া গেল আপার টারসিয়ারি, লোয়ার গণ্ডোয়ান এবং বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তিত শিলা। পাওয়া গেল কয়লার অস্তিত্ব সুবনসিরি জেলায়।

চারের দশকের শেষের দিক থেকে ছয়ের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইনডিয়ার একাধিক ভূতাত্ত্বিক অরুণাচলের বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান চালান। ওঁদের মধ্যে ছিলেন এ কে দে এবং জি সি চ্যাটার্জি। ওঁরা অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন লোহিত জেলায়। টি ব্যানার্জি এবং এম এস বালসুন্দরম উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করেন কামেং জেলা থেকে। জি লস্কর এবং তাঁর সহকর্মীদের চেষ্টায় অনেক কিছু জানা গেল সুবনসিরি এবং সিয়াং জেলার ভূতাত্ত্বিক রহস্য সম্পর্কে। দুর্গম উপত্যকা এবং গহন অরণ্য অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলে না ছিল পায়ে চলার মতও পথ, না ছিল এতটুকু আশ্রয়। বন্য প্রাণী,

অপরিচিত আদিবাসীর ভয়, কখনও বা অনাহারে ভূতাত্ত্বিকরা অভিযান চালিয়েছেন। এই সব অভিযানের পরই জানা গেল, রাঙ্গা উপত্যকায় সালফাইডঘটিত ভূস্তর পাওয়া গেছে, যার মধ্যে আছে নিকেল। কামালা উপত্যকায় সন্ধান মিলল পিরাইট এবং লোহার আকর, আপাতানি মালভূমির জিরো উপত্যকায় কয়লার স্তর। কামেং, সুবনসিরি এবং সিয়াং জেলায় পাওয়া গেল গণ্ডোয়ানা যুগের কয়লা। পরে ওই সব অঞ্চলে চুনা পাথরও আবিষ্কৃত হয়।

কিমিন থেকে রওনা হওয়ার পর ক্রমাগত খাড়াই। আর সেই সঙ্গে মনে হল চারদিকের বনও ক্রমে গভীর হয়ে আসছে।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, যে কোন ভূতাত্ত্বিকের কাছেই সুবনসিরির এই অঞ্চলটি দারুণ ইন্টারেস্টিং, মিঃ কর। আর একটু এগিয়ে যাই, আপনাকে আমি অ্যানথ্রেসাইট কয়লা দেখাব।

ডঃ ত্রিপাঠীর কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম আমি। বললাম, বলেন কি? একেবারে অ্যানথ্রেসাইট? রানীগঞ্জ, ঝরিয়া থেকে শুরু করে আমাদের দেশে যে ধরনের কয়লা পাওয়া যায়, তার বেশির ভাগই বিটুমিনাস। কার্বনেব পরিমাণ কম। আসামের চেরাপুঞ্জিতে কয়লা দেখে এলাম। তাতে আবার গন্ধকের মাত্রা বেশি। আর অ্যানথ্রেসাইটে? সে তো সোনা। এতে কার্বনের ভাগ শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ। কয়লার মধ্যে এটাই উৎকৃষ্টতম জ্বালানি।

ঠিক তাই। মন্তব্য করলেন ডঃ ত্রিপাঠী।

গাড়ি এগোচ্ছিল। আর দু' পাশের পাথর-স্তর এবং গাছপালার দিকে চাইতে চাইতে ভাবছিলাম, এই তা হলে সুবনসিরি?

সুবনসিরি নদীর নাম। আর সেই নদীর নামে জেলারও নাম সুবনসিরি। এর পুব দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সমভূমির কিঞ্চিৎ স্পর্শ।

উত্তরে গ্রেট হিমালয় এবং দক্ষিণে আসাম সমভূমির কিঞ্চিৎ স্পর্শ। উত্তর সীমান্তের ওপারে চীন। ভূতাত্ত্বিক চরিত্রের দিক দিয়ে এই জেলাটিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। দক্ষিণে আসাম সমতল পেরলেই প্রথমে পড়বে শিবালিক অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চল। দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রায় কুড়ি কিলোমিটারের মত প্রশস্ত। গড় উচ্চতা ১৬০০ থেকে ১৭০০ মিটার। তারপর নিম্ন হিমালয় এবং অবশেষে গ্রেটার হিমালয়। অজস্র জলধারা থাকলেও এ অঞ্চলে প্রধান নদী বলতে দুটি। সুবনসিবি এবং কমলা।

এখানকার ভূতাত্ত্বিক গঠনেব মধ্যে পাবেন পাললিক এবং পরিবর্তিত শিলা। যার মধ্যে নিহিত আছে পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং সাম্প্রতিকতম ভূতাত্ত্বিক বিবর্তনের সাক্ষ্য। উঁচুমানের পরিবর্তিত শিলার মধ্যে পাবেন বাইওটাইট-গারনেট-সিলিমেনাইট। লামডাক এবং ডাপোরিজোয় যান। সেখানে দেখবেন গ্র্যাফাইট। আব রাঙ্গা উপত্যকায় ছড়িয়ে রয়েছে সালফাইড হিসেবে কোবলট, নিকেল এবং তামা। কিমিন থেকে জিরোর পথে পড়ে ইয়াচালি। এখানে পাওয়া গেছে সাদা রঙের মূল্যবান বেরাইলের কেলাস। রাঙ্গা উপত্যকার পোতিন-এ তিন কিলোমিটার লম্বা এবং তিনশ' থেকে আটশ' মিটার চওড়া একটা ভূস্তরের সন্ধান পেয়েছেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার কর্মীরা। সেখানে চলছে ড্রিল করে নমুনা সংগ্রহের কাজ। এ পর্যন্ত সংগৃহীত নমুনার কিছু কিছু পরীক্ষা করে তাঁরা মনে করছেন এ অঞ্চলে কোবলট্, নিকেল, তামা এবং দস্তাও পাওয়া যাবে। লে-তে যান দেখবেন, মাটির ওপর থেকে প্রায় তিরিশ মিটার গভীর পর্যন্ত নেমে গেছে খণ্ড খণ্ড গ্র্যাফাইটের স্তর। অনুমান ২১৮৬৬ টন গ্র্যাফাইট পাওয়া যাবে এখান থেকে। যার শতকরা বারো ভাগ

গ্র্যাফাইট কার্বন। আর লামডাকে যে গ্র্যাফাইট আছে, তার পরিমাণ তেত্রিশ লক্ষ মিলিয়ন টন। ভাল মানের গ্র্যাফাইট। গ্র্যাফাইট কার্বন ১৬·২২ শতাংশ। ডাপোরিজো থেকে তালিহা যাওয়ার পথে পাওয়া গেছে এক হাজার মিটার ডলোমাইটের স্তর। তারি এবং হুরি এলাকায়। এই ডলোমাইটের আটচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশই ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড।

'শুধু আকরিক অনুসন্ধানই নয়, চাই বিদ্যুৎ শক্তি। বিদ্যুৎ না হলে ওই আকরিক কোন কাজেই লাগান যাবে না। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে অজস্র জলধারা। তার মধ্যে সুবনসিরি তো আছেই। পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, ডিরপাতি চা বাগানের উত্তরে সুবনসিরি গিরিসঙ্কটে বসানো হবে সুবনসিরি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। বাঁধ দিয়ে তৈরি হবে ২৮৩৬ মিলিয়ন ঘনমিটার পরিমাণ জল সঞ্চয়ের আধার। যে জল নব্বই মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে সক্ষম হবে। এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উপযুক্ত জায়গা নির্বাচনের দায়িত্বও ছিল জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার ভূতাত্ত্বিকদের ওপর। জীবন হাতে করে সে কাজ তাঁরা শেষও করেছেন। এছাড়া জিরোর কাছে ৩·৫ মেগাওয়াটের একটি খুদে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কাজ চলছে। এই প্রকল্পটিরও স্থান নির্বাচনে তাঁদের সাহায্য অপরিহার্য ছিল। নতুন রাজ্য তৈরি হলো। তার তো একটা বেশ সাজানো গোছানো রাজধানী চাই। যে জায়গাটা হবে মনোরম এবং ভূতাত্ত্বিক দিক দিয়ে নিরাপদ। ডাক পড়ল জিওলজিক্যাল সার্ভের। তাঁদের বলা হলো, ইটা দুর্গ থেকে কাছে এবং রাজধানীর বর্তমান স্থান নগর, লাগুন থেকে দশ কিলোমিটার পশ্চিমে একটি জায়গার সন্ধান মিলেছে। দেখুন, এখানে শহর তৈরি করলে সে শহর নিরাপদ হবে

কী, না। ভাল করে দেখুন সেখানকার ভূস্তর কতটা, জমাট। জায়গাটি পরীক্ষা করে ভূতাত্ত্বিকরা জানালেন, ঠিক আছে। এখানে রাজধানী বসান। স্থায়ী রাজধানী। কোন বিপদ নেই। আর তারপরই তো গড়ে উঠল অরুণাচলের স্থায়ী রাজধানী ইটানগর।

আছে। শুধু সুবনসিরিই বা কেন, আছে কামেং, তিরাপ, সিয়াং এবং লোহিত জেলার অরণ্য সম্পদ। সেখানে আছে দুর্লভ পাণ্ডা, বুনো মোষ, বিচিত্র সব পাখির সমাবেশ। আর আছে ভূতাত্ত্বিক ভাণ্ডার। বলবো। সব বলবো। মিঃ কর। ইয়ারজালি পৌঁছই আগে। সেখানে বসেই কথা হবে, এ-সব নিয়ে। বললেন ডঃ ত্রিপাঠী।

শিলং-এ পরিচয় হয়েছিল শ্রীউদ্ভবকৃষ্ণ বরদোইল-এর সঙ্গে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য জিওলজিক্যাল সার্ভের যে দলটি কাজ করে যাচ্ছেন, সেই দলেরই প্রধান উদ্ধববাবু। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস। প্রচণ্ড চটপটে এবং আমুদে।

শিলং-এ দেখা হলেও অরুণাচলের পার্বত্য এলাকায় প্রথমে তাঁকে আমি চিনতেই পারি নি। গায়ে চামড়ার জ্যাকেট। মাথায় চামড়ার টুপি। তাঁর জীপটি তখন আমাদের জীপের পাশে এসে ভিড়ল এবং তার ভেতর থেকে উঁচু গলার ডাক শুনলাম—এই যে, মিঃ কর, আমিও এসে গেছি—বলতে কি, প্রথমটায় ঘাবড়িয়েই গিয়েছিলাম। মুখে আমার নাম অথচ মুখটি চিনতে পারছি না কেন?

আমার মুখের দিকে চেয়ে হয়ত ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারলেন। তারপর স্বভাবসুলভ হাসি ছড়িয়ে বললেন, বরদোইল মশায়, বরদোইল। শিলং।

জানি, জানি। চিনতে পেরেছি। নিজের অজ্ঞতা মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললাম, আপনাকে আর পরিচয় দিতে হবে না। চিনতে

পেরেছি। অর্থাৎ মুহূর্তের জন্যে আমাকে হিপোক্র্যাট বনতে হলো।

বললাম, গোড়ায় একটু ভুল হচ্ছিল। মানে—

হচ্ছিল বুঝি? অসম্ভব নয়। টুপিটা খুলে ফেলি, তা হলে আর ভুল হবে না। বলেই মাথার ক্যাপটি খুলে নিলেন বরদোইল সাহেব।

অ্যাঁ, হ্যাঁ! এইবার করেক্‌ট। স্যার, টুপি বড় বিপজ্জনক জিনিস। পরিচিত জনকে চিনতে বড় বিশ্বাসঘাতকতা করে।

আমার পাশে বসেছিলেন সমরজিৎ চক্রবর্তী। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফোড়ন কাটলেন ঃ সে টুপি যদি আবার 'সত্যমের জয়তে' হয়।

তার মানে? আমার জিজ্ঞাসা।

মানে আর কি? দেখছেন না পুরো পোশাকটাই 'সত্যমের জয়তে'? পায়ে হান্টিং বুট, গায়ে জ্যাকেট, মাথায় টুপি। সব কেন্দ্রীয় সরকারের অবদান মশায়। আমরা বলি 'সত্যমের জয়তে'র কৃপা।

উদ্ধববাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, শিলং থেকে কখন এলেন আপনি?

গতকাল বিকেলের দিকে। উদ্ধববাবুর উত্তর।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই আরও দুটি জীপ এসে হাজির। তাদের ভেতর থেকে মিলিটারি কায়দায় নেমে এলেন কয়েকজন অফিসার। সবাই বয়সে তরুণ। শুরু হলো রীতিমত হইচই কাণ্ড।

এঁদের মধ্যে একজন চিৎকার করে হেঁকে উঠলেন, আমরা ভেবেছিলাম আপনারা বুঝি সকালে আসবেন। ভগবান বাঁচিয়েছেন। সকালে এলে খুবই দুর্ভোগ পোহাতে হতো।

ডঃ ত্রিপাঠী জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, মিঃ হোসেন? এনিথিং রং অন দ্য রোড?

মিঃ হোসেন, অর্থাৎ সেই ভদ্রলোক বললেন, কাল রাতে প্রচুর

বৃষ্টি হয়ে গেল স্যার। বৃষ্টির দরুন আমাদের একচল্লিশ নম্বর ক্যাম্পের কাছ বরাবর বিরাট একটা ধ্বস নেমেছে। রাত থেকে দুপুর দু'টো পর্যন্ত তো রাস্তা বন্ধই ছিল। কী বড় বড় পাথরের চাঁই। একটা বুলডজারে সে কি সরানো যায়? মাত্র কিছুক্ষণ আগে রাস্তা পরিষ্কার হয়েছে। সকালে এলে এতক্ষণ আপনাদের পথে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো।

উদ্ধববাবু তাঁর কথা লুফে নিয়ে বললেন, ডঃ ত্রিপাঠী, মাত্র কিছুক্ষণ আগে আপনারা কতদূর এলেন দেখার জন্যে আমি বেরিয়ে পড়েছি। সকাল থেকে সারাক্ষণ বন্দীদশায় কেটেছে।

তারপর আগন্তুকদের সঙ্গে একে একে তিনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। —ইনি মিঃ হোসেন, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, ড্রিলিং। ইনি মিঃ কে ভি মোহন। ইনিও ড্রিলিং-এর সঙ্গে জড়িত। মিঃ এম কে অগ্রবাল, জিওলজিস্ট। এবং মিঃ এম কে সাইকিয়া ভূ-পদার্থবিজ্ঞানী।

সবাই মিলে একটা পুরো রেজিমেণ্ট। আর এই রেজিমেণ্ট নিয়ে জীপের কনভয় ইয়ারজালির দিকে এগিয়ে চলল।

আগেই বলেছি, কিমিন থেকে রওনা হওয়ার পর পথের ঢাল ক্রমেই খাড়াই হতে শুরু করেছে। কোথাও কোথাও সত্তর ডিগ্রির মত খাড়াই।

কনভয়ের সামনের জীপটিতে বসে ডঃ ত্রিপাঠী এবং আমি। ডঃ ত্রিপাঠী পথের দুপাশের পাথর-স্তরের বৈচিত্র্য নিয়ে নাগাড়ে কথা বলছিলেন। বলছিলেন, এই যে দেখছেন, এটা শিবালিক অঞ্চল। এখানকার মাটি এবং পাথরের রঙটা লক্ষ করছেন, মিঃ কর। কেমন হলুদপানা রঙ। শিবালিকের এই পাথরের স্তরে আমরা নানা রকম

জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছি। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, দেখবেন, হঠাৎ এক জায়গায় এই হলদে রঙের ভূস্তর শেষ হয়ে গেছে। আর তার গায়ে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এশিয়াটিক রক। যার রঙ লালচে। অথবা কালো, লাল এবং হলুদ মিশিয়ে একটা অদ্ভুত তালগোল পাকানো রঙ।

আমাদের জীপ চলছিল, আবার ডঃ ত্রিপাঠীর নির্দেশে মাঝে মাঝে থেমে পড়ছিল। থামার পর সবাই নেমে পড়ছিলেন গাড়ি থেকে। তারপর প্রত্যেকে হাতুড়ি ঠুকে পাহাড়ের টুকরো সংগ্রহ করে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে পরীক্ষা করে পাথরের নমুনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। মনে হচ্ছিল তাঁরা তখন যেন অদ্ভুত মানুষ। জীবনের তথাকথিত চিন্তা-ভাবনা ভুলে গিয়ে ওই পাথরখণ্ডেরই যেন অঙ্গীভূত হয়ে গেছেন তাঁরা।

ইউরেকা! খাড়াই পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলতে চলতে এক জায়গায় এসে উচ্ছ্বাসে চিৎকার ডঃ ত্রিপাঠী। জীপ থামিয়ে আমাকে হাত ধরে প্রায় টানতেই নিয়ে গিয়ে পাঁচিলের মত খাড়া এক শিলা-স্তরের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

লেট মি শো ইউ দ্য বেস্ট কাইণ্ড্ অভ্ কোল, মিঃ কর। কখনও আপনি অ্যানথ্রেসাইট কয়লা দেখেছেন? আসুন আমার সঙ্গে। আপনাকে দেখিয়ে দিই। বলেই পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে থেকে হাতুড়ির ডগা দিয়ে এক টুকরো কালো বস্তু বের করে আনলেন তিনি।

এই হলো অ্যানথ্রেসাইট। বললেন ডঃ ত্রিপাঠী।

হালকা। সাধারণ কয়লার মত অত চকচকে কালো নয়। কতকটা কাঠ কয়লার মত খসখসে। তবে অতটা সচ্ছিদ্রও নয়, বরং 'কমপ্যাকট'।

জিজ্ঞেস করলাম, এ ধরনের কয়লা কী পরিমাণ এদিকে আছে বলে মনে করছেন আপনারা?

আমরা তারই তো সন্ধান করছি, মিঃ কর। পেয়েছি। কিছুটা পেয়েছি। লক্ষ লক্ষ বছর আগের গাছপালা ভূস্তরের মধ্যে চাপা পড়ে শেষ পর্যন্ত কয়লায় রূপান্তরিত হয়, সে কথা তো আপনারা জানেন। ধরুন, কোথাও হয়ত দু-একটি গাছ চাপা পড়ল। তারপর ভূতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে সেই গাছই রূপান্তরিত হলো কয়লায়। সে ক্ষেত্রে তো বেশি কয়লা পাবেন না। যৎসামান্য অ্যানথ্রাসাইট এদিকের অনেক জায়গাতেই পাওয়া গেছে। আমাদের লক্ষ, কিছু বড় ডিপোজিট পাওয়া যায় কী না, তার জন্যেই অনুসন্ধান চালানো।

ভালো। কিন্তু এই দুর্গম পরিবেশে সেই অনুসন্ধান চালানো কি খুব সহজ কাজ হবে?

আমার প্রশ্নে হেসে উঠলেন ডঃ ত্রিপাঠী। হঠাৎ শক্ত মুঠোয় আমার করমর্দন করে বসলেন তিনি। বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ।

আমি সকৌতুকে প্রশ্ন করলাম, কী হলো? এমন দুম করে আমাকে একটা ধন্যবাদ দেওয়ার কারণ কী?

কারণ, আপনি বুঝতে পেরেছেন, ভূতাত্ত্বিকদের কী পরিবেশে কাজ করতে হয়।

চমকে চেয়েছিলাম ডঃ ত্রিপাঠীর মুখের দিকে। এ প্রশ্ন কি কোন বঞ্চনার প্রতিফলন? শুধু ডঃ ত্রিপাঠীই নন। ঠিক একই ধরনের অভিব্যক্তি আরও অনেকের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। প্রচণ্ড কর্মঠ, প্রাণচঞ্চল এবং সহিষ্ণু এই ভূতাত্ত্বিকরা এবং সেই সঙ্গে জিওলজিক্যাল সার্ভের আর সব কর্মী, যাঁদের সঙ্গেই কথা বলেছি তাঁদের বেশির ভাগের মধ্যেই নিজেদের কাজ সম্পর্কে একটা গর্বের, একটা সন্তুষ্টির

মনোভাবও যেমন লক্ষ করেছি, তার পাশাপাশি অনুভব করেছি একটা যেন যন্ত্রণা। তাঁদের ধারণা, তাঁরা অবহেলিত। তাঁদের এত যে দুঃখ কষ্ট, সে খবর কেউ রাখে না। এমন কি, ন্যূনতম সহানুভূতি থেকেও কখনও কখনও তাঁরা বঞ্চিত হন।

ইয়াজালির পথে আমরা এগোচ্ছিলাম এবং মাঝে মাঝে থামছিলাম।

মিঃ হোসেন বললেন, আপনারা বরং ধীরে ধীরে দেখতে দেখতে আসুন। সেই ফাঁকে আমরা একচল্লিশ নম্বর ক্যাম্পে গিয়ে কিছু ব্যবস্থাপত্র করে রাখি। আজই ড্রিল করে কিছু বেস মেটালের নমুনা সংগ্রহ করেছি আমরা। দেখে আনন্দ হবে আপনাদের।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, সেই ভালো। আপনারা এগোন। আমরা পিছে পিছে আসছি।

মিঃ হোসেন সদলবলে চলে গেলেন।

আমরা এগোচ্ছি। কিমিন থেকে ইয়ারজালির দূরত্ব একান্ন কিলোমিটার। আর একচল্লিশ নম্বর ড্রিলিং ক্যাম্পের দূরত্ব একচল্লিশ কিলোমিটার। এ অঞ্চলে অনেক জায়গার কোন নাম নেই। থাকলেও সে নাম হয়ত শুধু ট্রাইব বা খণ্ডজাতির মুখে মুখেই ঘোরে। অথচ কোন জায়গায় আস্তানা পড়ল তার তো একটা পরিচয় থাকা চাই। এই পরিচয় দেওয়ার জন্যেই একটি সহজ পদ্ধতি মেনে চলেন ভূতাত্ত্বিকরা। যেখানে ওঁরা ক্যাম্প বসান, দেখে নেন কাছাকাছি সুপরিচিত কোন জায়গা থেকে সেই ক্যাম্পের দূরত্ব কতটা। তারপর সেই দূরত্বের সংখ্যাটিই হয়ে পড়ে সেই জায়গার পরিচয়। যেমন এই-ক্যাম্প নম্বর একচল্লিশ।

তবে আছে। গভীর অরণ্যের এই প্রত্যন্ত জায়গাটির নাম

আছে। আবহুল নালা।

নামটি শুনে প্রথমে কৌতূহলী হয়েছিলাম। কারণ এতটা পথ অতিক্রম করা সত্ত্বেও কিমিনের পর থেকে এ পর্যন্ত কোন লোকালয় চোখে পড়ে নি। তারপর এই মুসলমানী নাম। ইয়ারজালিতে জনৈক বনবিভাগের কর্মীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁকে জিজ্ঞেস করে-ছিলাম, আপনাদের এদিকে দেখছি প্রচুর মুসলমানী নাম। যেমন এই আবহুল নালা, এই ইয়ারজালি—

হুটি নয়। এমন নাম আপনি অনেক পাবেন এদিকে। বললেন তিনি। —আসলে ব্যাপার কি জানেন, আমরা নিজেরাও যে খুব জানি, তা বলব না। তবে ওই যে মোগল যুগে—এদিকে কেউ কেউ বলে থাকেন ওই সময় দিল্লির বাদশার ভয়ে অনেক মুসলমান যোদ্ধা এবং জমিদার অরুণাচলের এই সব হুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। পরে তাদের অনেকেই এদিকের খণ্ডজাতির সঙ্গে সামাজিক বন্ধনে মিশে যায়। তারাই এসব জায়গার অমন মুসলমানী নাম রাখে।

প্রায় হাজার হুই ফুট উপরে উঠে এসেছি আমরা। বন আরও গভীর হয়ে আসছে। দেখলাম এদিকেও প্রচুর কলাগাছ। আর কী লম্বাই না এক একটি কলাগাছ। অন্তত পঁচিশ তিরিশ ফুট তো হবেই। আছে নানা রকম লতাপাতা, বিশাল বিটপী।

কিছুটা এগোতেই একটা ঝোলানো সেতু। সেতুর সামনে এসে ডঃ ত্রিপাঠী চালককে জীপটি দাঁড় করাতে বললেন। আমাদের সামনে যাচ্ছিল সমরজিৎ চক্রবর্তী এবং অজিত ব্যানার্জীর জীপ।

ডঃ ত্রিপাঠী চালককে বললেন, ওঁদের জীপটি আগে ব্রীজটি পার হয়ে যাক, তারপর আমরা এগবো। বলেই আমার দিকে চেয়ে মৃহু হাসলেন তিনি।—বুঝলেন কিনা, মিঃ কর। কতকগুলি নিয়ম যদি

সব সময় আমরা মাথার মধ্যে রেখে দিই এবং কঠোরভাবে তাদের যদি মেনে চলি, তাতে অনেক দুর্ঘটনাই কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। এই যে ব্রিজটা দেখছেন, এতে বেশি বোঝা তোলা বারণ। অতএব যাক না আগের জীপটা। আমরা না হয় একটু দেরি করেই যাব। তা ছাড়া এসব ব্রীজে দুটি গাড়ি এক সঙ্গে চললে রেজোনেন্স্ এফেকটের জন্যে ব্রীজটি কোলপস্‌ও করতে পারে। রেজোনেন্স্ বোঝেন তো?

জানি। মানে আপনি বলতে চান, দুটি গাড়ি ব্রীজের ওপর চলার সময় একই তালে ব্রীজটি কাঁপতে শুরু করল। গাড়ি চলার দরুন যে কম্পন, সেই কম্পন যখন গোটা ব্রীজটির কম্পনের মত হয়ে দাঁড়াল, তখনই বিপদ। তখন প্রচণ্ড কম্পনের দরুন গোটা ব্রীজটিই ভেঙ্গে পড়তে পারে। বললাম আমি।

কতকটা সেই রকমই বটে। ডঃ ত্রিপাঠীর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

মুহূর্তের জন্যে কিছুটা যেন অন্যমনস্ক হলেন তিনি। সেই সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস। বললেন, সামান্য সতর্কতার অভাবে কিছুদিন আগে কয়েকটি অমূল্য জীবন আমরা হারিয়েছি, মিঃ কর। এই অরুণাচলেই হারিয়েছি। একসপিডিশন ছেড়ে তারা বাড়ি ফিরছিল। পথে পড়ল নদী। নদী মানে কয়েক শ' ফুট নিচে গভীর গিরিখাতের তলায় ছুটন্ত জলধারা। একটা বেতের সেতু দিয়ে সেই জলধারা পার হচ্ছিল তারা। দীর্ঘদিন ধরে ঘরবাড়ি ছেড়ে মানুষ কোন দুর্গম পরিবেশে কিছুদিন কাটিয়ে আবার ঘরমুখী হয়, জানি ঘরের টানে কিছুটা অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হওয়াটা কিছু দোষের নয়। কিন্তু তাই বলে আত্মবিস্মৃত হলে চলবে কেন? কথা ছিল, ওই সেতু এক একজন এক এক করে পার হবে। কিন্তু কে মনে রাখে সে কথা। একসঙ্গে একাধিক

জন লাফিয়ে উঠল সেতুতে। মাঝপথে কোলাপস্। তার পরিণতি কী ভাবতে পারেন?

আগের জীপটি ব্রীজটি পেরিয়ে গেছে ততক্ষণ। শক্ত ইস্পাতের তৈরি তার কাঠামো দেখলাম কাঁপছে।

ডঃ ত্রিপাঠী এবার চালককে নির্দেশ দিলেন, চলুন। আর গাড়ি যেই ব্রীজের ওপর উঠল, আমার দিকে চেয়ে কতকটা নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন, নাউ উই আর ক্রশিং সুবনসিরি।

এই সেই সুবনসিরি। আমি রোমাঞ্চিত।

ডঃ ত্রিপাঠীকে বললাম, আপনি তো সাংঘাতিক লোক দেখছি। সুবনসিরির সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম, আর এতক্ষণ সে কথা আপনি চেপে গেছেন?

ইটস্ এ সারপ্রাইজ! এই তো প্রথম। সুবনসিরিকে আরও কয়েকবার অতিক্রম করতে হবে আমাদের।

আরও ওপরে কোথাও বৃষ্টি হয়েছিল। আর বৃষ্টির জল মানেই ঢল। ব্রীজের ওপর দিয়ে ধীর গতিতে যাচ্ছিল জীপ। আর তাব নিচে উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে দুর্বার গতিতে বান ডেকে ছুটে চলেছে সুবনসিরির জলধারা। নিচে। অনেক নিচে।

ভয়ঙ্কর নদী, মশায়। আর একটু এগিয়ে চলুন, সুবনসিরির আর একটি ব্রীজ দেখতে পাবেন। এটা সম্প্রতি তৈরি হয়েছে। তাব পাশেই ছিল পুবনো ব্রীজ। কী বলব, আপনাকে। কয়েক বছর আগে কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতেই এমন বন্যা এল, তার তোড়ে সেই ব্রীজ বেমালুম খতম। নতুন ব্রীজটি তৈরি করতেও প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। একবার কংক্রিটের তৈরি পুরো বাঁধটাই উড়ে গেল। বললেন ডঃ ত্রিপাঠী।

প্রায় ছয় কিলোমিটারের মধ্যে আমরা উঠে এলাম আরও পাঁচশ' মিটার। সামনেই সেই ধ্বস। একেবারে রাস্তার গা ঘেঁষে। ধ্বসের অদূরেই সেন্ট্রাল পি ডব্লু ডির বুলডজারটি দাঁড়িয়ে। জায়গাটি একেবারে সুবনসিরির গা ঘেঁষে।

মাই গড্! বলেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন ডঃ ত্রিপাঠী। তাঁর পিছু পিছু আমরা নামলাম।

না। ধ্বসের চেহারা দেখে তিনি আতঙ্কিত। তবে অবাক নন। এ জায়গাটায় প্রায়ই ধ্বস নামে। বিশেষ করে একটু বেশি বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। আর এর জন্যেই সেন্ট্রাল পি ডব্লু ডি এখানে বসিয়েছে তাদের একটি স্থায়ী ক্যাম্প। কয়েকজন কর্মী সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে এখানে বাস করছেন। এই বুঝি ধ্বস নামল আবার। ওদের সঙ্গে আছে বুলডজার, বড় বড় ট্রাক এবং জীপ। যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি কারণ ইটানগর, কিমিন, ইয়ারজালি হয়ে হাফেলি যাওয়ার এটাই একমাত্র পথ। আর হাপোলি না যেতে পারলে জিরোতে যেতে পারবেন না। সীমান্ত প্রতিরক্ষার জন্যে ওই সব অঞ্চলের গুরুত্ব এখন বেশি।

প্রকৃতি এত সুন্দর! আবার এত নির্মম?

আমাদের বাঁ পাশে পাহাড়ের ঢাল উঁচু পাঁচিলের মত খাড়াই উঠে গেছে প্রায় একশ' মিটার। ঝুরঝুরে মাটি। তার মধ্যে ছোট বড় বোল্ডার। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, কে যেন খাবলা মেরে বোল্ডার সুদ্ধ সেই মাটি বের করে নিয়ে এসে পথের ধারে ছড়িয়ে রেখেছে। এ ধরনের অঞ্চল নিয়েও মাথা ঘামাতে হচ্ছে জিওলজিক্যাল সার্ভের ভূতাত্ত্বিকদের। দেখতে হচ্ছে, পথের কোথায় কোথায় এমন মরণফাঁদ।

শুধু কি মরণফাঁদ? বললেন একজন। গত ভোর রাত থেকে এই সড়ক একেবারে ডেড। ইলেকট্রিক থামগুলিও উপড়ে গেছে। সমস্ত

যানবাহন চলাচল বন্ধ। না যেতে পারছে লোকজন, না যেতে পারছে রসদ। একেবারে তালগোল অবস্থা, মশায়।

আঁতকে ওঠার মতই কথা। তবু একটা ব্যাপার দেখে ভাল লেগেছে। ভাল লেগেছে সেণ্ট্রাল পি ডব্লু ডি'র তৎপরতা। মাত্র কয়েক ঘণ্টার অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁরা পথটি পরিষ্কার করে যান-বাহনের যাতায়াত সুগম করে তুলেছেন। মনে মনে ভাবছিলাম, তবু রক্ষে!

প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা। এব মধ্যে ডঃ ত্রিপাঠী ঘুরে ফিরে সদলবলে এখানকার ভূতাত্ত্বিক চরিত্রটি জেনে নিলেন। নানা অ্যাঙ্গেল থেকে তোলা পাথবের ছবি। এই ছবি পরে ওঁরা পরীক্ষা করবেন। তাবপর বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, এখানে অত ধ্বস নামে কেন। কী করলে এই সমস্যার সমাধান করা যায়।

এখান থেকে প্রায় এক ঘণ্টা পর যখন একচল্লিশ নম্বর ক্যাম্পে গিয়ে পৌছলাম, তখন ঘন অন্ধকার। আমরা পৌছতেই রীতিমত শোরগোল পড়ে গেল সেখানে। মিঃ হোসেন তো একটা জাঁকালো চায়ের আসরই বসিয়ে ছাড়লেন। আশপাশের ক্যাম্প থেকে ছুটে এলেন সবাই। জিওলজিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার, কর্মী, এমন কি নেপালী কর্মীদেব পরিবারদেরও দেখলাম, সবাই রীতিমত উৎসাহিত। কে কার কথা আগে বলবেন, সে নিয়ে সবাই ব্যস্ত।

মোহন বলল, আমরা ভেবেছিলাম আলো থাকতে থাকতে এসে পড়বেন আপনারা। তা হলে ড্রিলিং সাইটে নিয়ে যেতাম। মানে ওই সুবনসিরির ওপরে ওই যে পাহাড়টা দেখছেন, তার মাথায়। প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। ওখানে আমরা বেসিক মেটালের সন্ধান পেয়েছি।

ডঃ ত্রিপাঠী জিজ্ঞেস করলেন, বৃষ্টি হয়ে গেল। এ সময়ে ওই ধরনের পথ দিয়ে মিঃ কর কি উঠতে পারবেন?

ডঃ ত্রিপাঠীর কথায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম আমি। না, না, আপনাকে কথাটা উইথড্র করতে হবে, ডঃ ত্রিপাঠী। আমার ক্ষমতা সম্পর্কে এমন সন্দেহ মোটেই আমি বরদাস্ত করতে পারছি না।

আমার কথায় হেসে ফেললেন ডঃ ত্রিপাঠী।—আই উইথড্র। জানি, আপনি পারবেন। ধ্বসের সামনে সুবনসিরির ঢাল বেয়ে যে রকম ছোটাছুটি করছিলেন, তাতেই আমার সন্দেহ দূর হয়েছে। বলেই আমার হাতের ওপর সজোরে একটি চাপড় বসিয়ে দিলেন তিনি।

এই। এই সেই ডেভিল! হাতের মুঠো মেলে ধরলেন ডঃ ত্রিপাঠী। তার ওপর কালো রঙের ছোট একটি পোকা। চাপড়ের চোটে চ্যাপটা হয়ে গেছে।

ডিমডিম। বললেন ডঃ ত্রিপাঠী।

এই সেই ডিমডিম? মানে এই সেই ডেভিল?

সঙ্গে সঙ্গে সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলেন। একজন তো তাঁর গালটাই এগিয়ে দিলেন আমার চোখের সামনে।—দেখুন, অবস্থাটা কি করেছে ডিমডিম আমার।

বেচারার গালটি দেখে হাসব, কি কাঁদব! অমন দশাসই চেহারা। আর এই খুদে পোকা কিনা তাঁকেও ঘায়েল করে মেরেছে?

গালের পাশটা ফুলে উঠেছে তাঁর। সেই সঙ্গে যন্ত্রণা। শেষ পর্যন্ত গালের ওপর ঘা-ই হয়ে যাবে।

দে আর টেরিবল্ ক্রিচার। মন্তব্য করলেন মোহন।—দেখতে

খুদে হলে কী হয়, মারাত্মক এই মাছির কামড়ে আঁমাদের প্রাণান্তকর অবস্থা। তা, সব জায়গায় এদের পাবেন না। একটা বিশেষ উচ্চতায় এদের বাস। যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওদের। এদের জ্বালায় আমাদের তো অতিষ্ঠ অবস্থা। তারপর জঙ্গলে চলুন। পাশ থেকে, ওপর থেকে লাফিয়ে নামছে জোঁক। সব রক্তচোষার দল। তাহলে ভাবুন, জিওলজিস্টদের লাইফটা কী রকম?

তবু একচল্লিশ নম্বর এই ক্যাম্পটি একপক্ষে ভাল। এখানে কেউ কেউ পরিবার নিয়ে বাস করেন। তাঁদের স্ত্রী-পুত্র সবাইকে পাশে পেয়ে নিজের বিচ্ছিন্ন পারিবারিক জীবনের বঞ্চনা কিছুটা হয়ত মিটিয়ে নেওয়া যায়।

স্টিল আই অ্যাম হোম সিক, মিঃ কর। আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে এসে মন্তব্য করলেন মোহন।—আই হেট টু মিস্ মাই ফ্যামিলি, মাই সুইট ওয়াইফ অ্যাণ্ড মাই বেবী।

কী যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু থামতে হলো। ডঃ ত্রিপাঠীর তাগাদা: সাতটা বেজে গেছে। এখনও প্রায় এক ঘণ্টার পথ ইয়ারজালি। কাল সকালে বরং কথা হবে, কেমন?

এর পর আর অপেক্ষা করা চলে না। প্রথমত আকাশও মেঘে ভারি হয়ে আসছিল। তাছাড়া এসব পথে বেশি রাতে ড্রাইভ করাও বিপদ। কোথায় কোন খানাখন্দ আছে কে বলতে পারে?

তখনকার মত বিদায় নিলাম আমরা। এবং অবশেষে ইয়ারজালিতে এসে যখন পৌঁছলাম বরদলৈ সাহেব বললেন, একটু ফ্রেশ হয়ে বসি। তারপর চা খেতে খেতে পুরো অরুণাচলের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে আপনাকে বলব, মিঃ কর। কাল সকালে তো আমরা হাপোলি যাচ্ছি। সেখানে যাওয়ার পথেই দেখবেন ওদিকের আদিবাসী নিশি

সম্প্রদায়। বিশ শতকের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যুগেও কী অদ্ভুত তাদের সারল্য। কত অল্পেতেই তারা তুষ্ট। মানুষ যে কত সরলভাবে প্রকৃতিকে আত্মীয় করে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না।

উদ্ধববাবুর কথা শুনে মনটা আমার আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। আর পবদিন সত্যি সত্যিই একটি নিশি পরিবারের সান্নিধ্যে গিয়ে যখন হাজির হলাম, সেই প্রথম আমার মনে হলো, মানুষের কাছে মানুষকে ভালবাসার মত দ্বিতীয় আর কোন সামগ্রী পৃথিবীতে আছে কি?

দশ

শিলং ছাড়ার সময় শম্ভু সেন বলেছিলেন, অরুণাচলে তো যাচ্ছেন। গেলেই দেখবেন, দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল কাকে বলে। পদে পদে বিপদ, মশায়, পদে পদে বিপদ। এই প্রদেশটির মোট আয়তন ৮৩,৫৭৮ বর্গ-কিলোমিটার। তার ৭০,০০০ বর্গ-কিলোমিটারই দখল করে রয়েছে গিরিরাজ হিমালয়। আর সেই অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজ চালানো কি সহজ কথা! এ পর্যন্ত সারা প্রদেশের মাত্র পনেরো শতাংশ জায়গায় আমরা অনুসন্ধান চালাতে পেরেছি। গাড়ি তো দূরের কথা, বহু জায়গায় আপনি পায়ে হেঁটেই যেতে পারবেন না। ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্যে তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে ছবির ওপর। মানে, যাকে আমরা

বলে থাকি ফটোজিওলজি। প্লেন এবং কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে এখানকার বিস্তৃত এলাকার ছবি তোলা হয়েছে। সেই সব ছবি বিশ্লেষণ করে বহু এলাকার মোটামুটি একটা বিবরণ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। এ ব্যাপারে মার্কিন দেশের কৃত্রিম উপগ্রহ আমাদের সাহায্য করেছে। বলতে বাধা নেই, কিছুদিন আগে আমরা লোহিতের বরফ ঢাকা উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে একটি অভিযান চালিয়েছিলাম। কোন পথ দিয়ে আমাদের যেতে হবে, কোথায় আমাদের তাঁবু বসাতে হবে সে ব্যাপারে অনেক তথ্য ওই সব ছবি থেকেই আমরা জানতে পেরেছিলাম।

শম্ভুবাবু বললেন, নর্থ ইস্টার্ন কাউনসিল আমাদের সাহায্য করেছেন। সাহায্য করেছেন হায়দ্রাবাদের এন জি আর আই। ওঁদের সহায়তায় এ অঞ্চলে আকাশ থেকে চৌম্বক ক্ষেত্রের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বিভাগ ১৯৭৭-৭৮ সালে ৭৫০ বর্গ-কিলোমিটার এলাকার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করেছেন, যার স্কেল ১ : ৫০,০০০। কামেং এবং সুবনসিরি জেলায় কম করেও আধ ডজনের মত বেস মেটালের ডিপোজিট আমরা খুঁজে পেয়েছি। অনেক কিছু নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। তবে আপনার এই ভ্রমণে একটা জিনিস দেখতে পাবেন না—সেই জায়গাটা যেখানে ডিহং প্রকল্প নিয়ে কাজ হচ্ছে। পৃথিবীর এটা অন্যতম বৃহত্তম বাঁধ প্রকল্প। প্রস্তাব, সিয়াং জেলার রোটিং-এ তৈরি করা হবে ২১৪ মিটার উঁচু বাঁধ। যার জলাধারের জলধারণ ক্ষমতা দাঁড়াবে এক কোটি নব্বই লক্ষ একর ফুট। এই প্রকল্প ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিস্তৃত এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগবে। এছাড়া এই প্রকল্প থেকে ৭৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথাও ভাবা হচ্ছে। বিরাট

কাজ, মশায়। বড় দায়িত্ব। জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়া এখানকার জিওটেকনিক্যাল অর্থাৎ ভূ-প্রযুক্তিগত দিকটি এখন খতিয়ে দেখছে। প্রস্তাব করা হয়েছে ২১৪ মিটার নয়, বাঁধটি উঁচু করা হবে ২৩০ মিটার পর্যন্ত। তা যদি হয়, ভাবুন আমাদের দায়িত্বটা। ওই এলাকার ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে আমাদের পুরোপুরি অনুসন্ধান করতে হচ্ছে। দেখতে হচ্ছে কোথায় এবং কীভাবে অত ভারি এবং অত বড় একটি বাঁধ বসালে সেই বাঁধ না বসে যায়। পুরো প্রকল্পটাই না পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। আমরা আনন্দিত। অরুণাচল সরকারও নানাভাবে আমাদের সাহায্য দিয়ে আসছেন। অনেক সময় এমন হয়, কোন দুর্গম জায়গায় আমাদের কর্মীরা হয়ত আটকে পড়ল, অথবা দুর্ঘটনায় কেউ আহত হলো। আকাশ থেকে তখন তাদের খাবার জুগিয়ে অথবা চিকিৎসার সাহায্য দিয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে তাঁরা সহজ করতে এগিয়ে আসেন।

ইয়ারজালির সরকারী আবাসে পৌছে এ-সব কথাই মনে পড়ছিল আমার।

সমুদ্রতল থেকে এখানকার উচ্চতা প্রায় চার হাজার ফুট। উত্তর লখীমপুর থেকে আসার পথে ভ্যাপসা গরম ছিল। এখানে সেটা নেই। পৌষের শীতের মত হিমেল স্পর্শ। রাতের অন্ধকারে ঠিক কি ধরনের পরিবেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি, অনুমান করাও শক্ত। তবে সরকারী কৃপায় এখানেও বিদ্যুতের আলো এসেছে। সেই আলোয় শুধু এটুকু বোঝা গেল, দুর্গম হলেও পথক্লান্ত আশ্রয়প্রার্থীর জন্যে মোটামুটি যতটা সুযোগ সুবিধে দরকার সবই আছে এখানকার সরকারী আবাসে। বাংলোর শেষ প্রান্তে যে ঘরটি আমার জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেখান থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম পার্বত্য জলধারার

কলকল ধ্বনি। বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, কিছুক্ষণ আগেই। তারপর কিছু-ক্ষণের জন্যে মেঘমুক্ত আকাশে লক্ষ তারার আবির্ভাব। ঘন অরণ্য। তার ভেতর থেকে অত রাতেও কানে ভেসে এলো পাখির ডাক।

বাংলোর জনৈক কর্মী বললেন, এই আপনাদের মত লোকজন যখন কেউ আসেন, তখন তবু মানুষের শব্দ শুনি। তাছাড়া আছে কিছু ওখানে? শুধু লকড়ি, আর জানোয়ার। তা স্যার, আমার দেখতে দেখতে এখানে প্রায় বছর পাঁচ কেটে গেল। প্রথম যখন আসি, কী বলব আপনাকে, কলজেটা যেন শুকিয়ে যায়। বিশেষ করে রাতে। এখন আর কী দেখছেন? কয়েক বছর আগেও এখানে আর ক'জন লোক যাতায়াত করত? লোক বলতে তখন তো ওই জঙ্গলবাবুরা। মানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক। তা ওনাদের কথা ছেড়ে দিন। ওনাদের চালচলন দেখলে মনে হয় বন-জঙ্গলে বাঁচার জন্যেই যেন ওনারা জন্মেছেন। কিন্তু আমার কথা একবার ভাবুন, স্যার। কোথায় চব্বিশ পরগনা, আর কোথায় অরুণাচলের এই ইয়ারজালি। একেবারে রামের বনবাস। প্রথম যখন এখানে আসি, সারা রাত কি ঘুম হয়। কিম্ভুত সব পাখি আর জানোয়ারের ডাকে জেগেই কাটাতে হতো তখন। এখন তো বলতে পারেন স্বর্গরাজ্য। আগের চেয়ে এখন লোক বেড়েছে। এই পাথরবাবুর আসছেন, আসছেন সি পি ডব্লু ডি-র লোক। চীনের যুদ্ধের পর তোড়জোড় করে শুরু হলো পথ তৈরির কাজ! মিলিটারিরা আসছে। কাল সকালেই দেখবেন, কিছু নেপালী শ্রমিকরা এসেও এখানে বসতি বানিয়েছে।

হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হতেই চা এবং যৎসামান্য খাবার এল। আমরা সবাই গিয়ে ডাইনিং হলে বসলাম। তা ছোটখাটো একটা

পার্টি বলতে পারেন।

এম কে অগ্রবাল বললেন, আজকের ডিনার এখানে। কাল লাঞ্চ আমার ক্যাম্পে। কাল দুপুরের দিকে আপনাকে দেখাবো কী ধরনের ভূতাত্ত্বিক নমুনা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি।

শুরু হলো আলাপ আলোচনা। ডঃ ত্রিপাঠী সবার কাছ থেকে এ অঞ্চলে এখন কোথায় কী ধরনের কাজ চলছে তার হিসেব নিতে লাগলেন। তার এক ফাঁকে পকেট থেকে আমি বের করলাম কয়েকটি চিরকুট। ওঁরা কথা বলতে লাগলেন, আর এক একটি চিরকুটে আমি এক একটি করে পয়েন্ট লিখে যেতে লাগলাম। তারপর চায়ের আসর যখন শেষ হলো, আমি এক একটি চিরকুট সবার হাতে ধরিয়ে দিলাম।

কী ব্যাপার, মিঃ কর? ডঃ ত্রিপাঠীর প্রশ্ন।

কিছুটা কপট গাম্ভীর্য নিয়ে বললাম, বুঝতে পেরেছি, রথ দেখা এবং কলা বেচা দুই-ই চলছে। আমার তাতে লাভই হচ্ছে বরং। আপনারা করছেন ভূতত্ত্ব। আর আমি করছি ভূতাত্ত্বিকদের সঙ্গে সফর। এতক্ষণ আপনাদের আলোচনা শুনছিলাম। প্রচুর কথা, ডঃ ত্রিপাঠী। এ-সব তো আমরা কিছুই জানি না। যা বললেন এতক্ষণ আপনারা, আমার মনেও থাকবে না। তাই এক একটা চিরকুটে আমার এক একটি প্রশ্ন লিখে দিয়েছি। আমার জন্যে একটু হোম-ওয়ার্ক করতে হবে আপনাদের। ওই প্রশ্নের উত্তরগুলি লিখে দিতে হবে। বেশি না। সংক্ষেপে লিখলেই চলবে।

ডেনজারাস। ইউ মিন উই হ্যাভ টু ডু সাম হোমওয়ার্ক ফর ইউ?

দ্যাটস একজ্যাকটলি হোয়াট আই মিন। আপনারা একটু না লিখে দিলে আমি সব ভুলে যাব। তাছাড়া আমার মগজটাও একটু

নরম। সব কথা সেখানে ঠিক জমে বসতে চায় না।

আমার মন্তব্যে হো হো করে হেসে উঠলেন সবাই।

শ্রীসাইকিয়া বললেন, হবে, সব হবে, মশায়। ফেরার পথে আমার লেখাটা আপনি পেয়ে যাবেন। জিও-ফিজিক্যালের পার্টটা।

বলতে কি, সে রাতে আমিও ঘুমতে পারি নি। সরকারী আবাসে সবাই যখন ঘুমে অচেতন, নিজের বিছানায় শুয়ে সারা রাত আমি শুধু এ-পাশ ও-পাশ করে কাটালাম। কখনও দূর থেকে ভেসে আসছিল ফেউ-এর মত একটানা ডাক। মাঝে মাঝে পাখির বিকট শব্দ। জলের সেই একটানা কলতান যেন আরও স্পষ্ট। আরও ব্যক্ত। শেষ রাতে শুনতে পেলাম, খুব কাছেই খুব উচ্চ কণ্ঠে একটি পাখি ডেকে চলেছে। ডাকছে। থামছে। আর থামছে যখন, অনুরূপ শব্দ ভেসে আসছে দূরের কোন জায়গা থেকে। মনে হচ্ছিল, একজন ডাকছে, অপরজন সেই ডাকে সাড়া দিয়ে চলেছে নিরন্তর। মনে হচ্ছিল, সেই ডাকের যেন একটি ভাষা আছে। সেই সঙ্গে একটি সঙ্গতি আছে। ভাবছিলাম, পাখিও কি তা হলে নিজেদের মধ্যে কথা বলে?

যখন ঘুম ভাঙ্গল, ঘড়িতে তখন চারটে বেজে গেছে। আকাশ পরিষ্কার। আমার পাশের খাটে শুয়ে ছিলেন অজিতবাবু। তখনও ঘুমচ্ছেন তিনি। তাঁকে ডেকে তুললাম।

হঠাৎ আচমকা ঘুম ভাঙ্গাতে ভদ্রলোক একটু বিরক্তই হলেন আমার ওপর। বললেন, এখন তো মাত্র চারটে। আর একটু ঘুমবো না? কেউ তো ওঠেন নি এখনও।

ছাড়ুন মশায় চারটে। আপনাদের কলকাতায় চারটে মানে ভোর রাত। কিন্তু এটা অরুণাচল মশায়, এটা অরুণাচল। অরুণের আগমন

এখানে ঘটে অনেক আগে। এখানে এসে তাঁর সেই আগমন মুহূর্তটিই যদি না দেখলেন, তবে দেখলেন কী?

বুঝতে পেরেছি। আমার ঘুমের দফারফা। তবে মনে রাখবেন, সারা দিন আজ পথেই কাটাতে হবে। হয়ত গোটা রাতটাও। তখন শেষ পর্যন্ত না শরীরটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

অজিতবাবুর কথায় হেসে উঠলাম আমি। বুঝলাম, বেচারা আর একটু ঘুমোতে চান। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। পাহাড়ে দেশে এসে পাহাড়ী মানুষের দিন কীভাবে শুরু হয়, যদি সেটাই না দেখলাম, তা হলে যে ঘাটতি থেকে যাবে অনেক।

তবু ঘাটতি কিছুটা থেকেই গেল। যথেষ্ট তাড়াহুড়ো সত্ত্বেও সরকারী আবাস থেকে যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম, বুঝলাম বেশ কিছুটা দেরি করে ফেলেছি। পথে দু একজন লোক। লোক মানে মহিলা। সুন্দর পিচ ঢালা রাস্তা। বাংলোর সামনে দু'টি খাড়াই পর্বতচূড়া। তাদের ফাঁকে গিরিখাত। জঙ্গলাকীর্ণ। পথ থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে আর একটি গভীর গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে সুবনসিরি নদী। বাংলোর একপাশে কাঠের মেঝে এবং পাঁচিল ঘেরা নতুন নতুন ঘর উঠেছে। টিনের চাল। বসতি। নেপালী বসতি। বনের কাঠ সংগ্রহ এবং তার বেচা-কেনাই এদের পেশা। সামনে একটি ছোট্ট দোকান। অত ভোরেও দোকানটি খোলা রয়েছে, দেখলাম। একজন তরুণী নেপালী সেখানে পসরা নিয়ে বসে রয়েছে। পসরা বলতে সিগারেট, ম্যাচ, চাল, ডাল, নুন, ইত্যাদি। দেখলাম মঞ্জরির মত দেখতে সবুজ রঙের এক ধরনের ফল। শুনলাম বন থেকেই এগুলি সংগ্রহ করা হয়। এক পয়সা দুই পয়সা বিনিময়ে স্কুলের বাচ্চারা এদের কেনে। আমাদের

বাচ্চারা যেমন হজমীগুলি কেনে, কতকটা সেই রকম।

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করতে তো হেসেই অস্থির। বলল, নিন না। পয়সা দিতে হবে না।

বললাম, সে কি হয়? ভোরে দোকান খুলে বসেছ। বউনি বলে একটা কথা আছে তো। বেশ, ওই ফলের জন্যে পয়সা না নাও, এক প্যাকেট সিগারেট দাও বরং? এক প্যাকেট উইলস ফ্লেক।

উইলস ফ্লেক নেই। ক্যাপস্টান আছে। আর আছে চারমিনার।

তা হলে ক্যাপস্টানই দাও বরং। কত দেব?

এক টাকা।

সে কী? এত সস্তা? চমকে প্রশ্ন করলাম আমি।

কেন? এক টাকাই তো দাম। মেয়েটি আমার কথায় যেন অবাক হলো।

না, মানে, আনতে তো খরচ পড়ে। আমার উত্তর।

না। ওই এক টাকাই দাম।

অদ্ভুত মেয়েটি। কত আর বয়েস? বছর আঠারো। সুন্দরী তো নিশ্চয়। কিন্তু সৌন্দর্যই কি শুধু? সারা মুখে তার সমুদ্রের মত সারল্য। হিমালয়ের মতই হয়ত আত্মবিশ্বাস। অন্তত ওই পরিবেশে একটি কথাই মনে হলো, এ মেয়ের মধ্যে প্রত্যয় আছে। শহরের চুনকালি মাখা মুখে মেয়েদের রূপ তো কবরস্থ হয়! আর এ মেয়ে —কোন পুরুষের সাহস আছে এর সামনে দাঁড়িয়ে খারাপ কিছু ভাবে? যেন দেবকন্যার মতই সরল। আর এই সারল্যের বনিয়াদ সততা। যেখানে মাথা এমনিতেই নুইয়ে আসে।

ঠিক একটা টাকাই হাতে গুনে দিয়ে মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

মেয়েটি বলল, আবার আসবেন। ভাষা হিন্দী।

বলল। কিন্তু ও জানে, আমরা পরদেশী। হয়ত কোনদিনই ওর সঙ্গে আমাদের আর দেখা হবে না। তবু বলল। খদ্দেরকে ওই কথাই বলতে হয় যে সব সময়।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে অজিতবাবু বললেন, একটা ছবি নিলে ভাল হতো।

দাঁড়ান, মশায়। ছবি-টবির কথা ছাড়ুন। ওর অনেস্টির কথা ভাবুন দেখি? কোথায় ইয়ারজালি। এমন গহন জায়গায় দোকান করে বসেছে। অথচ এতটুকু নাফার লোভ নেই। আমি বলছি, এই দোকান যদি কোন অন্য জাতের হতো, এক প্যাকেট ক্যাপস্টানের দাম নির্ঘাৎ সে পাঁচসিকে আদায় করে ছাড়তো। প্লেনের মানুষরা, মশায়, মুনাফাবাজিতে ওস্তাদ। এ ব্যাপারে তাদের লাজলজ্জা ভয়, এতটুকু নয়।

যা বলেছেন। আমার কথায় সমর্থন জানালেন অজিতবাবু।

সামনেই ছোট্ট একটি নালা। দূরের কোন ঝরনার জলে সম্পৃক্ত। কোথাও হয়ত বৃষ্টি হয়েছে। ফলে নালাটির স্রোতও গেছে বেড়ে। নালার পর থেকেই শুরু হয়েছে খণ্ড জাতির গ্রাম। ছোট ছোট ঘর। এগিয়ে গেছে সামনের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরের দিকে। এক একটি ঘরের সামনে ছোট্ট বাগান। বাগানে ভুট্টার চাষ করেছে ওরা। বড়দের চোখে পড়ল না। বড়দের মধ্যে যারা মেয়ে, তারা চাষবাস করতে দূরের কোন পাহাড়ের মাথায় ব্যস্ত। ঝুরা চাষ। পুরুষরা কেউ রাস্তার কাজে নেমেছে। কেউ জিওলজিক্যাল সার্ভে অদূরে যে ড্রিলিং চালাচ্ছে, সেখানে কাজ করতে গেছে। গ্রামের অধিবাসী বলতে, অন্তত এই সকালে—এক দঙ্গল বাচ্চা। বড় বড় ছেলেমেয়েরা

তাদের ছোট ভাইবোনদের দেখাশুনা করছে। তাদের নিয়ে খেলছে।

শুনলাম ছোট্ট একটি প্রাইমারি স্কুল আছে এখানে। লেখাপড়া থেকে শুরু করে সেখানে তারা হাতের কাজ শেখে।

পাশ দিয়ে দু'টি মেয়ে হেঁটে গেল। কালো পোশাক।

অজিতবাবু বললেন, এরা নিশি। এদের ড্রেস সব সময় কালো।

চারদিকটা ঘুরে বাংলোয় ফিরলাম সাতটা নাগাদ। এতক্ষণ সবাই উঠে পড়েছেন। আমরা যেতেই ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, আস্থন, আস্থন, উই আর গেটিং ডিলেড্। চা জলপান সেরে এখনই বেরিয়ে না পড়লে হাফোলি থেকে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে আমাদের।

সব সেরে আটটার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পথে ড্রিলিং ক্যাম্প। বেস মেটালের সন্ধানে এখানে কাজ করছেন জিওলজিক্যাল সার্ভের কর্মীরা। পথ এবার খাড়াই। আশপাশে গ্রামের চিহ্ন নেই। প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পর পড়ল ইয়াচালি। এটি একটি শহর। শুনলাম, নতুন ধরনের চায়ের চাষ করার ব্যাপারে এখানে সরকার থেকে গবেষণা চলছে। ভূতাত্ত্বিকরা এখানে মূল্যবান পাথর বেরাইলের সন্ধান পেয়েছেন। জহরৎ হিসেবে যা যথেষ্ট মূল্যবান।

আছে। অফুরন্ত ভূতাত্ত্বিক সম্ভার লুকিয়ে আছে স্থবনসিরির এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে, মিঃ কর। ওদের সন্ধান পেলে এই অঞ্চল অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে একেবারে সোনা হয়ে দাঁড়াবে। মন্তব্য করলেন ডঃ ত্রিপাঠী।

শুধু কি ভূতাত্ত্বিক সম্পদ? এদিকের অরণ্য সম্পদও কি কম কিছু? সারা অরুণাচল জুড়ে বাঁশের বন। কলা। আছে বার্চ, ফার, নীল পাইন, আরও নানারকম পাইন গাছ, সুঙ্গা। আরও নানারকম মূল্যবান উদ্ভিদ সম্পদ। সারা অরুণাচল থেকে বছরে এখন সংগ্রহ

করা হচ্ছে এককোটি ষাট লক্ষ ঘন ফুটের মত কাঠ। সংগ্রহের পরিমাণ আরও বাড়ানর চেষ্টা চলছে।

মুশকিল এই, নষ্টও হচ্ছে প্রচুর গাছপালা। বললেন জনৈক কর্মী। জ্বালানির জন্যে বনকে বন উজাড় করে দিচ্ছে খণ্ড জাতিরা। বাইরে থেকেও লোক আসে। একদল চুরি করেও সাবাড় করে দিচ্ছে মূল্যবান গাছপালা। তারপর ঝুম চাষ তো আছেই। বন সম্পদ রক্ষার জন্যে আরও লোকজন দরকার। তাছাড়া, এ ব্যাপারে খণ্ড জাতির মধ্যেও একটা মানসিকতা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

আমরা চলেছি কিমিন থেকে জিরো যাওয়ার পথ ধরে। ইয়ারজালির পর কয়েক কিলোমিটার দূরে এক একটি পাহাড়ের মাথায় সাজান গ্রাম। নিশি সম্প্রদায়ের গ্রাম। একটা ছোট্ট গ্রামের মধ্যে ঢুকলাম আমরা। চার পাঁচটি বাড়ি। খড়ে ছাওয়া। কাঠের পাটাতনের ওপর ঘরগুলি দাঁড়িয়ে। গাড়ির শব্দে বাচ্চারা এসে পথের ধারে ভিড় করেছে।

অজিতবাবু বললেন, সুন্দর স্পট। এখান থেকে ছবি তুলব।

আমরা থামলাম।

আমাদের কিছু দূরে দাঁড়িয়েছিল একজন নিশি রমণী। কালো বেশে অপূর্ব দেখাচ্ছিল তাকে।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা মতলব এল। উদ্ধব বরদলৈ ছিলেন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে। তাঁকে বললাম, ইচ্ছে করছে, ওই মেয়েটির অন্দর মহল একবার দেখে নিই। কোন অসুবিধা আছে?

আমার প্রস্তাব শুনে উদ্ধববাবু মৃদু হাসলেন। তারপর যে বাড়িটির সামনে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল, সেদিকে চাইলেন একবার।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

অসুবিধে নেই। বললেন উদ্ধববাবু। ভূতাত্ত্বিকদের কথা এরা জানে। তাই আমাদের এরা ভয় পায় না। বেশ, চলুন। একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

উদ্ধববাবুর পেছন পেছন আমি এবং আরও কয়েকজন গুটি গুটি এগিয়ে গেলাম।

মাচার ওপর গুদামের মত ঘর। কাঠের সিঁড়ি। উদ্ধববাবু সেই সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অসমীয়া ভাষায় এবং মোলায়েম স্বরে ডাকলেন, কে আছ গো ভেতরে। আমরা কাছেরই লোকজন। ভয় নেই। এই তোমাদের ঘর বাড়ি দেখতে এলাম।

উদ্ধববাবু বললেন, সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষ, খণ্ড জাতিও, অসমীয়া ভাষা কিছুটা বুঝতে পারে।

দরজার কাছে সসঙ্কোচে এবং সলজ্জ ভঙ্গিমায় এসে দাঁড়াল একজন প্রবীণা রমণী।

উদ্ধববাবু তাকে নমস্কার করে বললেন, এই আমরা গো। সঙ্গে ভিন দেশী মানুষ আছে, বুঝলে? তোমাদের ঘর সংসার দেখতে চায় সে। বলেই আমাকে দেখিয়ে দিলেন তিনি।

আমিও মহিলাটিকে নমস্কার জানালাম।

এবার আমাদের সে ভেতরে আসতে বলল।

আমরা ভেতরে গেলাম।

নিরাড়ম্বর পরিবেশ। প্রায় ফুট তিরিশেক লম্বা ঘর। একপাশে কয়েকটি মাটির হাঁড়ি। ঘরের মাঝখানে একটি ধুনি জ্বলছে। ধুনিতে কাঠ এগিয়ে দিচ্ছে সেই মেয়েটি। প্রথমে যাকে দেখেছিলাম। তার সুন্দর মুখের ওপর আগুনের আভা পড়েছে ঠিকরে। সেই আভা তাকে যেন আরও রমণীয় করে তুলেছিল। আমাদের দেখেই সে মাথা

নত করে একমনে কাজ করতে লাগল। বছর পঁচিশ বয়েস।

প্রবীণা মহিলাটি বলল, আমার ছেলের বৌ।

উদ্ধববাবু বললেন, আমাদের সব দেখাও গো, তোমাদের সংসার।

এক একজন মানুষ আছেন, যাঁরা অনায়াসে অপরের সঙ্গে কত সহজেই না অন্তরঙ্গ হতে পারেন। তাঁদের সান্নিধ্যে মুহূর্তে আপন পরের ব্যবধান ঘুচে যায়। সম্পর্ক অনায়াস হয়। উদ্ধববাবু তেমনই একজন মানুষ।

পাহাড়ী মানুষ কি উচ্ছল হয় কম? হয়ত তাই। সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যতজন পাহাড়ী মানুষকে দেখেছি, মনে হয়েছে, বাইরের আচরণে তারা সমভূমির মানুষের চেয়ে অনেক বেশি শান্ত। সংযত।

প্রৌঢ়া মহিলাটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

কোন উচ্ছ্বাস নয়। তার কথায় অনবদ্য শান্ত সুর। একে একে নিজের সংসারটি ঘুরে ফিরে দেখাতে লাগল সে।

আগুনের ধুনির পাশে পড়েছিল একগাদা পাতা। আর তার পাশে বাঁশের তৈরি চাটাই-এর ওপর কতকটা কালো সরষের মত দেখতে কী যেন।

উদ্ধববাবু জেনে নিলেন ওটা কী। তারপর আমাকে বুঝিয়ে বললেন, ওই দানাগুলি হলো কোদো ফল। আর ওই পাতাগুলিকে বলে ওকো পাতা।

কোদো ফল দিয়ে কি কর তোমরা গো? প্রশ্ন করলেন উদ্ধববাবু।

প্রৌঢ়া বলল, রুটি বানাই। আর আপং।

হ্যাঁ, এই হল ওদের খাবার। রাই পাতা, ওকো পাতার সেদ্ধ। তার সঙ্গে যদি কোদো ফলের রুটি জোটে তো চমৎকার। কোদোর

দানার সঙ্গে ইস্ট মিশিয়ে ওরা তৈরি করে এক ধরনের মদ। এই মদ তাদের কাছে পানীয় বলতে পারেন। প্রচুর প্রোটিন থাকে এতে। কখনও কখনও বন্য পশু শিকার করে ওরা। তখন মাংস জোটে। তবে ইদানীং তাতেও ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।

স্ত্রী-পুত্র কন্যা। একই ঘরে সবার বাস। দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই সমর্থ পুরুষ এবং মেয়েরা দূরের কোন পাহাড়ে চলে যায় চাষ করতে। সেখানে সারাদিন আপং পান এবং চাষ করা। আর ঘরে থাকে যারা, সারাদিন তারা ব্যস্ত থাকে গৃহস্থলির কাজে। ঘরবাড়ি মেরামত, রুটি তৈরি, আপং তৈরি অথবা সেলাই। চিরা-চরিত এই জীবন ধারার সেখানে আজও যেন ছেদ নেই।

তবে পরিবর্তন আসছে। বললেন উদ্ধববাবু।—বাইরের লোকের আনাগোনা বাড়ছে। এক সময় নিজের গ্রাম ছেড়ে এরা বাইরে যেতো না। এখন কিছু কিছু তাও যাচ্ছে। পেছনে ইয়াচালি। সামনে এগোলেই হাফোলি। সেখানে দোকান বসেছে। শহর বসেছে। তাদের স্পর্শে এদের জীবনেও আসছে পরিবর্তন।

আসুক পরিবর্তন। কিন্তু নিশি পরিবারের সান্নিধ্যে জীবনের যে শান্ত দিকটা দেখে এলাম আধুনিক শহর মানুষকে কোনদিন কি তা দিতে পারবে?

নাগাল্যাণ্ডের পুকপুরে গিয়েও এই একই কথা আমার মনে হয়েছিল। সে অভিজ্ঞতা পরে বলব।

নিশি পরিবার থেকে বিদায় নিয়ে হাফোলি যেতে আমাদের আরও প্রায় এক ঘণ্টার মত লেগে গেল। মাঝে পড়ল জোরাম। কিমিন-জিরো পথের এটাই উচ্চতম অঞ্চল। উচ্চতা ৫৭৫৪ ফুট। জোরামের পর ডান দিকে বাঁক নিয়ে কিছুদূর এগোতেই হাফোলির

সীমানা। এই পথে আমাদের জীপ বেশ কিছুটা পথ নীচে নেমে এল। নেমে এল পাহাড় ঘেরা উপত্যকার পাশ বরাবর। উঁচু পাহাড়ের কোল থেকে দেখা গেল এক পাশে বিরাট উপত্যকায় ধানের ক্ষেত। ক্ষেতে ধান ছিল না তখন। ধান বোনার জন্য জমি তৈরি করা হচ্ছে। এখানে পথের ধারে অদ্ভুত এক ধরনের বাঁশ গাছ দেখলাম। সরু সরু পাতা। বাঁশগুলি লম্বায় খুব বড় নয়। ব্যাস দুই ইঞ্চির মত। সারিবদ্ধ কুঞ্জের মত পথের যে দিকটায় উপত্যকা সে দিকে দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম, ঘরের বেড়া দেওয়ার জন্যেই এই বাঁশ প্রধানত কাজে লাগান হয়।

আধুনিক ঘরবাড়ি। হাউসিং এস্টেট। ছোট ছোট শিল্প কেন্দ্র। এক পাশে পুলিস লাইন। কোর্ট কাছারি। আর এক পাশে দোকান পাট। পাহাড়ের সম্পূর্ণ আদিম পরিবেশ থেকে এ যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক জগৎ। কে বলবে, আমি পৃথিবীর আধুনিকতম একটি শহরে দাঁড়িয়ে নেই?

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, কেমন মালুম হচ্ছে বলুন? হাফোলি হচ্ছে সুবনসিরির ডিস্ট্রিক্ট হেড্ কোয়ার্টার্স।

অপূর্ব! এত কাছে এমন যে একটি মনোরম জায়গা থাকতে পারে, যেন ভাবাই যায় না। একেবারে টিপ টপ। পথের দু ধারে দোকান। সব কিছুই পাবেন সেখানে। জামা কাপড় থেকে ট্র্যানজিস্টার। ভাল স্কুল আছে। ছেলে মেয়েরা সাজসজ্জায় পাকা সাহেব।

একটি চায়ের দোকানে একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হলো। দারুণ স্মার্ট। মিশনারি ইস্কুলে পড়ে। আপাতানি ট্রাইব। বলল, ফাদার বলেছে, স্কুল পাস করার পর সে কলকাতায় গিয়ে পড়বে।

পথে মার্কেটিং করতে বেরিয়েছে মেয়েরা। বেশির ভাগই বিদেশী পোশাক। চেহারায় অপূর্ব কমনীয়তা। শুধু নাকের দু পাশে কালো গহনার মত উল্কি। অনেকের থুতনিও ওই ভাবে গহনা করা হয়েছে।

জনৈক আপাতানি বলল, আগে উল্কি মাখিয়ে মেয়েদের মুখের রূপ নষ্ট করে দেয়া হতো। সবটাই যে ডেকরেশন, তা নয়। বাইরে থেকে অনেকে আমাদের মেয়ে লুঠতে আসত তো তাই এই ব্যবস্থা। এখন এই প্রথাটি আমরা বন্ধ করার চেষ্টা করছি। বন্ধ হয়েওছে অনেকটা।

পথ দিয়ে আসছিলেন জনৈকা মহিলা। বললাম, আপনার ছবি তুলব।

দারুণ স্মার্ট। আমার কথায় মুচকি হেসে তিনি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অজিতবাবুর ক্যামেরায় ক্লিক।

ছবি তোলার পর দু চারটি কথাও বললাম তাঁর সঙ্গে। ইংরেজি জানেন। তাই অসুবিধা হলো না। বললেন, বেড়াতে এসেছেন? থেকে যান কয়েক দিন। জায়গাটা আপনার ভাল লাগবে।

কথায় কোন ভণিতা নেই। কোন জড়তা নেই। মনে হলো, এমন অদ্ভুত সাবলীলতা যাঁদের, জীবন সংগ্রামে তাঁরা তো অনেকটা পথই এগিয়ে গেছেন। আধুনিকতা মানে যে চিরায়ত মানবিক গুণগুলি হারিয়ে ফেলা নয়, ওঁদের সঙ্গে কথা না বললে, ওঁদের ব্যবহারিক জীবন না দেখলে, সেটা বুঝে ওঠা শক্ত।

এগারো

হাফোলিতে এক চায়ের দোকানে পরিচয় হয়েছিল জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে। বছর পঞ্চাশ বয়েস। বাড়ি কলকাতায়। আত্মীয় পরিজন সব কলকাতাতেই থাকেন। কম বয়েসে ঘর ছেড়ে চলে আসেন। প্রথমে আসামে। মানে খোদ গৌহাটি, তারপর নর্থ লখীমপুর। বিয়ে থা করেননি। কাপড়ের হোল সেলার।

ভদ্রলোক বললেন, মশায়, এই যে হাপোলি দেখছেন না, একেবারে যাকে বলে স্বর্গ। ব্যবসা করুন। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাবেন। আবার ফুর্তি করতে চান, একেবারে শরিফ জায়গা।

মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, জায়গাটার সত্যিকারের নাম কী, বলুন তো? হাফোলি, না হাপোলি?

হঠাৎ নাম নিয়ে অত মাথা ব্যথা কেন, বলুন তো? এসব পাহাড়ী অঞ্চলে নামে কী আসে যায়! কেউ বলে হাফোলি আবার কেউ বলে হাপোলি। কেউ কেউ হ্যাপি ভ্যালিও বলে। মশায়, করি কাপড়ের কারবার। লখীমপুরে গদি আছে। দেশের সেরা সেরা কাপড় এনে সেখানে জমাই। তারপর নিয়ে আসি এই হাপোলিতে। নিয়ে যাই আলং, দলাই, কাবু, তিরোপের নামচিক, নামফুজ, নামসাং, কামেং-এক ডেডজা, রূপা, টেংগায়, অথবা লোহিতের লালপানি, তেজু। মশায় এদিকে বিজনেস ভাল। ওই যে আপাতালি মেয়েটা দেখলেন না, ছবি তুললেন যার—তার সাজ পোশাক দেখলেন

তো। বাইরে থেকে কিছু বুঝবেন না। থাকে হয়ত ওই দূরে পাহাড়ী গ্রামে। খড়ো ঘর। সাদামাটা চালচলন। কিন্তু শহরে আসবে যখন, একেবারে মেমসাহেব। আর ছোকরাগুলো? একেবারে পাকা আমেরিকান। ওদের পা থেকে মাথা অব্দি সব ইম্পোরটেড। আর ব্যবসাও কম বোঝে না ওরা। ওই যে আপাতালি ছোকরাগুলি দেখছেন না, চায়ের টেবিলে গোল হয়ে বসে কেমন আড্ডা দিচ্ছে? আড্ডা নয়, মশায়। সব ব্যবসার কথা। সুবনসিরির এই আপাতালিরা খুব চালাক। মিশনারিদের কৃপায় লেখা-পড়াও শিখেছে। কেতা-দুরস্তে মিজোদের সঙ্গে ওদের অনেকটা মিল।

তা না হয় হলো। কিন্তু আপনি ওই যে ব্যবসার কথা বললেন, মার্কেট তো ওই উপজাতিদের নিয়ে তাই তো? তা যদি হয়, অত পয়সা আসে ওদের কোত্থেকে?

জানি না, মশায়। কপাল ঠুকে বছর পনের আগে প্রথম যখন এদিকে আসি, আমার মনেও ওই একই প্রশ্ন জেগেছিল তখন। সেই চীনের যুদ্ধের পর আর কি। কেউ বলে, মিশনারিরা ওদের তখন নাকি টাকা পয়সা, কাপড় চোপড় দিয়ে সাহায্য করত। চীন থেকেও প্রচুর রসদ আসত ওদের জন্যে। এখনও আসে। তিব্বতের ভেতর দিয়ে চোরা পথে। বাইরে থেকে বোঝার জো আছে? প্লেইনের লোকেদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে এরা দারুণ রিজারভড। শহরের দিকে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যান, দেখবেন, রাজত্ব কাকে বলে। সব নিজের নিজের আইনে চলেছে। বিয়ে থা থেকে সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা, অসামাজিক কাজ, সব কিছু।

ভদ্রলোক বললেন, শহরে খুব একটা ঝামেলা নেই। তবে শহরের বাইরে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। বাইরের লোককে ওরা

বিশ্বাসই করে না। বিশেষ করে মিলিটারি উর্দিপরা কেউ হলে। তবে আমাদের এখন আর কোন অসুবিধে হয় না। ওদের চালচলন বুঝি। আর সব চাইতে মজা, একবার যদি ওদের বিশ্বাসভাজন হতে পারেন তো সব মিটে গেল। আপনি তখন ওদের নিজের মানুষ। ওদের সঙ্গে আপং খান। ফুর্তি করুন।

তা হলে তো বেশ ভালই আছেন। আমার মন্তব্য।

তা ভাল আছি। আপনাদের কলকাতা থেকে অনেক ভাল আছি বলতে পারেন। নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা না করে এখানে অনেক ভদ্রভাবে বেঁচে থাকা যায়। আপনাকে আমি বলছে, মশায়, পাল্টাচ্ছে। অনেক দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে এখানকার জীবনযাত্রা। সেই অন্ধকারের দিন আর নেই। সরকার থেকে যে সব স্কিম নেওয়া হয়েছে, যদি ঠিক মত তারা চলে, আপনাকে আমি বলে দিতে পারি, আগামী দশ বছরের মধ্যে এরা আপনাদেরও টেক্কা দিতে পারবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে তো বটেই। শিক্ষাতেও। এদের মস্ত বড় একটা গুণ, এরা ভিক্ষা করতে জানে না। এমন একটা গুণ যাদের সুযোগ পেলে তারা না দাঁড়িয়ে পারে?

ভদ্রলোকের কথায় অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, কী প্রচণ্ড আত্ম-বিশ্বাস!

কিন্তু সমস্যাও কি বড় কম? অরুণাচলের পার্বত্য এলাকায় কত রকম উপজাতিরই না বাস। কামেং সীমান্ত অঞ্চলে আছে মোনপা, সেরডুকপেন, খাওয়া, মিজু এবং আকা। সুবনসিরিতে আছে ডাফলা এবং আপাতানি। আবোর পার্বত্য অঞ্চলে পদম, মিনইয়ং, গালোং, বোকার, বোরি, পালিলিবো, টাগিং এবং মোনপা। আর তিরাপে গেলে দেখতে পাবেন মিজু দিগারু, পদম, খামাতি, সিংঘপো, কাচিন,

টাংসা ওয়ানচো, হাওয়া এবং লোকতে। এক একটি ট্রাইবের'আছে নিজস্ব লোকাচার, সামাজিকতা এবং জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধ। আছে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মিশনারিদের কৃপায় যথেষ্ট ক্রীশ্চান। কতকাল আগে অরুণাচলের গহন অরণ্যে তারা বসতি স্থাপন করেছিল সে প্রশ্নের উত্তর নৃবিজ্ঞানীরাই দিতে পারেন। সেটা তাঁদের গবেষণার ব্যাপার। আর লোককথা যা, সেটা বিশ্বাস। ট্রাইবদের মধ্যে সেই বিশ্বাসে এখনও চিড় ধরেনি।

আমাদের কিছু দূরে এক পাশে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিল একজন। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। রঙীন পোশাক। মাথায় টুপি। কোমরে দা'য়ের মত একটি অস্ত্র। তার তামাটে মুখ দেখে কত তার বয়েস বলা কঠিন। কপালে গভীর বলি রেখা। সারা মুখে পাথরের প্রশস্তি! আর কী সাংঘাতিক ছুটি চোখ! মনে হলো, সে চোখ মনের গভীরতম অঞ্চল মুহূর্তে নিরিখ কবে নিতে পারে।

ব্যবসায়ী সেই ভদ্রলোকটি বললেন, পদম। কোন গ্রামের মোড়ল হবে মনে হয়। কেমন শক্ত চেহারা দেখেছেন? কত বয়েস বলুন দেখি?

বললাম, এর আগে অনেক ঠকেছি, মশায়। মুখ দেখে এই পাহাড়ীদের বয়েস বলা শক্ত। কত বয়েস হতে পারে আপনিই বলুন না?

কম করেও আশি।

বলেন কী? আশি মানে তো খুনখুনে বুড়ো? কিন্তু এর যা চেহারা দেখছি—

না, না। চেহারা দেখে ধরতে পারবেন না। আমাদের মত চট্ করে এদের মনটা বুড়িয়ে যায় না কিনা, তাই যৌবন এদের ছাড়তে

চায় না। আসুন, এর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।

বলেই ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে লোকটির চেয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রথমে মাথা নত করে নমস্কার করলেন, তারপর আদি ভাষায় কী যেন বললেন তাকে।

লোকটি আমার দিকে চাইল। যেন পাথরের দৃষ্টি। এমন ভাবলেশহীন দৃষ্টি আমি জীবনে কখনও দেখিনি। একবার ঘাড় নোওয়ালো। তারপর শেষ চুমুক দিয়ে হাতের কাপটি টেবিলের এক কোণে সরিয়ে রাখলো।

ভদ্রলোক বললেন, বসুন।

আমি সন্তর্পণে তাঁর পাশের চেয়ারটিতে বসলাম।

আর এক কাপ করে চা হোক। খানিকটা সম্মতি আদায়ের জন্যেই তিনি চাইলেন লোকটির দিকে।

লোকটি ইঙ্গিতে সম্মতি জানালো।

তিন কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে ভদ্রলোক আদি ভাষায় কথাবার্তা শুরু করলেন তার সঙ্গে। বুঝলাম, আমার পরিচয় দিচ্ছেন তিনি।

তার পাথরের ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসির রেখা। কি যেন বলল সে ভদ্রলোককে। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, পদম বলছে, এভাবে তো দেশ দেখা হয় না। বরং আমার সঙ্গে আমাদের গাঁয়ে চলুন। দিন দুই কাটিয়ে যান সেখানে। তবে তো সব মালুম হবে।

প্রথম পরিচয়েই একেবারে নিমন্ত্রণ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, মশায় নিমন্ত্রণ। বিশ্বাস, বুঝলেন কী না, বিশ্বাস। আগন্তুককে প্রথম দিকে এরা সন্দেহের চোখেই দেখে। কিন্তু ওই যে, একবার যদি বিশ্বাসভাজন হতে পারেন এরা জান দিতে প্রস্তুত আপনার জন্যে। বুঝছি, আপনাকে ভাল লেগেছে ওর। একবার

যান ওর সঙ্গে, দেখবেন আতিথেয়তার জ্বালায় কেমন প্রাণান্তকর অবস্থা হয়। বললেন সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক।

বিব্রত বোধ করলাম আমি। বললাম, এ যাত্রায় সে সৌভাগ্য আর হলো কই? ওকে বুঝিয়ে বলুন আমার অবস্থাটা।

জানি, জানি। সেটা সম্ভব নয়। আর হুট করে যাওয়া বললেই কি যাওয়া যায়। বাড়ি যেখানে বলছে, সে তো দুই দিনের পথ। মানে জিরো পেরিয়ে ডাপারিজো। সেটুকু তবু গাড়িতে যাওয়া চলে। তারপর বনের মধ্যে চড়াই উৎড়াই ধরে হাঁটুন।

ভদ্রলোক আদি ভাষায় আমার পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বললেন তাকে। তাঁর কথা শুনে লোকটি অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল।

দারুণ টাচি, মশায়, দারুণ টাচি। এরা যা মনে করে, সেটা না হলে মুহূর্তে বড় স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। একেবারে ছেলেমানুষের মত স্পর্শকাতর। দেখলেন, মুখখানা কেমন গোমড়া করে ফেলল?

না। বেশি কথা হয়নি। সমতলভূমি মানুষের সঙ্গে এমনিতেই এরা কথা বলে কম। নিমন্ত্রণ যখন রাখতে পারলাম না, তখন এক্ষেত্রে কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না।

তবে হ্যাঁ, আমাদের ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটিকে বাহাদুর বলতে হবে। আদিদের কী করে মানভঞ্জন করতে হয় সে সব কায়দা কানুন তিনি জানেন। আমাকে কী করতে হবে এখন, কানের কাছে ফিস ফিস করে সে কথাও জানিয়ে দিলেন তিনি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেলাম। কিছু দূরেই ছিল সিগারেটের দোকান। তড়িঘড়ি সেখান থেকে প্যাকেট পাঁচেক চারমিনার কিনে নিয়ে এসে হাজির হলাম চায়ের দোকানে।

ভদ্রলোক ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে চারমিনারের প্যাকেট-

গুলি নিয়ে পদমটির দিকে এগিয়ে দিলেন। এবং বিনয়ের হাসি হেসে আমাকে দেখিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে আলাপ করে আমার বন্ধুটি দারুণ খুশী। তোমার জন্যে এই যৎসামান্য উপহার।

সিগারেটের প্যাকেটগুলি পেয়ে প্রচণ্ড খুশী হয়ে উঠল সে। কঠিন পাথরের মধ্যে থেকে যেন বেরিয়ে এল একটি সজীব সত্তা। সবাক।

চা এল। চায়ের সঙ্গে শুরু হলো এবার গল্প। গল্প মানে তার গ্রামের কথা। কোন কালে তাদের পূর্বপুরুষ ছিল তিব্বতে। সেখানে ঝগড়া বাঁধল নিজেদের মধ্যে। তারপর নিরাপত্তার জন্যে সিয়াং নদীর পাড় বেয়ে একদিন তারা চলে এলো অরুণাচলের পার্বত্য আশ্রয়ে। গল্প মানে তাদের জীবনের কথা। চাষ-আবাদ। মিথুন। ভূত প্রেত কী করে সায়েস্তা করতে হয়, মৃত্যুর করাল স্পর্শ থেকে গ্রামবাসীকে কীভাবে রক্ষা করতে হয়—অনেক—অনেক অলীক কাহিনী। অলীক! আমাদের কাছে। ওদের কাছে এসব বিশ্বাস। ওদের কাছে জীবন মানেই তো এইসব। হাফেলি থেকে ইয়ারজালি ফেরার পথে সেই বৃদ্ধ পদমটির কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, কী সরল-ভাবেই না সিগারেটের প্যাকেটগুলি তুলে নিয়েছিল সে। যখন নিজের কথা বলছিল, অথবা তার গ্রামবাসীর কথা, কই, একবারের জন্যেও তো সে বলল না, তার জীবনে কোন বঞ্চনা আছে? অথবা কোন সমস্যা? অথচ তার প্রতিটি কথায় আত্মপ্রত্যয়। যেন, যা পেয়েছি, তার ওপর আবার কী চাই? মনে হলো, শহরের ইঁট পাথরের মধ্যে থেকে আমাদের যে মনটির জন্ম, তা দিয়ে প্রকৃতির কাছাকাছি ওই মানব শিশুদের মূল্যায়ণ করা কোনদিনই সম্ভব নয়। কিছু স্থূল সমস্যা ওদের অবশ্য আছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আহার এবং আশ্রয়ের সমস্যা। এসব সমস্যার সমাধানের জন্যে সরকারও অবশ্য নিরলস প্রয়াস

চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জীবন মানে তো টাকা পয়সা শুধু নয়। বাহারি জামাকাপড় বা তথাকথিত বৈভবও নয়। পরিতৃপ্ত জীবনের জন্যে যে মূল্যবোধের প্রয়োজন, সেটা বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে বেঁচে থাকা বলে কি ?

পথ চলতে চলতে এই প্রসঙ্গ নিয়েই কথা বলছিলাম ডঃ ত্রিপাঠীর সঙ্গে।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, কর মশায়, একটি পদম দেখেই আপনার এই কথা। আর আমরা তো বছরের পর বছর দেখে আসছি শ'য়ে শ'য়ে পদম, মিশমি, মিজু, মোনপা, আরও কতরকম ট্রাইব। আমরা ওদের ভয় পাই না। এই তো সেবার সিয়াং-এ গিয়ে আমাদের জিওলজিস্টরা ওদের মোশুপ্-এ বাস করে এলো। জানেন বোধহয়, ট্রাইবদের মধ্যে দু রকম ডরমিটারি আছে। মোশুপ্ এবং রাশেং। বিরাট চালাঘর সব। প্রথমটি আইবুড়ো ছেলেদের জন্যে। দ্বিতীয়টিতে বাস করে গ্রামের আইবুড়ো মেয়েরা। এই ডরমিটারিতে একত্রে বাস করার সময় ছেলেমেয়েরা সংসারের সব হাল পত্তর শিখে নেয়। একবার যদি গ্রামবাসীদের আপনি আপন হতে পারেন, আর কোন ভয় নেই, বলুন, ওদের সাহায্যে না পেলে অরুণাচলের এসব দুর্গম এলাকায় কোনদিন জিওলজি হতো, মশায় ?

জানি না, হতো কী না। হলেও সে কাজ যে সহজসাধ্য হত না, সে কথা না বললেও চলে।

সুবনসিরির কথা আগে বলেছি। তারপর ধরুন সিয়াং অঞ্চল। সিয়াং নদীর নামে যার নাম। পশিঘাট এক সময় যার হেডকোয়ার্টার্স ছিল। এখন আলং। পশ্চিমে উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর শিবালিক পর্বতমালার সানুদেশ। অবশেষে পাহাড় যার সমতলে

পরিণত হয়েছে সিয়াং নদীর পুব দিকে এসে। সিয়ম নদীর দক্ষিণে দেখতে পাবেন হিমালয়ের নিম্নাঞ্চল। তার অস্তিত্ব ধরা পড়বে আলং উপত্যকায় এবং সিয়াং উপত্যকার ওপরের অংশে। আছে অজস্র পার্বত্য নদী। সমতল থেকে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যান। তাপমাত্রা কমবে। শীত। ক্রমে আরও শীত।

ডঃ ত্রিপাঠী বললেন, সিয়াং জেলার দক্ষিণ দিক বরাবর যান। দেখবেন পাললিক শিলা। মানে বেলে পাথর, শেল, ক্লে এই সব। মাঝে মাঝে গনডোয়ানা এবং টারসিয়ারি যুগের কয়লাও চোখে পড়বে আপনার। গনডোয়ানা মানে পনের থেকে তিরিশ কোটি বছর পুরনো। আর টারশিয়ারি মানে এক কোটি থেকে সত্তর লক্ষ বছরের মধ্যে।

পাওয়া গেছে। অনেক কিছুই পাওয়া গেছে এই সিয়াং জেলায়। বামে থেকে সাঁইত্রিশ কিলোমিটার দূরে তাই গ্রাম। এখানে সন্ধান মিলেছে গ্র্যাফাইটের। আলং থেকে পাং সিং যাওয়ার পথে তারক থেকে পাং সিং-এর মধ্যে পাবেন ডোলোমাইট। সিয়ম উপত্যকার ওপর দিকে ডাপু, লিপুসি এবং মেচুকায় জিওলজিক্যাল সার্ভে খুঁজে পেয়েছেন ভাল মার্বেল পাথর। দলাই এবং কাবুতে পাওয়া গেছে প্রায় সাড়ে বাইশ কোটি টনের মত চুনা পাথর। সন্ধান মিলেছে তামা, দস্তা, লোহার।

অরুণাচল হলো জিওলজিস্টদের মক্কা। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ডঃ ত্রিপাঠী।—এখানকার অনেক কিছু এখনও পর্যন্ত তো জানতেই পারিনি আমরা। পথের দু পাশে বন জঙ্গল দেখছেন তো? রাস্তা কোথায় যে, পাথর খুঁজতে যাবেন? ট্রাইব আমাদের কাছে কোন সমস্যা নয়, মিঃ কর। সমস্যা হলো পথঘাট। কম্যুনিকেশন। এখানে

এমন জায়গা আছে, যেখানে গেলে তো আপনি বেপাত্তা। যতক্ষণ না ফিরে আসছেন, আমরা বলতেই পারব না, আপনি আছেন, কি গেছেন।

আপার আসামের সমভূমি। তার দক্ষিণে পাহাড়ী রাজত্ব। উত্তর-পূর্ব বরাবর এগিয়ে গিয়ে মিশেছে নাগা পর্বতমালার সঙ্গে। উত্তর-পূর্বে লোহিত। উত্তরের পাহাড় সবচেয়ে উঁচু। দুই হাজার মিটার পর্যন্ত। পাশে তিরাপ জেলা। তিরাপের পূর্বাঞ্চল থেকে নেমে এসে উত্তর-পশ্চিম বরাবর বয়ে চলেছে তিরাপ, নামচিক এবং নামফুক বা বুড়িডিহিং নদী। আজ দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে ডিরাক, লামসাং এবং তিসা। এখানে তিন শ' ষাট কোটি বছর পুরনো পরিবর্তিত শিলাও যেমন দেখতে পাবেন, সেই সঙ্গে দেখতে পাবেন সাত কোটি বছরের পুরনো পাললিক স্তর। নামচিক-নামফুক এবং মাইওবুমে আছে অঢেল কয়লা। পাটকই পর্বতমালায় তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস, ভোগাপানি এবং খোলসায় পিরাইট এবং পাইরোটাইট। বুড়িডিহিং-এর বালিতে সোনা পাওয়ার প্রবাদও প্রচলিত কাহিনী। তবে ভূতাত্ত্বিকদের যা অবাক করেছে, তা হলো, বড়হুরিয়া, খোলসা এবং নামসাং-এর চারপাশের অজস্র প্রস্রবণ এবং কুয়ো। যাদের জল অত্যন্ত লবণাক্ত। এই জল বাষ্পীভূত করেই ওই সব অঞ্চলের আদিবাসীরা আবহমান কাল ধরে নুন তৈরি করে আসছে। এক সময় এই অঞ্চলটি হয়ত সমুদ্র অধ্যুষিত ছিল।

চলুন লোহিতে। অরুণাচলের এটাই বৃহত্তম জেলা। এর দক্ষিণে তিরাপ, পশ্চিমে সিয়াং এবং উত্তর ও পুবে চীন। জেলা শহর তেজু। হিমালয়ের একটি বড় অংশ এই অঞ্চলে অবস্থিত। ৫৫০০ মিটার উঁচু পাহাড়ের চূড়াও আপনি দেখতে পাবেন এখানে। দেখতে পাবেন

লোহিত এবং ডিবং নদী। নেমে আসছে হিমালয়ের ওপর থেকে। এছাড়া দেখবেন, হিমালয়ের ডাফা পর্বতমালা থেকে নেমে আসছে কামলাং নদী। প্রায় তিন হাজার মিটার ওপরে দেখবেন কয়েকটি হ্রদও।

লোহিতে পাওয়া গেছে অ্যাসবেসটস। তেজু-হায়ানলিয়াং পথের ওপর। এবং ডিবং উপত্যকার উত্তরে রোয়িং-হুমলি পথের পাশে পাওয়া গেছে গ্র্যাফাইট। তেজু থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে লালপারিতে। তেজু থেকে পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দূরে টিডিং-এ পাওয়া গেছে সিমেণ্ট তৈরি করার মত প্রচুর চুনা পাথর। মার্বেল পাথর, ম্যাগনেশিয়া, ইত্যাদি।

তুলনায় কামেং জেলার ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস অনেকটা জানা। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বর্তমান শতাব্দীর সত্তর দশক পর্যন্ত অরুণাচলের পশ্চিম প্রান্তের এই জেলাটির বেশির ভাগ জায়গায় ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান সংস্থা ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন। এখানে সন্ধান মিলেছে তিন শ' কোটি বছর পুরনো পরিবর্তিত শিলার অস্তিত্ব। সেই সঙ্গে কয়েক লক্ষ বছর পুরনো গনডোয়ানা ভূস্তর, অথবা সত্তর লক্ষ বছর পুরনো টারশিয়ারি যুগের শিলাস্তূপ। পাওয়া গেছে কয়লা, তামা, সিসে, কোয়ার্টজাইট, ডোলোমাইট, মার্বেল এবং চুনা পাথর।

শম্ভু সেন বলেছিলেন, দারুণ, মশায়। দারুণ, ব্যাপার। জিরো পয়েণ্ট থেকে যে জিরো-সেপলা রোড গেছে সে পথের ৮৮ কিলো-মিটার স্টোনের কাছে গেলেই দেখতে পাবেন ব্যাপারটা। একেবারে তামা। আমরা এখনও অনুসন্ধান চালাচ্ছি। আমাদের ধারণা বেশ ভালরকম তামাই পাওয়া যাবে এখান থেকে। সে তামার দামটা

একবার ভাবুন।

আশার কথা সন্দেহ নেই। ভাবছিলাম, এইসব প্রাকৃতির সম্পদ যেদিন উন্মীলিত হবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অরুণাচলের মানুষ অনেক সমৃদ্ধ হবে হয়ত। কিন্তু কবে আসবে সেদিন? অরুণাচলের মানুষ কি জানেন প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে কত বেশি সমৃদ্ধ তাঁরা? আমি জানি বেশির ভাগ মানুষই ওসব খবর রাখেন না। রাজনীতির নামে স্বাধীনতার পর থেকে গুটিকয় মানুষের মধ্যে সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, দলীয় দ্বন্দ্ব যেভাবে চলছে, এ ধরনের সংগঠনশীল ভাবনাচিন্তা জন-সাধারণের মনে প্রোথিত করা তাতে করে কখনই সম্ভব হয় না। আর সম্ভব যদি না হয়, জনকল্যাণ তো ফানুস!

ইয়ারজালির কাছে জিওলজিক্যাল সার্ভের বেস ক্যাম্পে পৌছতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। সেই সঙ্গে আকাশও বেশ থমথমে হয়ে এসেছে।

আমরা হাজির হতেই ক্যাম্প থেকে হই হই করে বেরিয়ে এলেন এম কে অগ্রবাল, মিঃ হোসেন এবং কে ভি মোহন। অগ্রবালের পেছনে পেছনে এলেন তাঁর স্ত্রী। ভদ্রমহিলাও ভূতত্ত্বের ছাত্রী। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই বয়েস কম।

বরদোলৈ সাহেব ছিলেন আমার পাশেই। তাঁর কানে ফিস ফিস করে বললাম, পথের ক্লান্তি দূর হলো এতক্ষণে।

কেন বলুন তো! বরদোলৈ সাহেবের কণ্ঠে বিস্ময়!

বুঝবেন না, সুন্দর মুখ। এতক্ষণ পাথর আর বন জঙ্গল দেখে দেখে লাইফ হেল।—

আমার কথায় হো হো করে হেসে উঠলেন উদ্ধবকৃষ্ণ বরদোলৈ। একেবারে প্রাণখোলা, উদাত্ত হাসি সবাইকে শুনিয়ে আমার

কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন।

আর এক চোট হাসির দমক।

এবার কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমি বললাম, হাস্নুন, আপত্তি নেই। তবে আমি একটি সত্যি কথা বলেছি। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে একটি রমণী-মুখ কত প্রশান্তির অগ্রবাল সাহেব নিশ্চয় তা বুঝতে পারছেন। তবে এ কয় দিনে বুঝেছি, এমন সৌভাগ্য কমজনের কপালেই লেখা থাকে।

রাইট্! পেছন থেকে শব্দ এলো। কথা বললেন মোহন।

মোহনের দিকে চোখ পড়তে ম্লান হাসি হাসলেন তিনি। বললেন, কেন 'রাইট' বললাম সে কথা আপনাকে পরে বলল, মিঃ কর।

মিসেস অগ্রবাল দেখলাম দারুণ স্মার্ট। আসামের মেয়ে। ভাল বাংলাও জানেন। বললেন, আমার তো জিওলজি ছিলো। তাই অশুবিধে হয় না। ও নানা রকম নমুনা আনে। আমি দেখি। দেখে আনন্দই পাই। কখনও কখনও লেখার ব্যাপারে ওকে সাহায্যও করি আমি।

শুধু জিওলজিই নয়। সংসারও যে গুছিয়ে করতে পারেন, তাঁর ক্যাম্পে তারও নমুনা দেখলাম। বন থেকে সংগ্রহ করেছেন মোটা বাঁশ, নানা রকম গাছের বাঁকা-তোবড়া ডাল। এ সব দিয়ে ভেতরটা সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছেন। ছোট ছোট ভূতাত্ত্বিক নমুনা দিয়ে তৈরি করেছেন কিউরিও।

ডঃ ত্রিপাঠী তাগাদা দিলেন, মিসেস অগ্রবাল, এবার আপনি তা হলে অতিথিদের পেটের ব্যবস্থা করুন। আমরা বরং একটু প্রোফে-শনাল কাজটি সেরে নিই। বলেই চাইলেন মিঃ অগ্রবালের দিকে।

অগ্রবাল বললেন, সব রেডি আছে। স্যাম্পেলগুলি আমি

আনিয়ে রেখেছি।

অগ্রবালের সঙ্গে আমরা ক্যাম্পের বাইরে এলাম। সেখানে দেখি একটি টেবিল। টেবিলের ওপর পর পর সাজানো রয়েছে একচল্লিশ কিলোমিটার ক্যাম্পের কাছে যে ড্রিলিং চলছে তার নমুনা। বেশির ভাগই বেস মেটাল। তামা, কোবল্ট, নিকেল, ইত্যাদি।

নমুনাগুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন ডঃ ত্রিপাঠী। মন্তব্য করলেন —আত্মগতভাবেই—লুক্‌স গুড্‌।

তৃপ্তি? হয়ত তাই। ভূতাত্ত্বিকদের জীবনে কষ্ট আছে অনেক। কিন্তু সে সব কষ্ট মুহূর্তে তাঁরা ভুলে যান। অনুসন্ধানের সাফল্য ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে যেন ছাপিয়ে যায় সব সময়।

ইয়ারজালির বেস ক্যাম্প থেকে কিমিন রোডের সেই একচল্লিশ কিলোমিটার ড্রিলিং ক্যাম্পেও সেই একই ব্যাপার! রাস্তা থেকে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে সুবনসিরি নদী। তার ওপর বেতের সেতু। এ বস্তুটি যে কী ভয়াবহ আমরা কল্পনাই করতে পারব না। পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সেটা দুলতে থাকে। এক সঙ্গে দুই তিন জনের বেশি পার হওয়ার নিয়মও নেই। সেতুর মাঝখানে এলে দুলুনি বাড়ে। তখন প্রায় পাঁচশ' ফুট নিচে নদীর দিকে চাইলে মনে হয়, মৃত্যু যেন পায়ের সামনে। এই সেতুর ওপর দিয়েই জিওলজিস্টরা সন্তর্পণে পারাপার করেন। ওপাড়ে আবার খাড়াই পাহাড়। এবার পায়ে হেঁটে ওঠো দেড় হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের ডগায়। সেখানে বসেছে ড্রিল। ড্রিল চলে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত। বেস মেটালের নমুনা সংগ্রহ চলে ততক্ষণে। দিনের শেষে আবার ফেরার পালা। হাতে তখন একটি করে থলে। থলে ভর্তি নমুনা। আর বেতের সেতুর নিচে মরণ ফাঁদ।

গরমপানিতে কপিলির বুকে যেখানে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে

কপিলির বুকে ইয়েল জলপ্রপাত

এই ক্যাম্পেই দেখা হলো জিওফিজিসিস্ট বিনয়চন্দ্র সাইকিয়া এবং তাঁর দুই সহকারী কল্যাণ সাহা এবং সুরেশ সিং-এর সঙ্গে।

বিনয়বাবু বয়েসে কিছুটা প্রবীণ। বললেন, এই দেখুন না। এই যে দেখছেন সছিদ্র পাত্র। এব মধ্যে আছে কপার সালফেটের দ্রবণ। আর সেই দ্রবণে ডোবানো আছে একটি করে তামার দণ্ড। একে আমরা বলি নন-পোলারাইজিং ইলেকট্রোড। এক সঙ্গে দু'টি করে পাত্র নিই আমরা। তারপর পাত্র দু'টি কোন জায়গার ভূস্তরের দু'টি স্থানে বসিয়ে ওই দুই জায়গার তড়িৎ বিভব মেপে চলি আমরা। এই তড়িৎ বিভব দেখে আমরা অনুমান করতে পারি কী ধরনের ধাতু সেখানে থাকতে পারে। কখনও কখনও কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে দু'টি ইস্পাতের দণ্ড পুঁতে দণ্ড দু'টি তার দিয়ে জুড়ে দিই এবং সেই তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট পাস করি। এতে ওই তারে কতটা রোধ বা রেজিট্যান্স ধরা পড়ল তা দেখেও ভূস্তরের ধাতু বা অধাতুর অস্তিত্ব ধরতে পারি আমরা। আরও নানারকম পদ্ধতিও এ ব্যাপারে আমরা কাজে লাগাচ্ছি।

প্রচণ্ড উৎসাহ ভদ্রলোকের। ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্যে এই বয়েসেও তিনি যে ধবনের কৃচ্ছ্রসাধন করে চলেছেন তাব যেন তুলনাই হয় না।

মোহন ঘুর ঘুর করছিল আমার পাশেই।

বললাম কিছু বলবেন, মিঃ মোহন?

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে যেন চ্যাঙদোলা করেই একান্তে সরিয়ে আনলেন মোহন। তারপর বললেন, আই অ্যাম ভেরি ভেরি হোম সিক্, মিঃ কর। আই লাভ মাই ওয়াইফ্।

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। তা হলে, এই হলো

মোহনের সেই টপ্ সিক্রেট কথা ?

অন্ধ্রের ছেলে। তা হোসেনও তো আলিগড় থেকে এসেছেন এখানে কাজ করতে। তাঁকে তো এতটা করুণ মনে হয়নি ?

কথাটার উল্লেখ করতেই মোহন বললেন, হি লিভ্স হিয়ার উইথ হিজ ওয়াইফ্ জাস্ট লাইক মিঃ আগরওয়াল।

তা আপনিও তো বউকে এখানে নিয়ে আসতে পারেন ? আমার প্রশ্ন।

কী করে আনবো ? আমার ছেলে আছে না ? দশ বছরের ছেলে। শিলং-এ তার মায়ের কাছে থেকে স্কুলে পড়ছে। তার মাকে নিয়ে এলে সে সেখানে থাকবে কী করে ?

তা অনেকেই তো এইভাবে চাকরী করে, মিঃ মোহন। একবার কল্পনা করুন। আপনি তবু আছেন মাটির ওপর। এখান থেকে শিলং এমন কোন দূরের পথ নয়। ইচ্ছে করলেই আপনি বউ ছেলেকে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। অথচ ধরুন তাদের কথা—জাহাজে যারা কাজ করে। বন্দর থেকে জাহাজ নোঙর তুলল তো, মাটি দূর অস্ত্। মাসের পর মাস শুধু জল আর জল। ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময় ফেরার পথ থাকে না। জলের ওপর প্রাণ হাতে করে জীবন কাটানো শুধু। তাদের চেয়ে আপনি কি ভাল নেই ? যাঁরা সেনা বিভাগে কাজ করেন, তাঁদের কথা ভাবুন।

বললাম বটে। আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। কথাগুলি তাঁর কাছে উপদেশের মতই শোনালো হয়ত। কিন্তু এছাড়া কীই বা আমি বলতে পারি ?

ক্যাম্প নাম্বার একচল্লিশ ছেড়ে যাত্রা করতে হয়েছিল সেই রাতেই। একেবারে সোজা তেজপুর।

ওরা চাইছিলেন, সে রাতটা আমরা ইয়ারজালিতেই থেকে যাই।

বাধ সাধলেন সমর চক্রবর্তী। বললেন, সেটা ঠিক হবে না। কারণ আগামী কাল সন্ধের মধ্যে যে করে হোক আমাদের ডিমাপুর পৌছতেই হবে। ফেরিতে ব্রহ্মপুত্র পার হতে হবে আবার। জীপের জন্যে অ্যাডভান্স বুকিংও করে রাখা হয়েছে।

আমি বললাম, তার মানে আবার প্রায় তিনশ' কিলোমিটার ড্রাইভ। এবং রাতে। কখন তেজপুর পৌছবো মনে করেন, ডঃ চক্রবর্তী?

তা রাত তিনটে তো হবেই। একেবারে দার্শনিকের মত উত্তর।

কিন্তু ড্রাইভারদের কথা একবার ভেবে দেখেছেন? সেই সকাল থেকেই তো ওরা স্টিয়ারিং-এর ওপর বসে?

সমর চক্রবর্তীর উত্তর দেবার আগেই কথা বলল জনৈক ড্রাইভার। ঠিক আছে, স্যার। আমরা আজ রাতেই যাবো। তেজপুর গিয়ে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করলেই চলবে।

ড্রাইভার ভদ্রলোকের কথায় অবাক হয়েছি। এত পরিশ্রমও মানুষ করতে পারে?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রোমাঞ্চও অনুভব করলাম।

নাগাল্যাণ্ড! এবার যাচ্ছি ফিজোর দেশে, নাগাল্যাণ্ড। শুনেছি, যেখানে পথের পাশে বন্দুকের নল উঁচিয়ে বিদ্রোহী নাগারা প্রহরা গোনে। তাদের আচার বিচিত্র। যাদের কাছে সমতলের মানুষ মানেই ইনডিয়ান। আর ইনডিয়ান মানেই বিদেশী।

সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

বার

কথায় বলে, যদি কখনও আপনার মধ্যে এতটুকু গুণ প্রকাশ পায়, দেখবেন, আপনার আত্মীয় পরিজন থেকে শুরু করে অনেক অজ্ঞাতকুলশীল প্রতিবেশী পর্যন্ত মুহূর্তে কেমন যেন বোবা হয়ে গেল। তখন আপনার নামটিও যেন দাঁতে কাটতে নেই। চলতি পথে, সামনে পড়লে তাদের ভাবটা এমন, আপনি যেন নেহাতই অপরিচিত জন। অথবা, তুমি আর এমন কী হে! আপনি যে তাদের তুলনায় অকিঞ্চিংকর, অলীক কল্পনায় ঠিক এমনই একটি ভাব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে অদ্ভুত এক আত্মতৃপ্তির মধ্যে তখন তারা ডুবতে শুরু করে। বিদ্বেষ? জানি না। তবে নিজেদের মানসিক দীনতাকে ভুলে থাকার এটাই তাদের কাছে একমাত্র অবলম্বন হয়ত।

ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, ব্যাপক অর্থেও কথাটা হয়ত সত্য।

কিমিল থেকে তেজপুরে এসে যখন পৌঁছলাম তখন রাত তিনটে। পথে প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং ঝড়। অরুণাচল গেস্ট হাউসে হাজির হওয়ার পর মনে হলো, আমরা বেশ বাড়াবাড়ি রকমের ঝক্কি নিয়েই পথ চলেছি। মাঝে-মাঝে দৈত্যের মত ট্রাক। তাদের তীব্র হেড লাইটে চোখ যেন ঝলসে যায়। পাশ কাটিয়ে আমাদের দু'টি জীপ ছুটছিল ঘণ্টায় প্রায় এক শ' কিলোমিটার বেগে।

আমাদের ড্রাইভার ছিলেন দাস। তাঁকে বললাম, এত জোরে

চালাচ্ছেন। দেখবেন, এদিক-সেদিক না চলে যাই।

দাস বললেন, উপায় নেই, স্যার। আকাশের অবস্থা খুব খারাপ। মনে হচ্ছে, ঝড় আসবে জোর। আরও বেশি বাদল নামবে। তার আগে তেজপুর শহরে না পৌঁছলে আমরা পথে আটকে পড়ব। তখন কোন আশ্রয় পাবেন না আপনারা।

কিন্তু এত করেও তেজপুর ঢোকার মুখেই আমাদের জীপের একটি টায়ার গেল ফেঁসে। মেরামত করতে লাগল ঘণ্টাখানিক সময়।

বলতে কী, সে রাতে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি কেউই আমরা ঘুমতে পারি নি। পরদিন সাতটা নাগাদ তলপি তলপা বেঁধে এলাম ভোমরা-গুড়ি ঘাট। তারপর আবার সেই ফেরি। আবার ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে শিলঘাট হয়ে যেতে হবে জাকলাবান্দা। সেখান থেকে ডিমাপুর।

ফেরিতে উঠে সমরজিৎ চক্রবর্তী এবং অজিতবাবু জীপের মধ্যেই বসে রইলেন। বসা মানে ঘুম। অস্বাভাবিক কিছু নয়। গত রাতটা তো প্রায় জেগেই কেটেছে আমাদের। ঘুম আমারও যে পাচ্ছিল না, সে কথা বলব না। তবু ব্রহ্মপুত্রকে আর একবার দেখে নেওয়ার লোভটি সামলাতে পারলাম না। গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ফেরির পেছনে রেলিং-এর পাশ বরাবর।

উজান বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ফেরি। গত রাত্রের বৃষ্টিতে ব্রহ্মপুত্রের জল কিছুটা বেড়েছে। সেই সঙ্গে স্রোতের বেগ। মাঝে মাঝে রাক্ষুসে ঘূর্ণি দেখলে বুক যেন শুকিয়ে যায়।

আমার অদূরে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ছেলে। একেবারে টকটকে ফরসা। বড় বড় চুল। টানা টানা চোখ। পুরোপুরি সাহেবী পোশাক। নিজেদের মধ্যেই কথায় মশগুল। আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন জনৈক ভদ্রলোক। কাপড়ের ব্যবসায়ী। কনফেকশনারিরও ব্যবসা

আছে কোহিমায়। এখন চলেছেন নওগাঁয়। ফেরিতে ওঠার মুখেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

ছেলেগুলিকে লক্ষ করে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় বাড়ি এদের?

আমাদের প্রশ্নে ভদ্রলোক ছেলেগুলিকে একবার দেখে নিয়ে কতকটা তাচ্ছিল্যের সুরেই যেন বললেন, চিনতে পারলেন না? এরা মিজো।

চমৎকার চেহারা, মশায়। আমার মন্তব্য।

হ্যাঁ, চেহারায় চমৎকার বটে। তবে চরিত্রে এক-একজন একেবারে, বিচ্ছু। ভদ্রলোকের উত্তর।

সে আবার কী? আমার প্রশ্ন।

মিজোরাম গেছেন কখনও?

না।

তা হলে ব্যাপারটা আপনার পক্ষে বোঝা শক্ত। মশায়, বলব কী আপনাকে। করি ব্যবসা। আমাকে প্রায়ই সেখানে যেতে হয় বলেই ওদের হালচাল আমার জানা হয়ে গেছে। আইজল যান। মিজোদের দেখবেন সব ফিট বাবু। ছেলেমেয়েদের কী সুন্দর চেহারা। বাইরের মানুষের সঙ্গে কথা বলবে ধীরে ধীরে। এক একটা কথা যেন মিছরির টুকরো। সাজ পোশাক? মশায়, জানি না, এত টাকা ওরা পায় কোত্থেকে। তবে পাকা ব্যবসায়ী সব। কিন্তু মুশকিল কী জানেন? সত্যি কথা কেউ বলবে না। নাগাড়ে একের পর এক মিথ্যে এমন ভাবে বলে যাবে, আপনি মিথ্যে বলে তাদের ধরতেই পারবেন না। এমন আর্ট মেরে বলবে, আপনার পক্ষে ধরা শক্ত! দেখে শুনে আমার কী মনে হয়েছে, জানেন? ওরা বোধহয় প্রতিজ্ঞা

করেই জন্মায়, সারা জীবন সদা মিথ্যা কথা বলিব।

আমার কথায় তাঁর মধ্যে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। বরং আরও একটু সিরিয়াস হলেন যেন। অদূরে নিজেদের মধ্যে মগ্ন ছেলেদের দেখে নিলেন একবার। তারপর বললেন, মিঃ কর, বলেছি না, আমরা ব্যবসা করি? আমাদের নানারকম লোক ঘাঁটতে হয়। তবু বলব, অমন মিথ্যে কথায় মন ভোলানো জাত ভারতে আর কোথাও আমি দেখি নি।

জানি না। এটা তাঁর একমাত্র নিজস্ব অভিজ্ঞতাই হয়ত। তবে সুবনসিরির এক জায়গায় জনৈক পি ডব্লু ডি কর্মীকে বলতে শুনেছি, ট্রাইবদের মধ্যে মিথ্যে কথা বলাটা নাকি একটি অভ্যেসের মত। ছল চাতুরী তাদের জীবনে কখনও কখনও আভরণ। ওরা মুখ দিয়ে শব্দ করে। শব্দ করে বনের পশুদের বিভ্রান্ত করে নিয়ে আসে নিজেদের নাগালের মধ্যে। অবশেষে হত্যা। শত্রুদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার সময়ও ওরা আশ্রয় নেয় ছলনার। চাতুরীর। অজ্ঞাতকুলশীল মানুষ ওদের কাছে আশঙ্কার। চট করে তাদের কখনও ওরা বিশ্বাস করতে চায় না। পথে তেমন কারোর দেখা পেলে মিথ্যে কথার ছলনায় তাকে ওরা নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে এনে তোলে। তারপর করে হত্যা।

হ্যাঁ। এ সব এখন অতীত কথা হয়ত। আগের তুলনায় এখন তারা অনেক সামাজিক। অনেক সভ্য। মুক্ত পৃথিবীর সঙ্গে দিন দিন তাদের সখ্যতা বাড়ছে। অজ্ঞাত মানুষ সম্পর্কে যে আশঙ্কা তাও দ্রুত কমে আসছে দিন দিন।

ভদ্রলোক বললেন, মশায়, আপনি নাগাল্যাণ্ড যাচ্ছেন, বললেন না? উঃ! এই নাগারা হলো গিয়ে আর এক চিজ। দিয়ে যাও, দিয়ে

যাও, আর দিয়ে যাও। আপনি শুধু দিয়েই যাবেন। আর ওরা শুধু নেবে। এমন ডিম্যাণ্ডিং জাত আমি লাইফ-এ দেখি নি। একেবারে ছেলেমানুষের মত বায়নাবাজ। তাতে অপরের যে অসুবিধে হচ্ছে সে কথা ওরা বুঝতেই চায় না। যান না, আপনি নিজেই দেখতে পাবেন, আমি সত্যি বলছি, কী না?

কী আর বলব। ভদ্রলোকের কথা বলার ধরন দেখে হাসিই পেলো। ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই হয়ত তাঁর মধ্যে এ ধরনের মনোভাব গড়ে উঠেছে। এক একটি জাতি সম্পর্কে অদ্ভুত অনাস্থা।

কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ বা জাতি সম্পর্কে এ ধরনের এক পেশে ধারণা শুধু এ দেশেই বা কেন, বিদেশেও কি নেই?

মনে পড়ে, বছর দশেক আগে। পিটস্‌বার্গের চ্যাথাম কলেজে আমাদের তখন ওরিয়েণ্টেশন প্রোগ্রাম চলছে। সেখানে এক ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে এক মার্কিন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। বয়স্ক ভদ্রলোক। বাড়ি বস্টোনে।

কথার মাঝে ভদ্রলোক হঠাৎ এক সময় আমায় জিজ্ঞেস করে বসলেন, ওরিয়েণ্টেশন প্রোগ্রাম তো তোমাদের দিন সাতেকের মধ্যেই শেষ হচ্ছে। তা এরপর পড়তে যাচ্ছ কোথায়?

বললাম, টেকসাসের রাজধানী অস্টিনে। টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে

আমার কথা শুনে ভদ্রলোকের ভ্রূ চোখ তো কপালে উঠল আমার কথা যেন তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না এমন একখানা ভাব নিয়ে তিনি বললেন, হে ভগবান। সে কী? এত জায়গা থাকতে শেষে কি না টেকসাস?

কেন বলুন তো? এবার আমার কণ্ঠেও বিস্ময়।

জানো না, টেকসানরা বড় দেমাকে জাত ?

না।

তাহলে শোনো। প্রথমত ওরা গায়ে পড়ে কারোর সঙ্গে কথা বলে না। দ্বিতীয়ত কথা যদিও বা বলে, তার নমুনাটা হবে এই রকম। ধরো, কেউ তোমার সঙ্গে কথা বললো। তুমি তাকে জিজ্ঞেস করলে, মশায়, আপনাদের এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক'টা প্রদেশ ? দেখবে, লোকটি তখন টেকসান সুলভ ঘাড় নাচিয়ে বলবে, কেন ? উনো-পঞ্চাশটি এবং একটি, সেটা হলো একক নক্ষত্রের দেশ টেকসাস। টেকসাসের নিজস্ব পতাকায় একটি নক্ষত্রই আঁকা থাকে। তার উত্তরটি শুনে তুমি হয়ত জিজ্ঞেস করলে, তা ওভাবে না বলে, বললেই তো পারতেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট পঞ্চাশটি প্রদেশ আছে ? তোমার কথা শুনে এবার দেখবে লোকটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবে, ও, নো। টেকসাস ইজ দ্য বিগেস্ট স্টেট, অলসো দ্য রিচেস্ট। উই হ্যাভ বিগ র‍্যাঞ্চ, বিগ কাউ, বিগ হর্স। এ কথার উত্তরে তুমি হয়ত বলে উঠলে, তা কেন ? আমি তো শুনেছি, আয়তনে আলাস্কাই সবচেয়ে বড়। তখন সে বলবে, ফরগেট ইট। দ্যাটস অল আইস। শুনলে, টেকসানদের নমুনা ? বড় টাকার গরম, ভাই, ওদের বড় টাকার গরম।

তাই ফেরিতে দাঁড়িয়ে আমার সতীর্থ যাত্রীটির মুখে মিজো এবং নাগাদের সম্পর্কে টীকাসহ নানারকম মন্তব্য শুনছিলাম, তখন মোটেই অবাক হই নি। মানুষ একে অপরের ব্যাপারে এ রকমটি নানাভাবে ভাবে। সে ভাবনার উৎস কখনও তিক্ত কোন অভিজ্ঞতা। কখনও নিজের অক্ষমতা অথবা অজ্ঞতা হেতু হীনমন্যতা। বিশেষ কোন মানুষ অথবা কোন জাতি সম্পর্কে অবশেষে সেই ভাবনা কখনও কখনও ভুল

প্রবাদের মত পাঁচ জনের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। আর কোন কথা যখন প্রবাদে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন তার সত্যাসত্য নিয়ে মাথা ঘামায় ক'জন?

আবার শিলঘাট। ফেরি শিলঘাটে গিয়ে নোঙর করল পৌনে দশটা নাগাদ। ফেরি থেকে জীপ খালাস করতে গেল আরও আধ ঘণ্টার মত সময়। ফেরার পথে ভিড় ছিল আরও বেশি।

সমরজিৎ চক্রবর্তী বললেন, বুঝলেন না, বিহু উৎসবের পর এখন সব যে যার বাড়ি ফিরছে কুটুমবাড়ি থেকে। অনেকে ফিরছে নিজেদের কাজেব জায়গায়। তাই এত ভিড়।

বললাম, এখান থেকে কতটা পথ ডিমাপুর?

তা বেশ খানিকটা হবে। আমরা বরং একটা কাজ করি। সেই জোকলাবান্দা দিয়েই তো যেতে হচ্ছে। পথ তো দেখছেন? খানিকটা পাহাড়ী, কিছুটা অবশ্য ভালো। জোকলাবান্দায় পৌছতে প্রায় এগারটা বেজে যাবে। সেখানে গিয়েই আমরা লাঞ্চটা সেরে নিই। লাঞ্চ সেরে যদি সাড়ে বারোটা নাগাদ রওনা দিতে পারি, আমার মনে হয় নোমালিঘাট আমরা বিকেল আড়াইটে নাগাদ পৌছে যাবো। সেখান থেকে ডিমাপুর ১১৬ কিলোমিটার।

চমৎকার হিসেব। কী বলব। জিওলজিস্টরা যে এমন 'সাংঘাতিক' মানুষ হয় আমার জানা ছিল না। গত কাল সারা দিনরাতের ধকল। কথা শুনে বুঝতে পারছি, আজও রাত আটটার আগে পর্যন্ত চাকার ওপর বসে থাকতে হবে। তাও আবার জীপের চাকা। বুঝুন ব্যাপারখানা। পরশুরামের সেই হাড্ডি পিলপিলানোর মত অবস্থা। আর এই পাথর সাহেবদের কাছে সেটা যেন কোন সমস্যাই নয়।

বললাম, তা লাঞ্চের পর একটুক্ষণের জন্যে ন্যাপ নিয়ে আমরা

রওনা হতে পারি।

আমার কথায় যেন লাফিয়ে উঠলেন অজিতবাবু। বললেন, ভালো প্রস্তাব। একটু ন্যাপ নিলে শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠবে।

সমরজিৎ চক্রবর্তীর ঠোঁটের কোণে হাসি। —বেশ, তাই হবে। বুঝতে পারছি, একটু বাড়াবাড়িই হচ্ছে।

শিলঘাট থেকে জোকলাবান্দা দশ কিলোমিটারের মত পথ। আমরা সেখানে গিয়ে যখন পৌঁছুলাম বেলা প্রায় এগারোটা। যাওয়াব পথে এখানে থেমেছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে। তাই জায়গাটি তখন ভাল ভাবে চোখ বুলিয়ে দেখতে পাবি নি। তখন মনে হয়েছিল বড় বড় সড়কের পাশে দু চারটে দোকানপাট এবং কিছু ঘর বাড়ি নিয়ে যেমন ছোটখাটো লোকালয় গড়ে ওঠে জোকলা-বান্দা তেমনই হয়ত কিছু হবে। কিন্তু এখন দেখলাম, ঠিক তা নয়। ববং শহরই বলতে পাবেন এই জায়গাটিকে।

স্বাধীনতার পর এখানে প্রচুর লোকজন এসেছে। অসমীয়া যেমন আছেন, সেই সঙ্গে আছেন পূর্ববঙ্গের মানুষ। বিরাট বাজার। পোস্ট অফিস, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র সবই আছে এখানে। গড়ে উঠেছে ঘন বসতি। দূর গ্রামাঞ্চল থেকে হাট বাজার করতে আসে গারোরা। তখন সঙ্গে করে নিয়ে আসে তারা বাঁশের তৈরি নানা রকম সামগ্রী। এখানে সেগুলি তারা বিক্রি করে। বিক্রির পয়সা দিয়ে কেনে নিজেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

আছে হোটেল। হোটেল না বলে বলি খাবারের দোকান। যাদের মালিক বেশির ভাগই বিহার অথবা উত্তর ভারতের মানুষ। যাদের খরিদ্দার পথ চলতি যারা, তারা। ট্রাকের ড্রাইভার, ক্লিনার, রিপ্রেজেনটেটিভ অথবা ভিন অঞ্চলের লোকজন। ক্যামেরার ফিল্মও

পাবেন এখানে। পাবেন ক্যাডবেরি, ব্রিটানিয়া অথবা মাংঘারামের বিস্কুট।

আসাম থেকে শুরু করে পূর্বাঞ্চলের মানুষের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য—ব্যবহারে ওরা বড় বিনয়ী। বড মধুর। ওরা কথা বলে ধীরে। চলনের মধ্যেও চাপল্য কম। পানের দোকানে যান। আপনি বলবেন, একটা পান দিন। দেখবেন, পানের দোকানীর ঠোঁটের প্রান্তে সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠবে মধুর হাসির রেখা। ছোট্ট করে হয়ত সে বলবে, আপনারা বলেন পান। আমরা বলি তাম্বুল। তারপর ছোট্ট একটি পানের পাতা হাতে নিয়ে তাতে চুন বোলাবে। চুন বোলানো শেষ হলে বাঁ হাতের চেটোয় পানটি রেখে আস্ত একটি কাঁচা সুপুরি রাখবে তার ওপর। তারপর দু হাত বাড়িয়ে কোন দেব-দেবীকে যে ভাবে আমরা উৎসর্গ করি সেই ভাবে পানটি এগিয়ে দেবে আপনার দিকে।

দাস এসে বললেন, কয়েক দিন ধরেই তো গাড়ি চলছে, স্যার। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। গাড়ি চেক করা দরকার! একটা হেডলাইট জ্বলছে না। কারবুরেটারেও গোলমাল দেখা দিয়েছে।

দাসের কথা শুনে সমরজিৎ চক্রবর্তীর তো মাথায় হাত। বললেন, কী বলছেন, দাস? তার মানে, ঘণ্টা দুই-এর ধাক্কা!

উপায় নেই, স্যার। গাড়ি এর মধ্যেই ট্রাবল দিচ্ছে। ডিমাপুর থেকে কোহিমা খাড়াই পথ। তারপর পুকপুর যেতে হবে। অনেকটা রাস্তা। পথ আরও খারাপ। বললেন দাস।

অতএব গাড়ি গ্যারেজ করতেই হলো।

এই গ্যারেজেই পরিচয় হলো গ্যারেজের মালিকের সঙ্গে। বছর বত্রিশ বয়েস। এক সময়ে বাড়ি ছিল ময়মনসিং। এখন বাঙ্গলা দেশের

পাট তুলে চলে এসে জোকলাবান্দায় গ্যারেজ খুলে বসেছেন।

ভদ্রলোক বললেন, মোটর মেকানিকের কাজ জানতাম, স্যার। না হলে পথে বসতে হতো। নগদ তো কিছু ছিল না। এই গায়ে খেটে যেটুকু করা।

বাঁশের চাটাই ঘেরা ঘর। সহকারী হিসেবে সঙ্গে পেয়েছেন এক শ্যালক। এই দু জনকে দিয়েই চলছে গ্যারেজ। নিজেদের পরিশ্রমকে সম্বল ক'রে বেঁচে থাকার চেষ্টা।

ওঁদের সঙ্গে কথা বলে বড় ভাল লাগল। রাজনীতিক নেতাদের শিকার হয়ে পরগাছা চরিত্র যে ওঁরা পান নি, বলতে হবে এটা ওঁদের ভাগ্য। নইলে দণ্ডকারণ্য সুন্দরবন করতে করতেই এতদিন হয়ত শেষ হয়ে যেত ওঁদের জীবন।

জনৈক ভদ্রলোক বললেন, যান না। সারা পূর্বাঞ্চলটা দেখে নিন। শুধু শহর নয়। গ্রামে গ্রামে যান। ভারতের কোন অঞ্চলের মানুষ নেই এখানে ? কে অসমীয়া, কে বাঙ্গালী অথবা পাঞ্জাবী—সাধারণ মানুষ এসব কী বোঝে, মশায় ? বোঝার দরকারই বা কী ? এদের মধ্যে ওই নেতারা পড়লেই যত গোলমাল। নেতা মানে তো ভেড়ার পালে বাঘ পড়া।

প্রশ্ন করলাম, আপনি কি করেন ?

মাস্টারি। ভদ্রলোকের উত্তর।

তাই। এই কারণেই আপনার মনটা এখনও সাদা।

আমার মন্তব্যে হেসে ফেললেন ভদ্রলোক।

মনে মনে ভাবলাম, হাসুন। কিন্তু আপনাদের মত সাদা মনের মানুষ যে দিন দিন কমে যাচ্ছে।

জোকলাবান্দা থেকে রওনা হতে প্রায় আড়াইটে বেজে গেল।

এখান থেকে আবার সেই পুরনো পথ। জোরহাট-ডিব্রুগড় হাইওয়ে। ভয় পেয়েছিলাম, পথে হয়ত বৃষ্টি নামবে। এবং ঝড়। ভাগ্য ভাল। তা আর হয় নি। বরং কিছুক্ষণের মধ্যে পরিষ্কার আকাশ রোদের আলোয় ঝলমলে হয়ে উঠল। রাস্তার বাঁ পাশে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সমভূমি। ডান দিকে বন জঙ্গল। কাছাড় পর্বতমালা। খুব একটা উঁচু বলব না। লাল বেলে পাথর। বড় বড় গাছ বলতে যা বোঝায় তাও তেমন নেই সেখানে। কিছু দূর এগিয়ে হাইওয়ে উঠে গেছে পাহাড়ের ওপর। তারপর আবার সেখান থেকে আমরা নেমে এসেছি। আবার সমভূমি। বাঁ পাশে শুরু কাজিরাঙ্গার বন। সেই বন অতিক্রম করে গেলে দু পাশেই সমভূমি আবার। ধানের ক্ষেত।

এই পথ দিয়ে নোমালিঘাট পৌঁছতে বিকেল চারটে বেজে গেল। এখান থেকে জোরহাট-ডিব্রুগড় হাইওয়েকে বিদেয় দিয়ে ডান দিকে ঘুরলাম। শনিবার। পথে প্রচুর ভিড়। এখানে আছে বিরাট চা বাগান। সম্প্রতি একটি কারখানাও বসেছে। এখানে ভিনদেশী মানুষের প্রাচুর্য। চা বাগানের কুলি কামিন। শনিবার হাটবার। একটা ফাঁকা জায়গায় বসেছে সাপ্তাহিক হাট। কাটা কাপড়ের দোকান। মনোহারী সামগ্রী নিয়ে বসেছে সাপ্তাহিক বিক্রেতারা। বড় বড় দোকানের মালিক বেশির ভাগই উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের। এ সব নিয়ে নোমালিঘাট এ অঞ্চলের একটি শিল্পনগরী।

নোমালিঘাট থেকে ডান দিকে এগিয়ে গেছে ডিমাপুর হাইওয়ে। বেশ কয়েক কিলোমিটার পড়ল চা বাগান। একেবারে পথ ছুঁয়ে। ছায়াশীতল সবুজ। তারপর রুক্ষ মাটি। পুরনো বাঁকা রাস্তাটি সোজা করার জন্যে চলছে কাজ। মাঝে মাঝে চলছে আরও চওড়া করার চেষ্টা। শত শত মজুর দিন রাত পরিশ্রম করে চলেছে সেখানে। এসব

মজুরের বেশির ভাগই সাঁওতাল এবং মধ্যপ্রদেশের মানুষ। পথ চাই। আরও পথ। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নাগাল্যাণ্ডের সঙ্গে দরকার আরও বেশি সংযোগ।

নোমালিঘাট থেকে ডিমাপুরের দূরত্ব এক শ' ষোল কিলোমিটার। ডিমাপুব যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধে। ছ'টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। শহবে ঢুকতেই বিদ্যুতের আলোয় চোখ ঝলসে উঠল। প্রচুর দোকান পাট। রাস্তায় জনতা। আধুনিক বার রেস্তোরাঁ। বাটার দোকান। স্যুটিং-শার্টিং-এর আলোয় দিন করা শো রুম। অসমীয়া এবং বাঙ্গালীর ভিড়। দেশ ভাগের পব প্রচুর বাঙ্গালী এসে এখানে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। এক সময় আসামেরই অংশ ছিল ডিমাপুর। এখন নাগাল্যাণ্ড। নাগা ছেলেমেয়েরা বিলেতী পোশাকে সেজে বেশ আড্ডার আমেজ নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখে মনে হয়, আমরা কসমোপলিটান শহরের মধ্যে দিয়ে চলেছি। নাগাল্যাণ্ড, মণিপুব এবং মিজোরামেব খাস দরজা এই ডিমাপুর। এ অঞ্চলের বৃহত্তব বাণিজ্যিক কেন্দ্র। নাগাল্যাণ্ডেব রাজধানী কোহিমা। কিন্তু তার বিমান বন্দরটি এখানে—এই ডিমাপুরে। বিভিন্ন সরকারী বিভাগেব বড বড় দপ্তবও বসান হয়েছে এখানে।

সমবজিৎ চক্রবর্তী বললেন, অনেকটা পথ এসেছি। আরও অনেকটা পথ যেতে হবে। এখান থেকে কোহিমার দূরত্ব চুয়াত্তর কিলোমিটার। এবার আর সমতলভূমি নয়। খাড়াই পথ। খাড়াই পথে প্রায় চার হাজার ফুটের মত উঠতে হবে আমাদের। তাছাড়া রাস্তাটা এত আঁকা-বাঁকা—হ্যাঁ, ভাল কথা। বড়ি চাই নাকি আপনার? আপনার তো আবার এ ধরনের জার্নিতে অভ্যেস নেই।

বড়ি। মানে গা গুলিয়ে ওঠা বন্ধ করার ওষুধ?

বলতে বাধা নেই। এ ধরনের অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়ে থাকে। আমিও বাদ যাইনি। ভোলাগঞ্জ থেকে চেরাপুঞ্জি আসার পথে জীপে কেলেঙ্কারিই বাধিয়ে বসেছিলাম আমি! ব্যাপারটা খেয়াল করে অরুণাচল যাওয়ার সময় সমরজিৎ চক্রবর্তী তাঁর ওষুধের কলেকশনের সঙ্গে আমার জন্যে কিছু গা-গোলান বন্ধ করার ওষুধ সঙ্গে নিয়েছিলেন। অরুণাচলের সর্পিল পাহাড়ী পথে চলাফেরার সময় তার নিয়মিত সদ্ব্যবহারও করেছি। বলতে কী, তারপর থেকে পাহাড়ী পথ দেখলেই আমার কেমন যেন গা গুলিয়ে উঠত। সঙ্গে সঙ্গে বড়ি গলধঃকরণ। এবার সমরজিৎ চক্রবর্তীর কথা শুনেই বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। বললাম, ঠিক কথা। ওভারস্মার্ট হয়ে কাজ নেই। দিন দু চারটে বড়ি। খেয়েই নিই।

আমার কথা শুনে মৃদু হাসলেন চক্রবর্তী সাহেব। ওষুধের ব্যাগ কাছেই ছিল। তা থেকে দু'টি বড়ি বের করে দিয়ে বললেন, খেয়ে নিন। এতেই কাজ হবে।

মিনিট দশেকের জন্যে একটি চায়ের দোকানে এসে বসলাম আমরা। চা পানের পর বড়ি খেয়ে বেরোতেই পথে আলাপ হলো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। বাড়ি সিলেটে। আমাদের পরিচয় পেতেই যেন সোচ্চার হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, এ সময় নাগাল্যাণ্ড যাচ্ছেন মশায়। আবহাওয়া বড় থমথমে।

ভদ্রলোক এমনভাবে কথাটি ছুঁড়ে দিলেন, আমরা ঘাবড়ে গেলাম।

কী ব্যাপার বলুন তো? প্রশ্ন করলাম।

আর বললেন না। পরশু কোথায় যেন সেমা আর অঙ্গামী দু দল নাগার মধ্যে দাঙ্গা হয়ে গেছে। হাঙ্গামায় খুনও হয়েছে একজন।

এই নিয়ে আবহাওয়া খুব গরম। এখন শুনছি এই হাঙ্গামার জন্যে প্লেইনের লোকদের দোষ দিচ্ছে ওরা। এই তো, আপনারা আসার কিছুক্ষণ আগেই নাগাদের একটা মিছিল বেরিয়েছিল এখানে। ওরা প্রতিশোধ চায়। আমরা—বাঙ্গালীরা তো, মশায়, ঘাবড়ে গেছি। জানেন তো, এদিকে পান থেকে চুন খসলেই ওই যত দোষ নন্দ ঘোষ। মানে বাঙ্গালী।

ভদ্রলোকের কথা শুনে হোঁচট খেতে হলো। বলেন কী উনি? না। শুধু উনিই নন। আরও দু-চারজন জুটে গিয়েছিল ততক্ষণ। সবার মুখেই এক কথা। ওঁদের কথাবার্তা শুনে বেশ দমে গেলাম। দূর থেকে নাগাদের সম্পর্কে প্রচুর গল্প শুনি আমরা। ওরা নাকি দুর্ধর্ষ জাত। কল্পনাব মাহাত্ম্যে সে সব গল্প অতিরঞ্জিতও হয় যথেষ্ট। তবু একেবারে খোদ নাগাল্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে এমন ধরনের কথাবার্তা শুনে ভয় কার না পায়, বলুন?

আমি আড় চোখে চাইলাম সমরজিৎ চক্রবর্তীর দিকে। দেখলাম, তিনিও বেশ গম্ভীব হয়ে শুনছেন ওঁদের কথাবার্তা। অজিতবাবু তো পুরোপুরি চুপ।

অবশেষে এক ফাঁকে সমবজিৎ চক্রবর্তীই বললেন, বেশ ভারিক্কির মত—খারাপ ব্যাপার সব। দেখা যাক। আচ্ছা, আমরা চলি এখন, কেমন? বলেই আমাদের নিয়ে জীপে গিয়ে উঠলেন চটপট।

জীপ যখন ছাড়ল, জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার?

এবার হো হো করে হেসে উঠলেন সমরজিৎ চক্রবর্তী। বললেন, আপনিও যেমন? এ সব টুকরো টাকরা ঘটনা কোথায় নেই, বলুন? এদিকে মশায়, গুজবও অ্যাটম বোমা ফাটায়।

ডিমাপুরে গিয়ে আমাদের প্রথম কাজ সেখানকার জিওলজিক্যাল

সার্ভের অফিসে যাওয়া। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইনডিয়ার নাগাল্যাণ্ড এবং মণিপুর সারকেলের এটাই প্রধান দপ্তর।

সেখানে পৌঁছতেই হই হই কাণ্ড। অফিস ছুটি হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। জনৈক কর্মী আমাদের অপেক্ষায় তখনও সেখানে দুর্ভাবনা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমরা যেতেই নিশ্চিন্ত হলেন যেন তিনি। বললেন, বিকেল চারটে থেকে আমরা বসে আছি। এই বুঝি এলেন আপনারা। শেষ পর্যন্ত এত দেরি দেখে আমাদের ডাইরেকটর ডঃ শ্রীবাস্তব তো রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ডেপুটি ডাইরেকটর জেনারেল শম্ভু সেন কোহিমায় পৌঁছে গেছেন। এরই মধ্যে দু দুবার লাইটনিং কল করছেন তিনি। জানতে চেয়েছেন, আপনারা পৌঁছলেন কী না। ডঃ শ্রীবাস্তব আপনাদের দেরি দেখে মিনিট দশ আগে কোহিমার দিকে রওনা হয়ে গেছেন। দেরি না করে বরং এখুনি আপনারা এগিয়ে যান। হয়ত ধরে ফেলবেন তাঁদের। আমি বরং ডেপুটি ডাইরেকটর জেনারেলকে টেলিফোনে জানিয়ে দিই, আপনারা যাচ্ছেন।

বা-বা! একেবারে নন স্টপ মেসেজ। যেন মিলিটারি ফরমানের মত বলে গেলেন ভদ্রলোক।

আর অপেক্ষা না করে আমরাও কোহিমার দিকে ছুটলাম। এবং ভদ্রলোক যা বলেছিলেন তাই হলো। ডঃ শ্রীবাস্তবের দলকে আমরা মিনিট দশেকের মধ্যেই ধরে ফেললাম। তারপর মিনিটখানিক ধরে পরিচয়ের পালা এবং আমাদের এত দেরি কেন হল সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন দেবার পাট চুকিয়ে শুরু হলো আবার পথ চলা। এ পথের সাত আট কিলোমিটার সমতল। মাঝে পার্বত্য নদী। তারপর ইনার লাইনের চেক পোস্ট। ইনার লাইনের চেক পোস্টে

গাড়ি থামল। গার্ডরা আমাদের গাড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার। তারপর ছেড়ে দিলো। দেখলাম কিমিনের মত এখানে তেমন কড়াকড়ি নেই। সরকারী গাড়িকে এরা তেমন বাধা দেয় না।

ইনার লাইনের পর থেকেই পাহাড়। আমার পাশে এবার বসেছিলেন ডঃ নির্মল চক্রবর্তী। গাড়ি প্রচণ্ড আঁকা-বাঁকা পথ ধরে ক্রমেই উপরে উঠতে লাগল। এতক্ষণ আমাদের জামা কাপড় ছিল হালকা। এবার এক-আধটা গরম পোশাক পরে নিতে হলো।

ডঃ চক্রবর্তী বললেন, কোহিমায় চলুন, দেখবেন আরও শীত করবে।

পাশে বসে এদিকের ভূতাত্ত্বিক পরিচয় দিতে লাগলেন নির্মলবাবু। প্রথমে বাটি। তারপর সেল। এ সব নতুন ভূস্তর। অবশেষে প্রাচীন ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ। পাললিক শিলার পর এল পরিবর্তিত শিলা। নাগাল্যাণ্ডে আছে প্রচুর কয়লা। আছে চুনা পাথর। আর জিওলজিক্যাল সার্ভে আবিষ্কার করেছে লোহা, নিকেল, কোবলট।

কোহিমায় পৌঁছলাম রাত প্রায় সাড়ে ন'টায়। পাহাড় হাজার 'আলোয় আলোকিত সেখানে। শম্ভুবাবু এবং আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ভি আই পি গেস্ট হাউসে।

সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, আজ আর রাত করা নয়। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। আগামীকাল এখানকার পাওয়ার এবং জিওলজির মন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার। সকালে। তারপর বিরাট ট্রিপ। ২৫৮ কিলোমিটার। সেখানে গিয়েই দেখবেন সত্যিকারের সৌন্দর্য কোথায়।

তেরো

কোহিমা। ৫৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই পার্বত্য শহর আধুনিক নাগাল্যাণ্ডের এখন প্রাণকেন্দ্র। না। শুধু কি তাই? এ শহর নাগাদের কাছে এখন গর্বও বটে।

এদের আত্ম-অভিমান বড় বেশি। এরা প্রচণ্ড স্পর্শকাতর। মন্তব্য করলেন রবিকুমার। জিওলজিক্যাল সার্ভের তরুণ জিওলজিস্ট।

কী রকম? আমার প্রশ্ন।

সে আপনাকে বোঝাতে পারবো না। যাচ্ছেন তো পুকপুর। সেখানে গেলেই আমার কথার মর্মটি বুঝতে পারবেন।

জানি না, কী বলতে চাইলেন রবিকুমার। কিন্তু মনে মনে কেমন যেন শিহরণ অনুভব করলাম।

এক সময় এই অঞ্চলটিকে লোকে বলতো, নাগা পাহাড়ের দেশ। উত্তরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, দক্ষিণে মণিপুর। পশ্চিমে যান, পাবেন ধনশ্রী উপত্যকা। পুবে ব্রহ্মদেশ। স্বাধীনতার আগে পশ্চিমের বেশ বড় রকম একটি অঞ্চল বৃটিশ রাজের অধীনে ছিল। নাগাদের তখন মোটামুটি সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যারা দক্ষিণ-পশ্চিমে বাস করতো, তাদের বলা হতো কাচ্চা নাগা। মণিপুরের উত্তরে যারা বাস করে তাদের বলা হয় আঙ্গামী। আঙ্গামীরা চেহারায় যেমন লম্বা চওড়া, মানুষ হিসেবেও এরা বড় বেশি স্বাধীনচেতা। আঙ্গামীদের উত্তরে-পশ্চিমে বাস করে রেঙ্গমা। রেঙ্গমাদের উত্তরে লোটা এবং পূর্বে

ও উত্তর-পূর্বে সেমা নাগাদের বাস। আরও উত্তরে গেলে দেখতে পাবেন আর একশ্রেণীর নাগা। যাদের বলা হয় আউ। এগিয়ে যান আরও উত্তরে। বরং বলি উত্তর-পূর্বে। সেখানে চোখে পড়বে চাংগো নাগাদের। চাংগো শব্দটির অর্থ উলঙ্গ। ব্রিটিশরা আর একশ্রেণীর নাগার কথা উল্লেখ করেছেন। যাদের ওঁরা বলতেন স্বাধীন নাগা।

বাট দিস ইজ এ ব্রড ডিভিশন। ইফ ইউ ইনক্লুড সাব-ট্রাইবস, দ্য নাম্বার উইল বি মোর দ্যান ফরটি। মন্তব্য করেছিলেন তরুণ নাগা ডাক্তার মেরেন সাংতাম। তুয়েংসাং জেলার পুংরোয় ওঁর বাসস্থান। মেডিকেল অফিসার। ওঁর সঙ্গে দেখা পুকপুরে।

মিঃ কর? ঘুম ভাঙলো?

বিছানায় শুয়ে তখনও আড়ামোড়া ভাঙছি। তন্দ্রায় চোখের পাতা তখনও ভারী। হঠাৎ শম্ভু সেনের গলার শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। দেখি, তিনি দাড়ি কামানোর সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করছেন।

শব্দ শুনছেন? শম্ভুবাবুর প্রশ্ন।

কিসের শব্দ? আমার জিজ্ঞাসা।

একটু কান খাড়া করুন, শুনতে পাবেন।

তাই তো। একটানা গুরুগম্ভীর শব্দ যেন? হুঁ—হুঁ—উম! হু—হুঁ—উম। মনে হলো সে শব্দ পাহাড়ের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে গড়িয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। যে শব্দে বুক কাঁপে অনভ্যস্ত মানুষের।

শম্ভুবাবু বললেন, বাইরে গিয়ে দেখুন না, এ শব্দ কারা করছে?

তাঁর কথায় 'সেবক' গেস্ট হাউসের বাইরে বেরুতেই এক ঝলক উজ্জ্বল রোদ গায়ে এসে পড়ল। আর সেই সঙ্গে গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে বুকটা উঠল কেঁপে।

নাগা। গেস্ট হাউসের নিচের পথ দিয়ে সারিবদ্ধভাবে হেঁটে

চলেছে একদল নাগা যুবক। সুগৌর রঙ। খালি পা। পরনে হাফ প্যান্ট। কারোর গায়ে শুধু গেঞ্জি। কেউ গেঞ্জির ওপর জড়িয়ে নিয়েছে কালো রঙের চাদর। চাদরে লাল রঙের কাজ। প্রত্যেকের হাতে বেশ বড় একখণ্ড কাঠ। এক একটি খণ্ড লম্বায় প্রায় সাত-আট ফুট। ওজনও তিরিশ চল্লিশ কিলোর কম হবে না। বলিষ্ঠ তাদের চলন। একের পেছনে আর একজনের অনুগমন। তা কম করেও দুশ জন তো হবেই। মুখে একটানা ধ্বনি। হু —হুঁ—উম। হুঁ—হুঁ—উম!

দেখলেন তো, মিঃ কর? এদেশে বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে কত কষ্ট করতে হয়?

পেছনে চাইতেই দেখি, অজিতবাবু।

এরা কারা? যা গলার আওয়াজ মশায়, ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম।

যা বলেছেন। মৃদু হাসলেন অজিতবাবু। —ভোর রাতে উঠে এরা সব কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। জানেন তো, নাগাল্যাণ্ডের মানুষদের গৃহস্থালীর জ্বালানির জন্যে কাঠের উপরই নির্ভর করতে হয় বেশি।

যাই বলুন, শক্তি আছে, মশায়। অমন বড় বড় কাঠ কেমন বেমালুম বয়ে নিয়ে ছুটে চলেছে।

তা শক্তি ওরা ধরে। দারুণ কর্মঠ জাত, মশায়। আর ওই যে গান শুনছেন, গলা মিলিয়ে কোরাস? ওই গান ওদের কর্মশক্তি আরও বাড়িয়ে দেয়।

সব্বনেশে কাণ্ড। এটাকে বলছেন গান? এ গান শুনলে আমাদের মরা মানুষেরও পিলে চমকাবে।

এদের চমকায় না। বরং প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর হয়।

ওরা চলে গেল। আর স্তম্ভিতের মত আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। এরাই তা হলে নাগা? শুনেছিলাম, নাগারা নাকি দুর্ধর্ষ হয়। সমভূমির যারা মানুষ, তাদের কাছে নাগা মানেই যেন আতঙ্ক। কিন্তু এদের দেখে তেমন তো কিছু মনে হলো না?

গেস্ট হাউসের ঘরে ফিরতেই শম্ভুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কেমন দেখলেন?

অপূর্ব।

জেসামি চলুন, দেখবেন আরও ভালো লাগবে। সেখানে বাস করে চেকাসাং নাগা। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন। নির্মল চক্রবর্তী, অসিত ভৌমিক, রবিকুমার ওরা সারকিট হাউসে আছে। টেলিফোনে এইমাত্র তাদের তাড়াতাড়ি চলে আসতে বললাম। ন'টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। সাড়ে ন'টায় নাগাল্যাণ্ডের শক্তি, ভূতত্ত্ব, খনি এবং সীমানা সমস্যা বিষয়ক মন্ত্রী মিঃ লেঙ্গা ল্যাঙ্গ-এর সঙ্গে আমাদের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট। এখানকার জিওলজি এবং মাইনিং ডাইরেকটরেটের ডাইরেকটার আর এন কাকের-এর সঙ্গে গতকাল আপনারা এখানে আসার আগেই মন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের মিটিং-এর ব্যাপারটা কনফরম করে নিয়েছি। অসুবিধের কারণ নেই। সাড়ে দশটার মধ্যে মিটিংটা যদি শেষ করতে পারি, আমরা সন্ধের মধ্যেই কিফ্‌রে গিয়ে পৌঁছতে পারবো। দুর্গম পথ। কোহিমা থেকে দূরত্ব ২৫৮ কিলোমিটার।

রীতিমত ফরমান।

তাতে অসুবিধে অবশ্য কিছু নেই। কারণ কোহিমার আকাশে সূর্যের আলো ঝরতে শুরু করে ভোর সাড়ে চারটের মধ্যে। পাহাড়ের গায়ে থরে থরে সাজানো ঘরবাড়ি জেগে ওঠে তখন। এ শহরের

প্রতিটি মানুষ তখন থেকেই শ্রমিক।

ছ'টা বাজতেই গেস্ট হাউসের পরিচালক এসে জানিয়ে দিলেন, গরম জল প্রস্তুত। আপনারা স্নান সেরে নিন।

স্নান সেরে প্রস্তুত হতেই অসিত ভৌমিক, রবিকুমার এবং আর সবাই এসে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বসে গেল মিলিটারি কায়দায় মিটিং।

শম্ভুবাবু বললেন, আমার মনে হচ্ছে, এখান থেকেই দুটি দল তৈরি করে ফেলা দরকার। ভৌমিক, ইউ বি দ্য কম্যাণ্ডার অভ দ্য অ্যাডভান্স পার্টি। আপনি, রবিকুমার এবং আরও কয়েকজন ব্রেকফাস্টের পর দু'টি জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন।

ডঃ শ্রীবাস্তব পাশ থেকে মন্তব্য করলেন, কিফ্‌রের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিসট্রিকট কমিশনার মিঃ এস লিমা আয়ার-এর সঙ্গে আমি কথা বলে রেখেছি। পুকপুরে জাংগার গ্রামে তিনি আমাদের জন্যে একটি কালচারাল শোর ব্যবস্থা করেছেন। তাদের জন্যে তো সঙ্গে কিছু নিতে হয়।

ইউ মিন গিফট? ঠিক। ভৌমিক আপনারা এক কাজ করুন। এই কোহিমা থেকেই সওদাগুলি নিয়ে নিন। ছয় বস্তা নুন, কয়েক প্যাকেট টফি এবং চারমিনার সিগারেট। ভারি খুশী হবে ওরা। বললেন শম্ভু সেন।

নুন দিয়ে নাগাদের সঙ্গে সখ্যতা করাটা কি রীতির মধ্যে পড়ে? আমার প্রশ্ন।

রীতিনীতি বুঝি না, মিঃ কর। যেখানে যাচ্ছেন, দেখবেন কী দুর্গম জায়গা সেটা। নুন সেখানে একটা দুর্লভ সামগ্রী। শম্ভুবাবুর উত্তর।

শম্ভুবাবুর প্ল্যান অনুযায়ী অসিত ভৌমিকের নেতৃত্ব কিফ্‌রের দিকে চলে গেলো ব্রেকফাস্টের পর। ঠিক হলো, তাঁরা সেখানে পৌঁছে

আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক আছে কী না, দেখে নেবেন। সেই সঙ্গে ব্যবস্থা করবেন বিভিন্ন রসদপত্রের। পুকপুর যাওয়ার প্ল্যান। শুনলাম, এ ধরনের কাজে অসিতবাবু দারুণ পোক্ত। ১৯৭৭ সালের লোহিত এক্সপিডিশনেও তিনি ছিলেন অ্যাডভান্স পার্টির কমাণ্ডার।

তাঁরা চলে যাওয়ার পর বসলো আর একদফা মিটিং। শম্ভুবাবু এবং ডঃ শ্রীবাস্তব ঠিক করে নিলেন মিনিস্টারের সঙ্গে আলোচনা করার সময় কোন কোন বিষয়ের ওপর জোর দেবেন তাঁরা। তাঁকে বোঝাতে হবে, ভূতাত্ত্বিক সম্পদের দিক দিয়ে নাগাল্যাণ্ড যথেষ্ট ধনী। এই সম্পদ যদি যথাযথ কাজে লাগানো যায়, নাগাল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন এমন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। তাছাড়া এ অঞ্চলে জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার কাজকর্মের জন্যে প্রদেশ সরকারের কাছ থেকে কী ধরনের সহযোগিতা তাঁদের দরকার মন্ত্রীর কাছে সে কথাও তুলে ধরতে হবে।

শম্ভুবাবুর পরিষ্কার কথা। হতে পারে জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর কিন্তু যা কিছু কাজকর্ম তাঁরা করে থাকেন তার সবই তো হয় কোন না কোন প্রদেশ সরকারের আঞ্চলিক সীমানার মধ্যেই। কখনও কখনও কোন কোন প্রদেশ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার একই সমস্যার মোকাবিলার জন্যে যুগপৎ কাজ করতে এগিয়ে আসে। যেমন ধরুন এই নাগাল্যাণ্ড। নাগাল্যাণ্ড সরকারের নিজস্ব ভূতাত্ত্বিক দপ্তর আছে। এই দপ্তরটিরও কাজ এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক সম্পদ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং কোথাও ব্যবহারযোগ্য কোন সম্পদ পেলে তাকে কাজে লাগানো। অথচ জিওলজিক্যাল সার্ভের দায়িত্ব ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। এখন দেখা দরকার, প্রাদেশিক দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় উদ্যোগ এমন কিছু কাজ

করছে কী না, যেটা ডুপ্লিকেশনের পর্যায়ে পড়ে। পড়লে সেক্ষেত্রে সেটা হবে অপচয়। এ বিষয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। আছে আরও সমস্যা। সমস্যা স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে। এখানে অনেক গ্রাম আছে যেখানে বাইরের লোকদের পক্ষে চলাফেরা করাটা যথেষ্ট বিপজ্জনক। বাইরের লোকদের তারা বিশ্বাসই করতে চায় না। তবে অন্তত জিওলজিস্টদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা আগের তুলনায় এখন অনেক কম। ওদের মনে একবার যদি বিশ্বাস জন্মানো যায়, জিওলজিস্টরা যা কিছু করছেন তাতে ওদেরই মঙ্গল, তাহলে সমস্যা যেটুকুও এখন আছে তা দূর করতে বেগ পেতে হবে না। এর জন্যে দরকার নাগাল্যাণ্ড সরকারের শিক্ষা এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতা।

শম্ভুবাবুর কথাবার্তায় বুঝলাম নানা রকম পরিকল্পনা মাথায় রেখেই তিনি মন্ত্রী মিঃ গেঙ্গা ল্যাঙ্গ-এর সঙ্গে কথা বলতে চলেছেন।

দরকার। এ ধরনের আলোচনাই তো এখন দরকার সব চেয়ে বেশি। কারণ ভূতাত্ত্বিকদের কাছে নাগাল্যাণ্ড তো এখনও কুমারী রমণী। ভারতের এই পার্বত্যসঙ্কুল অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক সম্পদ সম্পর্কে এ পর্যন্ত কতটুকু জানতে পেরেছেন তাঁরা ? আগে কিছু কিছু ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান যে এখানে হয়নি, সে কথা বলব না। কিন্তু জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার নর্থ-ইস্টার্ন রিজিওন খোলার পর নাগাল্যাণ্ডে যে ধরনের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে তাও যেন এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

ডিমাপুর থেকে কোহিমার চড়াই পথে ওঠার সময় ডঃ নির্মল চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, মিঃ কর, নাগাল্যাণ্ড মানেই তো শুধু পাহাড়। আরাকান ইয়োমা পর্বতমালা এগিয়ে এসেছে উত্তর দিকে। সেই উত্তরেই নাগাল্যাণ্ডের অবস্থান। এখানকার ঢেউ খেলানো

পাহাড়গুলি ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল আজ থেকে প্রায় সাত কোটি বছর আছে। ভূতাত্ত্বিকের ভাষায় বলবো, ক্রিটেসিয়াম এবং টারসিয়ারি যুগে। ক্রিটেসিয়াম যুগকেই বলা হয় খড়িমাটি তৈরির যুগ। এই সেদিনও, ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত, বলতে পারেন, কতটুকু ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা হয়েছিল এখানে? দুর্গম এই অঞ্চলে যেখানে শুধু চলাচল করা সম্ভব ছিল, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ একমাত্র সেখানেই যৎসামান্য যাতায়াত করত। যাঁরা যেতেন তাঁদের লক্ষও ছিল এ অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক জ্ঞান আহরণ নয়, কোথাও কিছু খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় কী না, তারই সন্ধান করা।

নাগাল্যাণ্ডের নাজিরা কয়লাখনি এলাকা সম্পর্কে একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া গিয়েছিল এফ আর ম্যালেটের স্মৃতিকথায়। সেটা ১৮৭৬। এর পর ১৯১০ সালে নাগাল্যাণ্ডের একাধিক কয়লাখনি এলাকার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় এইচ এইচ হয়ডেনের রচনায়। হয়ডেন লিখেছেন, ডিখু উপত্যকার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যতই এগোনো যায়, দেখা যাবে কয়লার স্তর ক্রমেই সরু হয়ে আসছে। আরও পশ্চিমে এগিয়ে যান, কয়লার বদলে তখন চোখে পড়বে কার্বনঘটিত শেল। পি ইভানস এবং এল পি মাথুর ১৯৪৬ সালের স্কুপেন বেল্টের ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে সুন্দর একটি ছবি তুলে ধরেছিলেন। ১৯৬৭ এবং '৬৮ সালে চাংসিকং-জাপুকং এলাকার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করেন এম ডি লিমায়ে এবং বি দেবাধিকারী। তাঁরা ওই সব অঞ্চলের কয়লা এবং চুনা পাথরেরও সন্ধান দেন। ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে এন ডি মিত্র এবং এ চৌধুরী নাগাল্যাণ্ডের বোরজাগ—চাংগিকং কয়লাখনি অধ্যুষিত অঞ্চলের বিশদ মানচিত্র তৈরি করেন। ১৯৭৩ সালে এন ভৌমিক, এম মজুমদার এবং এস এ আমেদের অনুসন্ধানে ধরা পড়ে

নাগাল্যাণ্ডের তুয়েংসাং জেলার পুকপুর গ্রামের কাছাকাছি অঞ্চলে রয়েছে ম্যাগনেটাইট, নিকেল এবং কোবল্ট।

শম্ভু সেন বললেন, ব্যাপার কি জানেন ? নাগাল্যাণ্ডকে আমরা বলি, একফালি সরু পার্বত্য অঞ্চল। শুরু হয়েছে উত্তর-পূর্ব বরাবর। এগিয়ে গেছে দক্ষিণ-পূর্ব বরাবর। এর উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমে আসামের সমভূমি। আর এই যে পার্বত্য অঞ্চলের কথা বললাম তার জন্ম টারসিয়ারি ক্রিটেসিয়াম যুগে। অর্থাৎ এদিকের ভূ-স্তরের বয়েস প্রায় সাত কোটি বছর। এখানকার ভূ-স্তর বয়েসে নবীন। এবং সচল। সচল বলেই এই অঞ্চলটি ভূমিকম্পের অন্যতম কেন্দ্র। এছাড়া ভূতত্ত্বের দিক দিয়ে নাগাল্যাণ্ড আরও একটি ব্যাপারে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর সবটাই 'জিওসিনক্লিনাল'। চারদিকে পাহাড়। মাঝখানে গামলার মত খাপ। কোহিমা শহরের বাইরে গেলেই বুঝতে পারবেন, কী বলছি আমি। দেখবেন, আপনি ভঙ্গিল পর্বত বা ফোল্ড মাউনটেইনস-এর ওপর দিয়ে চলেছেন। ভাঁজে ভাঁজে ভূ-স্তর। যেন একের পর এক পাথরের ঢেউ। আর ঢেউগুলির মাঝখানে গভীর গামলা। পর্বতচূড়া থেকে যাদের গভীরতা কোথাও এক হাজার ফুট। কোথাও তার চেয়েও বেশি। এদেরই আমরা বলি 'জিওসিনক্লিনাল ফেসিজ'। এ সব অঞ্চল খনিজ সম্পদের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ভূতত্ত্বের দিক দিয়ে নাগাল্যাণ্ডকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ডিসাং গ্রুপ, বারেইল গ্রুপ, সুরমা এবং তিপম গ্রুপ, নামসাংবেড এবং ডিহং গ্রুপ। ধূসর রঙের শেল এবং বেলেপাথর ডিসাং গ্রুপের বৈশিষ্ট্য। ডিসাং ভূ-স্তরের গভীরতা প্রায় তিন হাজার মিটার। তুলনায় বারেইল স্তর আরও বেশি পুরু। চার থেকে ছয় হাজার মিটার। এই ভূ-স্তরের প্রধান উপাদান বেলেপাথর। সুরমা গ্রুপের

ভূ-স্তরে দেখতে পাবেন শেল এবং বেলেপাথর। ডিহং গ্রুপে আছে বালি, মাটি এবং নুড়িপাথর।

গত কয়েক বছর ধরে এখানকার বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলে অনুসন্ধান চালিয়েছেন নাগাল্যাণ্ড সরকারের ভূতাত্ত্বিক দপ্তর এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার ভূতাত্ত্বিকরা। এই সব অনুসন্ধানের ফলে নেঁইয়াং এবং তাপে নদীর অন্তর্বর্তী তুজু উপত্যকার পানচিমি এবং কুরানিতে পাওয়া গেছে অ্যাসবেসটস। নাগাল্যাণ্ড সরকারের ভূতত্ত্ব দপ্তর সন্ধান দিয়েছেন মূল্যবান আকরিক নিকেল এবং ক্রোমাইটের। এই সব মূল্যবান ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেছে তুয়েনসাং জেলার পাং নামক একটি গ্রামে। পাওয়া গেছে পাং এবং থোনোসিংইয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে, পুকপুব এবং থোলোসিংইয়ার মাঝামাঝি আর একটি জায়গায়।

এক সময় বলা হতো নাজিরা কয়লাখনি এলাকা। এখন বলা হয় ডিখু উপত্যকা কয়লাখনি অঞ্চল। নাগাল্যাণ্ডের এটাই বৃহত্তম এবং উল্লেখযোগ্য কয়লাখনি অধ্যুষিত এলাকা। কয়লা পাওয়া গেছে আরও অনেক জায়গায়। পাওয়া গেছে চাঙ্গকি—চোনগ্নিমসেন-এ ওয়ারোমাং—মোঙ্গচেন এবং লাকুনিমিরিনপো-তে। অবশ্য এ পর্যন্ত যতটা কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে তার মান যে খুব ভাল, তা নয়। গন্ধকের মাত্রা বেশি। ওই সব কয়লার ছাই-এর পরিমাণও কম নয়।

তুয়েংসাং জেলার পুংরো সারকেলে যে চুনা পাথর পাওয়া গেছে তা যথেষ্ট উন্নত মানের। আছে নিকেল, জুনকিতে সন্ধান মিলেছে পিরাইটিসের। দস্তা পাওয়ার সম্ভাবনার কথাও সম্প্রতি উল্লেখ করেছেন জিওলজিক্যাল সার্ভে। এছাড়া প্রচুর শ্লেটপাথর।

নাগাল্যাণ্ডের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এখানকার কয়েকটি

প্রস্রবণ। এই সব প্রস্রবণের জলে প্রচুর নুন পাওয়া যায়। ডিসাং অঞ্চলে গেলে এ ধরনের প্রচুর প্রস্রবণ আপনার চোখে পড়বে। স্থানীয় অধিবাসীরা এদের জল বাষ্পীভূত করে খাবার নুন সংগ্রহ করে থাকে।

ডঃ শ্রীবাস্তব বললেন, মিঃ কর, কিফ্‌রেতে চলুন, কিছুটা সময় সেখানে আমরা তো পাবোই। নাগাল্যাণ্ডের ভূতাত্ত্বিক সম্পদ সম্পর্কে তখন অনেক কথা শোনাবো আপনাকে। সোনা, মশাই, সোনা। 'দ্য ল্যাণ্ড ইজ ভেরি মাচ রিচ ইন মিনারেলস।' মুশকিল হয়েছে শুধু ওই পথঘাট নিয়ে। এখানে এক মাইল দূরত্ব যেতে আপনাকে পাহাড়ের গায়ে পাক খেতে হবে মাইলের পর মাইল। আর নাগাদের কথা বলছেন? দে আর কোয়ায়েট ফ্রেনডলি। আমার সারকেলে কাজ করতে গিয়ে ওদের তরফ থেকে খুব একটা বাধা পাইনি।

ন'টা বাজল। অসিত ভৌমিকের অ্যাডভান্স পার্টি কিফ্‌রের পথে রওনা হলেন আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জেনারেল শম্ভু সেন ঘোষণা করলেন, জেন্টলমেন, উই হ্যাভ টু প্যাক আপ নাও। এখন ন'টা। মন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট সাড়ে ন'টায়।

শীতের সময় কোহিমার তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি নেমে যায়। এপ্রিলে সেখানে বসন্তের আবহাওয়া। রাতের দিকে বেশ শীত শীত করছিল। আমাদের দিকে মাঘ মাসের গোড়ায় যেমনটি হয়ে থাকে তেমন। তবে তখন, এপ্রিলের এই সকালে মৃদু শীত এবং তার সঙ্গে উজ্জ্বল রোদ বড় মিষ্টি বলেই মনে হচ্ছিল আমার। একটা ফুলস্লিভ শার্টই যথেষ্ট।

এখানকার পাহাড়ে ঝোপঝাড় আছে যথেষ্ট। কিন্তু ঘন অরণ্য

বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু নেই। কোহিমায় পাখি দেখেছি কম। এমন কি কাকও। 'সেবক' গেস্ট হাউসের পেছনে উপত্যকা। শহরের পরিধি সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সারা শহরে তৈরি হয়েছে সুপ্রশস্ত পথ। আছে অভিজাত হোটেল, বড় বড় অট্টালিকা। কোহিমা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এখন আধুনিক শহর। সমৃদ্ধ শহর।

গোছগাছ সেরে বেরোতে গেলো আরও দশ মিনিট। শুরু হলো আবার কনভয়। সামনের গাড়িতে শম্ভুবাবু, ডঃ শ্রীবাস্তব এবং আমি। পেছনে দু'খানা জিপে অজিত ব্যানার্জি এবং সমরজিৎ চক্রবর্তী। খাড়াই-উৎড়াই পথে মন্ত্রীর দপ্তরে গিয়ে যখন আমরা পৌছলাম, ঘড়িতে তখন ন'টা বেজে পঁচিশ।

দপ্তরে গাড়ি গিয়ে থামতেই ডঃ শ্রীবাস্তব নেমে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, আপনারা একটু বসুন। আমি মিঃ কাকেরের সঙ্গে আগে কথা বলে নিই।

তারপর মিনিট তিনেক বিরতি। মিঃ কাকেরকে নিয়ে ফিরে এলেন ডঃ শ্রীবাস্তব। তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি মিঃ কাকের। নাগাল্যাণ্ড সরকারের ভূতত্ত্ব দপ্তরে ডাইরেকটার। আগে জিওলজি-ক্যাল সারভেতেই কাজ করতেন।

ভদ্রলোক পাঞ্জাবী। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। সেই সঙ্গে যথেষ্ট বিনয়ী। বললেন, আপনারা আসাতে খুবই খুশি হয়েছি আমরা। মিঃ সেন, আমাদের মন্ত্রী মিঃ ল্যাঙ্গকে আপনার কথা বলেছি। আপনি দেখা করতে আসছেন জেনে তিনিও খুব খুশি। দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন মিঃ ল্যাঙ্গকে আমি একটু খবর দিয়ে আসি আপনারা এসে গেছেন। বলেই তিনি চলে গেলেন।

ডঃ শ্রীবাস্তব বললেন, মিঃ ল্যাঙ্গ প্রবীণ আই সি এস অফিসার।

অবসর নেওয়ার পর এখন মন্ত্রী হয়েছেন। শুনেছি খুব সিরিয়াস মানুষ। জিওলজির ব্যাপারে ওঁর প্রচণ্ড আগ্রহ।

শুধু কি আগ্রহ? মিঃ গেঙ্গা ল্যাঙ্গ-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই বুঝলাম, শুধু বয়েসেই তিনি প্রবীণ নয়, তাঁর মত বিচক্ষণ মন্ত্রী খুবই কম চোখে পড়ে।

মিনিটখানিক পর মিঃ কাকের ফিরে এসে জানালেন, মন্ত্রী আপনাদেব জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপনারা আসুন।

অসাধারণ ব্যক্তিসম্পন্ন পুরুষ মিঃ ল্যাঙ্গ। শান্ত সৌম্য চেহারা; মুখের ওপর পাথরের প্রশান্তি। তাঁর বসা, পোশাক এবং কথা বলায় প্রচণ্ড আভিজাত্যের ছাপ। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমার ধারণা ছিলো, রাজনীতি যাঁরা কবেন, তাঁরা কথা বলেন বেশি। শ্রোতার চেয়ে বক্তার ভূমিকাই তাঁদের প্রধান। কিন্তু দেখলাম মিঃ ল্যাঙ্গ তার বড় রকমের ব্যতিক্রম।

ঘরে ছিলেন মিঃ ল্যাঙ্গ এবং নাগাল্যাণ্ড সরকারে শক্তি এবং ভূতত্ত্ব দপ্তরের সেক্রেটাবি মিঃ জাকালু। ইনিও নাগা। বেঁটে খাটো মানুষ। আটপৌরে চেহারা। হঠাৎ দেখলে মনেই হবে না ওই আটপৌরে চেহারার আড়ালে এমন একজন মানুষ থাকতে পারে যিনি শুধু প্রাজ্ঞই নন, রসিক ব্যক্তিও বটে।

পরিচয়ের পর আলোচনার সূত্রপাত করলেন শম্ভু সেন। মিঃ ল্যাঙ্গের টেবিলের ওপর নাগাল্যাণ্ডের বিরাট একটি মানচিত্র বিছিয়ে বলে যেতে লাগলেন নাগাল্যাণ্ডের কোন জায়গায় কী ধরনের ভূতাত্ত্বিক সম্পদ রয়েছে এবং অনুসন্ধান চালালে কতটা সম্পদ পাওয়া যেতে পারে?

দেখলাম শম্ভুবাবু যতক্ষণ কথা বলে গেলেন, তিনি বসে রইলেন

নির্বাক। যেন পাথরের মূর্তি। তিনি তাঁর কথা শুনছিলেন এবং মাঝে মাঝে মানচিত্রের ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন।

শম্ভুবাবুব কথা বলা শেষ হওয়ার পর মুখ খুললেন মিঃ ল্যাঙ্গ। তাঁর কথার সুরে কোন চপলতা নেই, কোন উত্তেজনাও ছিল না। ছিল গম্ভীর বিচক্ষণতা এবং নাগা অধিবাসীদের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধ।

মিঃ ল্যাঙ্গ বললেন মিঃ সেন, আমাদের সমস্যাটা অন্যরকম। এখানে উন্নয়নমূলক কাজ করতে হলে চাই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। সারা দেশের জন্যে কতকগুলি ঢালাও নীতি আছে, ঠিকই। আমি তার সমালোচনা করতে চাই না। আমি শুধু একথাই বলব, নাগাল্যাণ্ড শুড বি ট্রিটেড অ্যাজ এ স্পেশাল কেস। আমাদের মানুষ কম শিক্ষিত। তাদের তেমন প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। তাদের জন্যে দবকার বিশেষ ধরনেব শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ। যাতে করে এখানে যা সম্পদ আছে, তাকে নিজেদের স্বার্থে তারা কাজে লাগাতে পারে। দবকার টেকনিক্যাল এডুকেশন। দরকার টেকনোলজির প্রসার। এর জন্যে প্রয়োজন বিদ্যুৎ শক্তি। আমরা আসাম সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁরা নিয়মিত পাঁচ মেগাওয়াটের মত শক্তি আমাদের সরবরাহ করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তিজু এবং জুনকি নদীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেব পরিকল্পনা করছি আমরা। এর জন্যে লিকেমরো জলপ্রপাতও কাজে লাগানো যেতে পারে। ওখা জেলায় ডিয়াং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে কাজ চলছে। কিন্তু সেটাও তো শেষ হতে সাত আট বছর। অতদিন আমরা তো বসে থাকতে পারি না।

আমাদের প্রচুর কয়লা আছে। ডিয়াং-এ চারকোটি পঞ্চাশ লক্ষ

টন কয়লার অস্তিত্ব আমরা প্রমাণ করেছি। তা দিয়ে তাঁপবিদ্যুৎ তৈরি কবা যায়। বোরজান-এ সন্ধান পাওয়া গেছে ৫৫ মিলিয়ন টনের মত কয়লা। যে কয়লার তাপ দেবার ক্ষমতা যথেষ্ট বেশি। ৭০০০ ব্রিটিশ থার্মাল এককের মত। কোনিয়াতেও প্রচুর কয়লা আছে বলে আমরা জেনেছি। ঠিক কতটা কয়লা আছে, সে কয়লার গুণগত উৎকর্ষ কতটা সেটা আপনারা আমাদের জানিয়ে দিন। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইনডিয়া আমাদের যথেষ্ট উপকার কবেছে এবং করছেও। এখন তৈরি হয়েছে কোল ইনডিয়া। কোনিয়ার কয়লা সম্বন্ধে ওদের সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সময় লাগবে। তাব চেয়ে বরং আপনারাই এ কাজটা করুন না। তাতে কাজটা তাড়াতাড়ি হবে।

শম্ভুবাবু পুকপুরের প্রসঙ্গে তুললেন।

মিঃ ল্যাঙ্গ বললেন, জানি। 'পুকপুর ইজ এ ডিফিকাল্ট এরিয়া'। খবর পেয়েছি, স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতা আপনারা সেখানেও পাচ্ছেন।—নাগাল্যাণ্ডের মানুষ এতদিন ঘুমিয়ে ছিলো, মিঃ সেন। এখন তাদের চোখ খুলেছে। বিদ্যুৎ এবং পথ—এ দু'টিই এখন আমাদের কাছে বড় রকমের সমস্যা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ দু'টি সমস্যার সমাধান চাই। চাই 'টেকনোলজিক্যাল প্রোগ্রেস'। আমরা সময় নষ্ট করতে পারবো না। আপনারা বলে দিন কোথায় কী সম্পদ আছে। কুইক। বলে দিন কী ভাবে তাদের কাজে লাগানো যায়। আমরা কাজে নেমে পড়ি। সেদিন দিল্লিতেও আমি বলে এসেছি গড়িমসি না করে নাগাল্যাণ্ডকে আপনারা সাহায্য করুন, নাগাল্যাণ্ডও আপনাদের সাহায্য করবে।

জিওলজির প্রসঙ্গ উঠল। আমি বললাম, মিঃ ল্যাঙ্গ, নাগাল্যাণ্ড অত্যন্ত দুর্গম অঞ্চল। একটা কাজ করা যায় না? এখানে তো অনেক

বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। যদি তাঁদের বলা হয়, আপনারা গ্রামবাসীদের পাথর চেনান। যে যে অঞ্চলে তারা বাস করে, সেখানকার পাথরের নমুনা দেখে তারা অনুমান করুক, ওই পাথরের মধ্যে এমন কোন সম্পদ আছে কী না যা বাস্তব প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে। সে রকম বুঝলে ওই নমুনা, ধরুন, জিওলজিক্যাল সার্ভেতে তারা পাঠিয়ে দিলো। এই ভাবে জিওলজিক্যাল সার্ভেরও যথেষ্ট সাহায্য হবে। গ্রামবাসীদের মধ্যে এ ধরনের কাজ যারা করবে, তাদের আর্থিক সাহায্যও করা যেতে পারে।

মিঃ ল্যাঙ্গ বললেন, আপনার আইডিয়া ভাল। বলেই চাইলেন শম্ভুবাবুর দিকে।

শম্ভুবাবু বললেন, কোন অসুবিধে নেই। আমরা জিওলজিক্যাল কিটস তৈরি করেছি। তার মধ্যে আছে নানারকম পাথরের নমুনা। জনশিক্ষার জন্যেই এসব করা। মাননীয় মন্ত্রী চাইলে, সে ধরনের প্রোগ্রামও আমরা নাগাল্যাণ্ডে নিতে পারি। তাতে আমাদের কাজ আরও সহজ হবে। আমরা বেশি করে স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতা চাই।

মিঃ ল্যাঙ্গ আমাকে বললেন, আপনার পরিকল্পনাটা ভালো। আসলে এ ধরনের জনশিক্ষাই আমাদের দরকার। কলকাতায় ফিরে গিয়ে এ বিষয়ে আমাকে বিশদ জানালে খুশি হবো।

আমি বললাম, অবশ্যই আপনাকে জানাবো।

আমাদের মিটিং শেষ হলো এগারোটায়। আর তারপরই আবার পথ চলা। ২৫৮ কিলোমিটার পার্বত্য পথ। শুনলাম, সে পথের ধারে তথাকথিত অনেক হোস্টাইল নাগাদের গ্রামও পড়বে।

চোদ্দ

আওয়ার পিপ্‌ল ওয়ার ইন স্লামবার। নাও দেয়ার আইজ্‌ আর ওপেন্‌।

কিফ্‌রে যাওয়ার পথে গেঙ্গা ল্যাঙ্গের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল তাঁর অফিস ঘর। যতক্ষণ আমরা সবাক ছিলাম, আমাদের সামনে নিজের আসনটিতে তিনি নিশ্চুপ বসেছিলেন। পাথরের মূর্তি। আত্মমগ্ন। ধ্যানস্থ যেন। আমরা যখন নিশ্চুপ হয়েছিলাম, তখনও তিনি পাথরের মূর্তির মতই বসেছিলেন কিছুক্ষণ। তারপরই তাঁর প্রথম সংলাপ: আওয়ার পিপ্‌ল ওয়ার ইন স্লামবার। নাও দেয়ার আইজ্‌ আর ওপেন্‌।

তাঁর এই কথায় আমরা চমকেই উঠেছিলাম। ঝড়ের সংকেত?

না। ঝড় নয়। নাগাল্যাণ্ডের বৈষয়িক উন্নতির জন্যে জিওলজি-ক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার কাছ থেকে তিনি যা আশা করেন, কোন রকম ভণিতা না করে শুধু সেটুকুই বলে গেলেন তিনি।

—উই নিড রোডস্‌, পাওয়ার অ্যাণ্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচারস ফর ইনডাসট্রিজ্‌।

শম্ভু সেন তাঁর এই কথায় মন্তব্য করলেন, কেন? তুয়েংসাং জেলার নিমিতে পাওয়া গেছে বিরাট চুনা পাথরের স্তর। একশ' মিটার পুরু, দশ কিলোমিটার লম্বা। এত যেখানে চুনা পাথর, সেখানে বেশ বড়সড় একটি সিমেন্ট কারখানা তৈরি করাটা কিছু অসম্ভব নয়।

জানি। নিমির চুনা পাথর খুবই উৎকৃষ্ট। কিছু দিন আগে একজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ আমাকে বলেছিলেন, নিমির চুনা পাথর এত বেশি উৎকৃষ্ট যে তা দিয়ে সিমেণ্ট তৈরি করতে গেলে তার সঙ্গে কিছুটা খাদ মিশিয়ে নিতে হবে। কিন্তু বড়সড় একটা সিমেণ্ট কারখানা গড়তে গেলে তো প্রচুর বিদ্যুৎশক্তি দরকার। সেটা আসছে কোথেকে? পালটা প্রশ্ন করেছিলেন মিঃ ল্যাঙ্গ।

দোইয়াং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। যার উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে আশি মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ সেখান থেকে পাবেন।

জিওলজিক্যাল সার্ভে এই কেন্দ্রটির স্থান নির্বাচনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে, তার জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ। কিন্তু সেই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হতে দরকার আরও সাত আট বছর। এত দিন আমরা কি তা হলে বসে থাকবো? জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হোক, আপত্তি নেই। সেই সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিছু তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরিরও তো ব্যবস্থা করা যেতে পারে? নাগাল্যাণ্ডে কয়লার তো অভাব নেই। আপনারা তা প্রমাণ করেছেন। মাঝখানে অবশ্য দেশের আইনমত কোল ইনডিয়া এসে হাজির হচ্ছেন। আপনাদের তথ্য তাঁরা যাচাই করবেন, তারপর ঠিক করবেন কোন কোন কয়লা খনি এলাকায় তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসানো সম্ভব। এত সব করতে সময় দরকার প্রচুর। তার চেয়ে এ কাজটা জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়াই তো করতে পারেন? তাতে সময় বাঁচবে অনেক। নাগা-ল্যাণ্ড হ্যাজ রাইট টু রিকোয়েস্ট অ্যাজ এ স্পেশাল কেস টু স্টাডি, এসটিমেট অ্যাণ্ড প্রুভ্ হার কোল ডিপোজিট বাই জি এস আই। আওয়ার পিপ্ল আর ভেরি মাচ কীন্, দে আর ভেরি মাচ কনসারন্ড···।

কোন অনুকম্পা নয়। মিঃ ল্যাঙ্গের কথায় এটাই বুঝেছিলাম, নাগাল্যাণ্ডের মানুষ প্রস্তুত। তাঁরা খাটতে চান। অহেতুক নিয়মতান্ত্রিক বিধানের দাস হয়ে কালক্ষেপণ করতে রাজি নন।

রাজি যে নন, কোহিমা শহরের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে চলতে গিয়ে তা বোঝা গেল। মূল শহর তো বটেই, আশেপাশে তৈরি হচ্ছে উপনগরী। গড়ে উঠছে আধুনিক ঘরবাড়ি, দোকানপাট, ছোট বড় কারখানা। এখানকার কুটির শিল্প অনবদ্য। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে নাগাল্যাণ্ডের মানুষ কোহিমাকে সাজিয়ে তুলছে। এই শহরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্যে কাজ করে চলেছে।

শহর ছেড়ে আবার ডিমাপুরের পথে গিয়ে পড়লাম আমরা। আমাদের কনভয়। প্রথমে আমাদের গাড়ি, তারপর মিঃ কাকের। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তাঁর সহকারী মিঃ বরুয়া। পেছনে তিনটি জিপে বাকি সব।

মিনিট দশেক পথ এগোতেই ডঃ শ্রীবাস্তব বললেন, এবার কিছুটা ঘুর পথে যেতে হবে আমাদের। সামনে রাস্তা তৈরির কাজ হচ্ছে। তাই ঘুর পথে যাওয়া।

এদিকের পথ আরও কিছুটা দুর্গম। এক একটি পাহাড়, তার ওপর আর একটি পাহাড়। মাঝে মাঝে তাদের চূড়া ত্রিভুজের ডগার মত আকাশের দিকে উঠে গেছে। পাহাড়ের গা ঘেষে পথ। দুর্গম পথ। বড় বড় গাছওয়ালা অরণ্য বলতে যা বোঝায়—তেমন কিছু নেই। নাগাল্যাণ্ডে বৃষ্টি হয় প্রচুর। তবে সেটা বর্ষার সময়। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর, কি বড় জোর অক্টোবর পর্যন্ত। ওই সময় শুধু কোহিমাতেই বৃষ্টির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ১৯৪৩ মিলিমিটারের মত। তখন পাহাড় বেয়ে ঝরনা নামে অজস্র। কিন্তু এখন—যদিও এটা

এপ্রিল মাস—বর্ষার এখনও দেখা নেই। চারদিকে রুক্ষ পাথরের স্তূপ। তার ওপর রুক্ষ মাটি। মাটির ওপর ঝোপঝাড়। পথে লোকজন চোখে পড়ে না বললেই চলে।

কোহিমা থেকে প্রায় পঞ্চান্ন কিলোমিটার দূরে ছোট্ট একটি শহর। কেক্রিমা। শহর না বলে বরং বলি গ্রাম। নাগাদের গ্রাম। জীবন এখানে শ্লথ। এখানেও চায়ের দোকান আছে। আছে পান সিগারেটের দোকান। পথের ওপর পুরুষদের ভিড়ই বেশি। ওরা শ্রমিক। কেউ কাঠ সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে। কেউ চলেছে বাজারে। সওদা বিক্রি করতে। কেক্রিমার কিছু দূরে পড়ল আব একটি ক্ষুদে শহর চক্রাবেবা। চক্রাবেরার পর ফুটসেরো।

ডঃ শ্রীবাস্তব বললেন, নাগাল্যাণ্ডের এটাই উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ।

কথাটা কানে যেতেই গায়ের ভেতরটা সিরসির করে উঠল। ফুটসেরোর কথা আগে শুনেছিলাম। শুনেছিলাম, এখানকার নাগারা নাকি এক সময়ে বিদ্রোহী হিসেবে নামাঙ্কিত হয়েছিল। রিবেল। 'রিবেল'ই তখন ছিলো তাদের পরিচর।

বলেন কি, ডঃ শ্রীবাস্তব ? আমরা তো তা হলে একটা সাংঘাতিক জায়গা দিয়ে চলেছি। মনেব উত্তেজনা রাখতে না পেরে বলেই ফেললাম আমি।

আমার কথায় নাটকীয় ভঙ্গিতে আমার দিকে চোখ মটকিয়ে শম্ভুবাবু মন্তব্য করলেন, হ্যাঁ, খুব সাবধান! ভাবটা এমন, ঠাকুমা যেন দুরন্ত নাতিকে বর্গীর ভয় দেখালেন।

হো হো করে হেসে উঠলেন ডঃ শ্রীবাস্তব। রাস্তার পাশে কিছু দূরে হাতের ইঙ্গিতে বললেন, ওই যে, আপনার সেই সাংঘাতিক মানুষরা।

তাঁর ইঙ্গিতে সামনের দিকে চাইতেই দেখি জন পাঁচেক পুরুষ। প্রত্যেকের পরনে খাকির হাফ প্যান্ট। একজনের গায়ে গাঢ় লাল রঙের চাদর। অবশিষ্টদের খালি গা। গায়ের রঙ তামাটে। মাথায় ছোট ছোট চুল। খুব যে লম্বা তা বলব না। প্রত্যেকের সঙ্গেই একটি বন্দুক।

আমাদের গাড়ি তাদের কাছাকাছি হতেই তারা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রাস্তার এক পাশে সরে দাঁড়ালো। মনে হলো, পলকে দেখে নিলো একবার আমরা কারা।

ডঃ শ্রীবাস্তব বললেন, ওদের 'উইশ' করুন। বলেই নিজের সারা মুখে উচ্ছ্বাসভরা হাসির প্রলেপ ছড়িয়ে ডান হাত নেড়ে 'উইশ' করলেন তিনি। —হ্যালো, হ্যালো! সব আচ্ছা হ্যায়।

আমরাও যন্ত্রের মত তাঁকে অনুসবণ করলাম।

দেখলাম লোকগুলি ত্বড়িৎগতিতে ঝুঁকে আমাদের গাড়ির সামনের দিকটা দেখে নিলো। তারপর মিলিটারি কায়দায় অ্যাটেনশন হয়ে স্যাল্যুট করল।

সব আচ্ছা হ্যায়। এবার আরও উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে স্যাল্যুট করার কায়দায় হাত তুললেন ডঃ শ্রীবাস্তব।

ওরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। ভাষা বুঝি না। তাই কী বলল জানি না। বয়েস আর কত হবে? পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে?

আমরা ওঁদের পেরিয়ে গেলাম।

এরা সব নাগা। এক সময় রিবেল ছিলো। এখন গ্রামরক্ষী। দেখলেন না, হাতে বন্দুক? বেশির ভাগই লোকাল মেড। রিবেলরা যাতে বাইরে থেকে না এসে এখানে কোন গোলমাল পাকায় সে দিকে লক্ষ রাখাই এদের দায়িত্ব। এর জন্যে এরা মাইনে পায়। আর

ওই যে দেখলেন লাল চাদর গায়ে একজন, ওই হলো এদের সর্দার। এরা বলে গাঁওবুড়া। বললেন ডঃ শ্রীবাস্তব।

অমন চিৎকার করে বললো কী ওরা? আমার প্রশ্ন।

বলল, ভালো, ভালো। কোন ভয় নেই। ভারী সরল মানুষ এরা, মশায়। কাউকে একবার বিশ্বাস করলে, তার জন্যে জীবন দেবে। তবে হ্যাঁ, ওই বিশ্বাস চাই। নইলে মুশকিল। দেখলেন না, আমাদের গাড়ি ওদের সামনে এলে কেমন নিচু হয়ে ওরা আমাদের গাড়ির সামনেটা দেখে নিল?

কেন?

দেখে নিল গাড়ির পরিচয় কী? গাড়ির সামনে অশোক স্তম্ভ বসানো। দেখেই বুঝলো, এ একেবারে ভারত সরকারের ব্যাপার। অতএব ফ্রেণ্ড। বুঝলেন কী না, মশায়। নাগাল্যাণ্ডে আর কারোর অসুবিধে হতে পারে, জিওলজিস্টদের কোন ফ্যাসাদ নেই। দে আর অল আওয়ার ফ্রেণ্ডস। পুকপুরে গেলেই দেখবেন, কেমন হাত মিলিয়ে ওরা আমাদের সঙ্গে কাজ করছে।

হঠাৎ মনে পড়লো, তাই তো? ডঃ শ্রীবাস্তব বললেন, ওরা গ্রামরক্ষী। তা সেই গ্রামটাই বা কোথায়? কিছু তো চোখে পড়ছে না। আমাদের ডান পাশটা পথের ধার থেকে খাড়াই ঢাল হয়ে নিচে নেমে গেছে। আর বাঁ দিকটা পাঁচিলের মত উঠে গেছে একেবারে আকাশ বরাবর। গ্রাম কোথায়?

কথাটা বলতেই ডঃ শ্রীবাস্তব জানালা দিয়ে মুখ বের করে বললেন, ওই যে, দেখুন, দেখুন। ঘাড়টা একটু উঁচু করুন। একেবারে আকাশের দিকে।

ঠিক। চোখে পড়েছে এবার। এতো বিরাট গ্রাম! পাহাড়ের

ওপরটা যেন চাতালের মত। বিরাট এলাকা জুড়ে। তার ওপর কাঠের দেওয়াল এবং খড়ে ছাওয়া পাশাপাশি অজস্র ঘরবাড়ি। কিন্তু আশ্চর্য মনে হলো, ঘর বাড়িই এত, মানুষ কই? না শোনা যাচ্ছিল কোন সাড়াশব্দ, একআধজন মানুষও চোখে পড়ল না।

এই গ্রামের নামই ফুট সেরো (Phut Sero), মিঃ কর। আপনাকে আগেই বলেছি নাগাল্যাণ্ড পার্বত্য অঞ্চলের এটাই হলো উচ্চতম স্থান। উচ্চতা সাত হাজার ফুট। কোহিমা থেকে এই গ্রামটির দূরত্ব পঁয়ষট্টি কিলোমিটার। এটাই নাগাল্যাণ্ডের বৃহত্তম গ্রাম। কেমন দেখছেন? পরিবেশটা সুন্দর, না? এপ্রিলের এই গরমেও এখানে কেমন শীত শীত ভাব। বললেন ডঃ শ্রীবাস্তব।

তা না হয় হলো। কিন্তু লোকজন তো দেখছি না? আমার প্রশ্ন।

নাগাল্যাণ্ডের বাইরে থেকে এলে এ সব বুঝবেন না কিছু। এমনিতে এ অঞ্চলের মানুষের চালচলন ভীষণ শান্ত। নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব বা আড্ডা দেবার সময়ও ওরা চিৎকার করে কথা বলে না। তবে এখন আমরা গ্রামটির পেছন দিক দিয়ে যাচ্ছি কী না, তাই লোকজন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। গ্রামের ভেতরে গেলে দেখবেন লোকজন আছে। তবে সবাই কিছু না কিছু কাজ করছে। মেয়েরা হয়ত গেছে জল আনতে। পুরুষরা ক্ষেতে ব্যস্ত। অথবা কাঠ কাটায়।

লক্ষ করলাম, রাস্তার পাশ থেকে পাহাড়ের গা খাড়া হয়ে উঠে গেছে প্রায় পাঁচ শ' ফুট। এমন খাড়াই যে, এ পাশের গা বেয়ে হাঁটা পথেও যে ওপরে উঠবেন তার জো নেই। একেবারে পাঁচিলের মত। তার গায়ে বড় বড় এক জাতের ঘাস এবং বন্য

ঝোপঝাড়।

পরে শুনেছি। দেখেছিও। ওদের এক একটি গ্রাম এইভাবেই তৈরি। গ্রামের জন্যে স্থান নির্বাচনের সময় ওরা বেছে নেয় এক একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়া। সেই পাহাড়ের প্রায় সব দিকটাই খাড়া পাঁচিলের মত চূড়ার দিকে উঠে এসেছে। শুধু এক দিকের ঢাল তুলনায় কিছুটা বেশি। পাহাড়ের চূড়া থেকে সেই ঢালের ওপর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সংকীর্ণ পথ। একটিই পথ। বাইরের জগতের সঙ্গে সেটাই গ্রামের যোগসূত্র। ওই পথ দিয়েই ওরা গ্রামের বাইরে যাতায়াত করে। যত রকম নিরাপত্তা এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে ওরা মাথা ঘামায়, তার বেশির ভাগই এই পথটুকুর জন্যে। কারণ ওরা জানে, শত্রুর পক্ষে পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে অন্য দিক থেকে গ্রাম আক্রমণ করা সম্ভব হয়ও যদি, সে কাজ খুবই কঠিন। গ্রামে ঢোকার একমাত্র সুযোগ ওই ঢালু পথ। অতএব সেটিকে জুতসই রাখা গেলেই ভাবনা কম।

নাগাল্যাণ্ডের বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে প্রচুর গ্রাম। তাদের সবারই অবস্থান প্রায় একই রকম। পাহাড়ের চূড়ায় যেন এক একটি দুর্গ। আছে নানারকম ট্রাইব এবং সাব-ট্রাইব। এক সময় তাদের মধ্যে মারদাঙ্গা লেগেই থাকতো। কখনও সামাজিক কারণে, কখনও নিরাপত্তার প্রয়োজনে। বেঁচে থাকার ধারাও ছিল ওই রকম। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে নরমুণ্ড সংগ্রহ ছিল বীরত্বের সূচক। যে পুরুষ যত বেশি নরমুণ্ড সংগ্রহ করতে সক্ষম হতো সে সুন্দরী ললনার কাছে পরম কাম্য হিসেবে পরিগণিত হতো। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে অনেক কিছুই পালটে গেছে। বাইরের জগতের সঙ্গে আদান-প্রদানের সুযোগ যেখানে যত বেড়েছে, সেখানে ওদের

জীবন ধারারও পরিবর্তন ঘটেছে।

পুরো পথটাই পর্বতবহুল। পাহাড়ের বৈচিত্র্য এদিকে কম। পাশাপাশি সাজানো সেই এক ধরনের পাথুরে ত্রিভুজ। শিলং-এর মত এদিকটা তেমন ঘন সবুজ নয়। বিরাট দুর্ভেদ্য অরণ্য বলতে যা বোঝায়, তাও নেই এদিকে। সব কিছুই একঘেয়েমিতে ভরা।

একঘেয়েমি শুধু কি চারপাশের প্রকৃতিতেই, এই পথ চলাতেও কি নয়? ইতিমধ্যে ফুট সেবো থেকে উৎরাই পথে আমরা প্রায় হাজার দুই ফুট নিচে নেমে এসেছি। কখনও চার হাজার, কখনও পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পার্বত্য পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। সে পথ কখনও একই পাহাড়ের চারপাশে ঘুরছে একবার, দুইবার, কখনও তিনবার। আর এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে নিচে নামছি, ওপরে উঠছি। এপ্রিলের শেষ। বর্ষার দেখা নেই। তাই ভৌগোলিক উচ্চতা থাকা সত্ত্বেও যতই বেলা বাড়ছিলো, সেই সঙ্গে গরমও লাগছিলো খুব।

পথ চলার একঘেয়েমিতা দূর করার জন্যে মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে আমরা পায়চারি করছিলাম। আর সেই সঙ্গে ডঃ শ্রীবাস্তব এবং শম্ভুবাবু নাগাল্যাণ্ডের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

শম্ভুবাবু বললেন, মন্ত্রী মিঃ ল্যাঙ্গের কথাটা কিন্তু ঠিক। নাগা-ল্যাণ্ডের ওখা জেলায় দোইয়াং নদীর মুখে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানকার ভূতাত্ত্বিক গঠন এমন, আমাদের যথেষ্ট সতর্কতা নিয়ে আরও অনুসন্ধান করা দরকার। জানেন তো, এ সব ভূমিকম্প অধ্যুষিত এলাকা?

হ্যাঁ, নাগাল্যাণ্ডের মানুষের কাছে ওখা স্বপ্ন বৈকি।

জেলার নাম ওখা। জেলা শহরের নামও ওখা। নাগাল্যাণ্ডের

পশ্চিমের কিছুটা অঞ্চল নিয়ে এই ওখা জেলা। এর উত্তর এবং পশ্চিমে আসাম সীমান্ত। কোহিমায় দাঁড়ালে ওদিকটা পড়বে দক্ষিণে। পুব দিকে জুনহেবোটো এবং মকোকচাং জেলা।

ওখার উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে যান। নাগা পর্বতমালা সেদিকে ক্রমে ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে আসামের সমতল অঞ্চলে। দক্ষিণে পড়বে এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়। এসব জায়গা ঘন জঙ্গলে ভরা। বন্য প্রাণীর বিচরণ ক্ষেত্র। ওখায় দেখতে পাবেন তিন রকমের ভূস্তর। ভূতাত্ত্বিকদের ভাষায় যাদের বলা হয় দিশাং গ্রুপ, বারিল গ্রুপ এবং তিপম গ্রুপ। দিশাং গ্রুপে পাবেন শেল এবং মাটি বা ক্লে-ঘটিত বেলেপাথর। বারিল গ্রুপও বেলেপাথর। তবে তার দানাগুলি খুবই সূক্ষ্ম এবং সে দানার মধ্যে মিশে রয়েছে কার্বন কণা। তিপম গ্রুপও বেলেপাথর। এর দানাগুলি মোটা এবং লোহা মিশ্রিত।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অনেক কিছুই খুঁজে পেয়েছেন এই জেলায়।

শম্ভুবাবু মাঝে মাঝে তার বিবরণ দিচ্ছিলেন। আর আমি শুনছিলাম।

শম্ভুবাবু বলছিলেন, এই জেলার নাগাফুটহিলস-এ আমরা কিছু কিছু ক্লে-র সন্ধান পেয়েছি। তবে হ্যাঁ, কয়লা আছে প্রচুর। কয়লা পাওয়া গেছে লাখুনতির পূর্বে এবং উত্তর-পূর্বে, চেতমহান, চিনচুং, জোলুখান এবং স্যাবত্‌পেবচু নদীর ধারে। কয়লা পাবেন মেকুলা, আকুক, চামপাং-এর পশ্চিমে এবং একব্‌ত্‌চুরো ও সারামপান জল-ধারার কাছে। দোইয়াং উপত্যকায় কাচ তৈরির বালির সন্ধানও পেয়েছি আমরা। বেশ কয়েক জায়গায় ভূস্তর থেকে তেল চোয়াচ্ছে

তাও দেখেছি।

আপনি পেট্রোলিয়ামের কথা বলছেন? আমার প্রশ্ন।

অবশ্যই পেট্রোলিয়াম। ইমেনচে, ওখা-মেরাপানি পথের যেখানে বত্রিশ মাইল নির্দেশক পোস্টটি রয়েছে, সেখানে, ইমপাং ও লাখুনটির মাঝামাঝি এক জায়গায়, সেরি গ্রাম, মেকুলা গ্রাম, এসব জায়গার মাটিতে তেলের চিহ্ন দেখেছি আমরা। সম্প্রতি তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন নাগাল্যাণ্ডে তেলের সন্ধানে ড্রিলিং-এর কাজও শুরু করেছে।

অথবা ধরুন মোকোকচাং জেলা। এটা নাগাল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চল। যার উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমে আসাম। দক্ষিণ-পশ্চিমে ওখা, দক্ষিণে কোহিমা এবং পূর্বে তুয়েংসাং জেলা। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে জেলাশহর মোকোকচাং-এর চারপাশে। এটি পূর্বাঞ্চলের একটি স্বাস্থ্যনিবাসও বটে। মারিয়ানি থেকে জাতীয় সড়ক অথবা উত্তর সীমান্ত রেলের আমগুরি স্টেশনে নেমে এখানে যেতে পারেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ছড়িয়ে রয়েছে লম্বা ফালির মত ছোটবড় পাহাড়। বৃষ্টি পড়ে যথেষ্ট। কিন্তু সে জল দাঁড়িয়ে থাকার মত হ্রদ বা অনুরূপ আর কিছু না থাকায় বছরের অন্যান্য সময় পুরো পরিবেশটাই শুকনো হয়ে দাঁড়ায়। পাহাড়ের গা দিয়ে জল ঝরে। সেই জল উত্তর-পশ্চিমে গড়িয়ে এসে ক্রমে ক্রমে ধনশ্রী নদীতে গিয়ে মেশে।

মোকোকচাং জেলার বারিল শ্রেণীর ভূস্তরে পাওয়া গেছে ক্লে। বিশেষ করে চাংকিকং-জাপুকং এলাকায়। ওই একই এলাকায় কয়লাও আছে। কয়লা পাওয়া গেছে ওযারোমং-মংচেন এবং মিরিমকপো এলাকায়। তবে নিম্নমানের কয়লা। ডুবুইয়া, লংসেমতাং

এবং আরও কয়েকটি অংশে বেশ কিছুটা পেট্রোলিয়াম আছে বলেও ইদানীং সন্দেহ করা হচ্ছে। কিন্তু ওই একই সমস্যা। পাওয়ার। অর্থাৎ শক্তি। এবং রাস্তা। যতই প্রাকৃতিক সম্পদ থাক পথ না থাকলে তাদের আদান-প্রদান চলে না। আর শক্তি না থাকলে তাদের নিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব নয় শিল্প উদ্যোগ।

শম্ভুবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, আসামের মত এদিকেও কি ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় না? যা দিয়ে অন্তত তিন থেকে পাঁচ মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কবা যেতে পারে?

সে চেষ্টাও চলছে। আপনাকে তো বলেছি, মিঃ কর, আমাদের জিওটেকনিক্যাল ডিভিসন আছে। সেই ডিভিসন এই জেলার নান্নুং নালা, মেলকা নালা, লুংগমাক নালা এবং ডিবু নদীতে ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে খুদে বিদ্যুৎ উৎপাদন তৈরি করা যায় কী না, সেটা খতিয়ে দেখছে। এসব অঞ্চলের ভূস্তরের যা গঠন, তাতে মনে হয় হতেও পারে। খুশি হবেন টুলির কাগজের মণ্ডের কারখানার স্থান নির্বাচনের ব্যাপারেও আমরা কাজ করেছি। বললেন শম্ভুবাবু।

মন আর একটি জেলা। আয়তনে খুবই ছোট। আগে ছিলো তুয়েংসাং-এর মধ্যে। সম্প্রতি তৈরি হয়েছে। বার্মার পুব দিকে তুয়েং-সাং জেলার পশ্চিম এবং দক্ষিণ ঘেঁষে অবস্থিত এই জেলার উত্তর-পূর্বে আসাম এবং অরুণাচল। এই জেলার পাললিক শিলার বয়েস ছয় থেকে এগারো কোটি বছর। এই জেলাতেই রয়েছে বিখ্যাত সেই ডিকু উপত্যকার কয়লাখনি। সাধারণের কাছে যার পরিচয় নাজিরা-বেজান। খুব পুরনো কয়লাখনি এলাকা এটা। যা আজও নাগা-ল্যাণ্ডকে কয়লা সরবরাহ করে চলেছে। এ সব কয়লা বারিল শ্রেণীর

ভূস্তরে পাওয়া গেছে।

শুনলাম এই এলাকায় আরও দুটি কয়লাখনি রয়েছে। একটি কিছুটা নিচু এলাকায়। নাম ওয়াকতিং কয়লাখনি। আর একটি উঁচু অঞ্চলে। কোংগান কয়লাখনি হিসেবে যার পরিচয়। জিওলজিক্যাল সার্ভের হিসেব মত কোংগানে কয়লা রয়েছে এককোটি টনের মত। আর বোরজানের কথা তো আগেই বলেছি। এখানকার পুরো এলাকায় প্রায় সাড়ে পাঁচকোটি টনের মত কয়লা রয়েছে।

কথা বলতে বলতে আমরা সিজামি গ্রাম পেরিয়ে গেলাম। ডঃ শ্রীবাস্তব বললেন, এটা নাগাল্যাণ্ডের খুব পুরনো গ্রাম। এ গ্রামের মানুষ হাতের কাজে খুব পোক্ত। সময় তো কম, নইলে গ্রামটি একবার ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিতাম আপনাকে।

গাড়ির জানালা দিয়ে একবার বাইরে উঁকি মারলাম। লাভ হলো না। নাগাদের গ্রাম মানে তো পাহাড়ের ডগা। পাহাড়ের পাশ দিয়ে যেন খাড়াই পাঁচিলের গা বেয়ে আমাদের গাড়ি চলেছে। গ্রাম তো সেই পাঁচিলের মাথায়। ঘাড় উঁচু করে তার পেছন দিকের ঘরবাড়ির কিছু অংশ শুধু দেখতে পেলাম। এই যা।

বললাম, তুয়েংসাং-এর কথা কিন্তু শোনা হলো না।

আরে শুনবেন, শুনবেন। আমরা তুয়েংসাং-এই যাচ্ছি। কিফ্‌রে? সেটাই তো তুয়েংসাং-এর একটি সাবডিভিসন। দাঁড়ান, আমরা বোধহয় জেস্নামিতে এসে গেলাম। হ্যাঁ, ঠিক। ওই যে। বাঁ দিকের ওই পাহাড়ের ওপরটা লক্ষ করুন। বাড়িঘর দেখছেন তো? দূরে একটি পাহাড়ী শহরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ডঃ শ্রীবাস্তব। —হেঁ, হেঁ, মশায়। নাগাল্যাণ্ড আমার চেনা। কম ঘুরছি এখানে? লোকে বলে 'পীপল্ আর হোস্টাইল হেয়ার।' আমি

কোমাং এব মিজি মেয়ে

পুকপুবে নাচেব পোশাকে নাগা মানুষ

বিশ্বাস করি না। শুধু কতকগুলি নিয়ম মেনে চললেই হলো। এক নম্বর হলো, ওদের কোন মেয়ের দিকে খারাপ চোখে চাইবেন না।

তাঁর কথায় মৃদু হাসলাম। বললাম, এটা এমন আবার কি বিশেষ ব্যাপার। ভারতের কোথায় এ ব্যাপারে মানুষের সমর্থন আছে? মনে পড়ল মেঘালয়ের সেই বর্ষীয়ান ভদ্রলোকের কথা: পৃথিবীর বড় বড় রক্তারক্তি কাণ্ড তো ওই টাকা আর মেয়েমানুষকেই নিয়ে—এ তো মানব সভ্যতার অতি প্রাচীন ঘটনা।

মনে হয়েছিল জেসামি বুঝি আরও অনেক দূর। কিন্তু সামনের পাহাড়ের গায়ে তিনটে চক্কর মারতেই—ও মা! আমরা তো একেবারে খোদ লোকালয়ের মধ্যে। একেবারে পাঁচ হাজার ফুট পাহাড়ের ডগায়।

ডঃ শ্রীবাস্তব অনেকক্ষণ কথা বলে যাচ্ছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে শম্ভুবাবু আমার পাশে নিশ্চুপ বসেছিলেন। ভেবেছিলাম, হয়ত ঘুমিয়েই পড়েছেন তিনি। তা ওঁর আর দোষ কি! কোহিমা থেকে জেসামি তো কম পথ নয়? প্রায় ১৩১ কিলোমিটার। শম্ভুবাবুর একবার নাকডাকার শব্দও শুনেছিলাম যেন।

স্যার মনে হচ্ছে আউট। নাক ডেকেছে। কৌতুক মেশানো গলায়—বলতে পারেন প্রায় ফিস্ ফিস্ করেই কথাটা বললাম ডঃ শ্রীবাস্তবকে।

হায় ভাগবান! সঙ্গে সঙ্গে কানের পাশে শম্ভুবাবুর গুরুগম্ভীর গলা।—নাক ডেকেছে! শম্ভু সেনের নাক ডাকে, শম্ভু সেন চোখ বুঁজে ঘুমোয়। কিন্তু তার কানটি জেগে থাকে। সিঙ্গামি—তাই না? সিঙ্গামি গ্রামটি ঘুরে দেখার শখ হয়েছিলো, তাই তো?

সর্বনাশ। আপনি জেগে ছিলেন নাকি? তাহলে তো আমাদের কথাও শুনছিলেন?

কেন? গোপন কথা তো কিছু ছিলো না? বলছি না, শম্ভু সেনের চোখ বোজা থাকলেও কান থাকে খোলা। হা—হা—হা! আমরা তা হলে জেসামিতে এলাম। ফার্স্ট ক্লাশ। নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন। সুন্দর জায়গা। অ্যাণ্ড নাও উই আর অ্যামাঙ্গ দ্য নাগাজ।

মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল, শম্ভুদা'।

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে ক্যাচ করে নিলেন তিনি। বললেন, সেই ভাল। শম্ভুদা'। আমিও সমরজিৎ বলেই ডাকবো। মুশকিল হয়েছে, আমাদের এখন দুই সমরজিৎ। সমরজিৎ কর আর সমরজিৎ চক্রবর্তী। ঠিক আছে একটা কম্প্রোমাইজ করা যাবে।

বলেই একেবারে ক্যামেরা বাগিয়ে নেমে পড়লেন তিনি। নেমেই শুরু হল ক্লিক্ ক্লিক্। জানতাম জি এস আই-এর তিনি ডেপুটি ডাইরেক্টার জেনারেল। জানতাম না, ফটোগ্রাফিতেও তিনি এক নম্বর।

আমাদের পেছনে ততক্ষণ কাজেব সাহেব এবং মিঃ বরুয়াও এসে দাঁড়িয়েছেন। এসে গেছেন সমরজিৎ চক্রবর্তী এবং অজিতবাবু। সমরজিৎ চক্রবর্তীর চোখের পাতা বেশ ভারী ভারী ঠেকলো। মানে পথ চলতি নিদ্রা দেবীর স্পর্শ। অজিতবাবু রীতিমত ম্যান অভ্ অ্যাকশন তখন। হাতে ক্যামেরা। দুই কাঁধে দুই ক্যামেরা। মুভি, রঙীন এবং সাদা কালো ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। কমলবাবুও ছিলেন সঙ্গে। তিনিও ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

গাড়ি থেকে নামতেই মনে হলো জায়গাটা দার্জিলিং-এর মলের মত। পাহাড়ের মাথায় যে বিছানো রয়েছে একটি মেঝে। তার

ওপর ছড়িয়ে রয়েছে দোকানপাট। তবে মলের মত অত জাঁকালো নয়। বরং পরিবেশটা কতকটা দার্জিলিং রেল স্টেশনের সামনে যেমন দেখায়, তেমন। কাঠের ঘর। ঘিঞ্জি দোকান। এটা সাবডিভিসন শহর। অতএব লোকারণ্য। ট্রাক এবং গাড়ির ভিড় লেগেই আছে। দোতলা তিনতলা বাড়ি। পরনে প্যাণ্ট এবং কালো চাদর গায়ে দশ বারোজন নাগা এক একটি দল বেঁধে বসে কোথাও গল্প করছে। এক পাশে নাগা মেয়েরা। রাস্তার ধারে বিছিয়ে বসিয়েছে দোকান। কাঁচা লঙ্কা, স্কাম, বন্য ফল, আনাজ। ছোট ছোট থোকে সাজানো। ওজন বলে কিছু নেই। যাতে হাত দেবেন, সব এক দাম। মানে এক টাকা।

জাম দেখে লোভ হলো। একটি মেয়েকে বললাম কত দাম ? হিন্দীতেই বললাম।

মেয়েটি হিন্দী জানে না। আমাদের কোন ভাষাই জানে না। একটা আঙ্গুল দেখালো শুধু।

মানে এক টাকা!

একটা টাকা দিয়ে এক থোকা জাম তুলে নিলাম। কিন্তু তার-পরই ফ্যাসাদ। জামের সঙ্গে কিঞ্চিৎ নুন এবং এক আধটা লঙ্কা না হলে জাম খাওয়ার আমেজটাই তো মাটি হয়। তা থোকা থোকা লঙ্কা নিয়ে তো বসেছে পাশে আর একটি মেয়ে। মেয়ে না বলে মহিলাই বলি বরং। বছর তিরিশ বয়েস। কোলে একটি মিষ্টি ছেলে। প্যাট প্যাট করে আমাদের দিকে চেয়ে।

মহিলাটি বোধ হয় আমার হাবভাবে ব্যাপারটা বুঝলো। সঙ্গে সঙ্গে এক গোছা কাঁচা লঙ্কা তুলে দিল আমার হাতে।

বললাম, দাম ? কথা শুনে তো হেসেই অস্থির।

ইঙ্গিতে জানালো, দাম দিতে হবে না।

কেমন কিন্তু কিন্তু মনে হলো আমার। এরা দরিদ্র। পয়সার প্রয়োজনে ব্যবসা করতে বসেছে। পয়সা না দিয়ে সওদা নিই কী করে? পাঁচ ছয়টা লঙ্কা। তবু সওদা তো? আমি জোর করে তার হাতে চার আনা পয়সা গুঁজে দিতে গেলাম। সে-ও জোর করে আমার হাতটি ধরে সরিয়ে দিলো। তার সারল্য এর পর আর ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

নুন?

তাও পেলাম একটি দোকানে। দোকানী ভাগলপুরের মানুষ। বেশ কয়েক বছর হলো জেসামিতে দোকান খুলে বসেছে। দোকানে যেতেই বলল, বাবুজী, একটু নিমক নেবেন, তার পয়সা কি?

তারপর জামে কামড়। এবং শিববাম চক্রবর্তীর সেই সাহেবকে আম খাওয়ানর ব্যাপার। যিনি আমে একটা কামড় দিয়েই এমন লাফিয়ে উঠেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত সিলিং ফ্যানে আটকে গিয়ে তাঁকে বন বন করে পাক খেতে হয়েছিল। তবে তাতে তাঁর লাভও হয়েছিল। পাকের প্রচণ্ড ঠ্যালায় তাঁর পুরনো বাত সেরে যায়। আমরা অবশ্য কেউ বেতো রোগী নই। তবে জামে কামড় বসাতেই মনে হলো, দাঁত থেকে একটা প্রচণ্ড বিদ্যুতের শক গিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে একটা হুল ফুটিয়ে দিয়েছে।

হু হাঁ ফাঁফি করে আমি বললাম, টেরিবল্।

সঙ্গে সঙ্গে ডঃ শ্রীবাস্তব·আমার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করলেন, ডোন্ট থ্রো। ওদের আত্মসম্মানে লাগবে। বলে মেয়েটির দিকে এমন ভঙ্গী করলেন, যেন কত সোয়াদ নিয়ে তার জাম উপভোগ করছেন তিনি।

শম্ভুদা বললেন, যত্ন করে রেখে দাও। কাজে লাগতে পারে।

তাঁর কথায় তাই করেছিলাম। পরে কাজেও লেগেছিল। কিফ্‌রের পাহাড়ে পথের ধকলে মাঝে মাঝে যখন গা গুলিয়ে উঠছিল, তখন নুন-লঙ্কা সহ এক একটি জামে জিভ ভিজিয়ে সমস্যার সমাধান করেছিলাম।

এই জেসামিতেই প্রথম দেখলাম কুকুরের রোস্ট। কুকুর নাগাদের কাছে উপাদেয় সামগ্রী। এর জন্যেই পথেঘাটে এ পর্যন্ত কোন কুকুর দেখি নি। এখানে দেখলাম, এক বাড়ির চত্বরে চারপাঁচজনে মিলে আস্ত একটা কুকুর রোস্ট করছে।

একটা দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো কয়েকটি ছেলে। সুন্দর চেহারা। সাহেবী পোশাক। আলাপ করে জানলাম, ওরা সব হাই স্কুলে পড়ে। ইংরেজীতেই কথা হলো। এমনিতে ব্যবহার খুব বিনয়ী। কিন্তু সেই ভর দুপুরেও তাদের মুখ দিয়ে বেরোচ্ছিল ভক্ ভক্ রসের গন্ধ। মানে দেশী মদ। তবে কোন বেচালতা নেই তাদের মধ্যে। ওরা বলল, পড়াশুনা করে ওরা চাকরি করবে।

আর এক দিকে দাঁড়িয়ে একদল তরুণী। কালো চাদর গায়ে। সেই লাল বর্ডার দেওয়া চাদর। পরনেও তাই। রীতিমত রোমান্টিক। তাদের সরল সৌন্দর্য শহর কলকাতায় আমরা ভাবতেই পারি না। কোন জড়তা নেই। চালচলনে। 'একসেস'ও নেই। ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। ঘরসংসারের কথা। মুক্ত পৃথিবী সম্পর্কে ওরা স্বপ্ন দেখে। প্রচণ্ড কর্মঠ। বড় ভাল লাগলো ওদের ব্যবহার।

পর পর তিনটে ট্রাক এসে দাঁড়ালো। মিলিটার, উর্দি পড়া বছর আঠারো কুড়ির ছেলেরা নামল ট্রাক থেকে। হাতে অটোমেটিক রাইফেল, স্টেন গান। সবাই নাগা। কী প্রচণ্ড ক্ষিপ্র তাদের

চালচলন। পরে শুনেছি, এদেব অনেকেই এক সময় 'রিবেল' ছিলো। এখন শান্তিবাহিনীর লোক।

জেসামিতে ছিলাম ঘণ্টা তিনেক সময়! আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা হয়েছিল সেখানকার সেনাবাহিনীর ক্যান্টিনে। লাঞ্চ সেরে কিফরের পথে যখন যাত্রা করলাম ঘড়িতে তখন প্রায় চাবটে।

পনেরো

নাগারা যেন স্বতন্ত্র মানুষ। প্রচণ্ড স্বাধীনচেতা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মানুষের মুণ্ডু শিকার প্রভৃতি এক সময় ওদের সামাজিক রীতিনীতি হিসেবে পরিগণিত ছিল ঠিকই, এসব বাদ দিলে মানুষ হিসেবে ওরা নিতান্তই সরল। এবং শান্তিকামী। বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য রেড রিভার অ্যাণ্ড দ্য ব্লু হিলস' এর লেখক হেম বড়ুয়া নাগাদের কথা লিখতে গিয়ে এ ধরনেরই মন্তব্য করেছিলেন এক সময়।

কেন ওদের নাগা বল হয়? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মানব বিজ্ঞানী ফন ফুরের-হাইমেনড্রফ। তিনি লিখেছেন, সঠিক উত্তর দেওয়া শক্ত। পাহাড়ে বাস করে বলেই হয়ত তাদের বলা হয় নাগা। অনেকে আবার নাগা বলতে মনে করেন উলঙ্গ মানুষ।

শেষোক্ত এই ব্যাখ্যাটি কীভাবে এলো জানি না। কারণ এখনও পর্যন্ত নাগাল্যাণ্ডের যতটুকু দেখেছি, সেখানে পুরোপুরি উলঙ্গ হয়ে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখি নি।

প্রবাদ? হ্যাঁ, তাও আছে অনেক। যেমন ধরুন, আঙ্গামীদের কথা। খেজেখেনোমা একটি গ্রামের নাম। এক সময়ে সেখানে ছিল একটি বিরাট পাথর। আঙ্গামীরা মনে করে সেই পাথরের ভেতর থেকেই একদিন নাকি তাদের জন্ম হয়েছিল। তারপর দিন যায়। সেই গ্রামে জন্মালো তিন ভাই। ভাইয়েরা বড় হয়ে ধান চাষ করতে শুরু করল। রোজ তারা একটি পাথরের ওপর ধান শুকোতো সারাদিন। আব সন্ধের সময় সেই ধান তুলে আনতে গিয়ে দেখতো, এক বোঝা ধান দুই বোঝায় পরিণত হয়েছে।

এইভাবে বেশ দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ কি কারণে তিন ভাইয়েব মধ্যে বাঁধল ঝগড়া। ব্যাপার স্যাপার দেখে তাদের বুড়ো বাবা মা প্রমাদ গুণলো। তারা ভাবলো এর পর একটা অনাসৃষ্টি না বেঁধে যায়। একদিন তারা ছেলেদের অলক্ষ্যে সেই পাথরটি খড়কুটোয় ঢেকে নিযে আগুন ধরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে পাথর গেলে ফেটে। পাথরটির মধ্যে ছিল একটি দানব। এবার সে পাথরটি ছেড়ে চলে গেল। আর পাথরটিও তার মহিমা হারিয়ে ফেলল।

এবার ভাইয়েরা গেল আরও রেগে। তারা ঝগড়াঝাঁটি করে তিনজন তিন পৃথক গ্রামে গিয়ে বাস করতে লাগল। নাগাদের বিশ্বাস এদের ছেলেমেয়েরাই পরে আঙ্গামী, সেমা এবং লোটা হিসেবে পরিচিত হয়। আঙ্গামীরা নিজেদের বলে টেঙ্গিনা। এদের জনসংখ্যাই বেশি। এরা ভুট্টা, যব, সিম, ধান, কুমড়ো, শশা, লঙ্কা সরষে প্রভৃতি চাষ করে। কখনও পাটেরও চাষ করে। পাটের সুতো দিয়ে তৈরি করে কাপড়।

কোহিমায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি বললেন, মশায়, মজার দেশ এই নাগাল্যাণ্ড। বাইরে থেকে এদের

সম্পর্কে নানান বীভৎস গল্প শোনেন আপনারা। আপনি এসেছেন দু দিনের জন্যে। এত কম সময়ে একটা দেশের মানুষকে কি জানা যায়, না তাদের বোঝা যায়? ওদের বুঝতে গেলে ওদের ভেতরে যেতে হবে। নিজের মত করে ওদের সঙ্গে দু দিন কাটান। তবে তো বুঝবেন জাতটা কি মহৎ।

ভদ্রলোক বললেন, এই মিরি নাগাদের কথা ধরুন না। ওসব প্রবাদ টোবাদ ছেড়ে দিন। অনেকের বিশ্বাস ওরা এসেছিল ব্রহ্মদেশ থেকে। তারপর নানা ভাগে ওরা ভাগ হয়ে যায়। যেমন, সাংটং, চ্যাং, ইয়ামফি, ফোম, চাকিক কনিয়াক, আউসেট, ইয়েমসাম, ইত্যাদি। কি সুন্দর চেহারা এদের। ওই চ্যাংদের কথাই ধরুন না। ওদের পুরুষ, মশায়, যেমন লম্বা গড়ন, তেমনি মজবুত দেহ। আর বিউটি। কনিয়াক বিউটির কোথায় নজির পাবেন, মশায়? তামলু, ওয়ানচিং, ওয়াকচিং যান না। দেখবেন, এক একটি নাগা মেয়ে—ওরা কনিয়াক—একেবারে টপ সুন্দরী। আপনি তো পুকপুর যাবেন। সেখানে দেখবেন আউসেট নাগা। আপনার ভালই লাগবে। চাকিক নাগাও দেখবেন। ওরা বাস করে বার্মা পাহাড়ের কাছে। ভারী দুর্গম জায়গা। তিজু নদীর পাশ দিয়ে তো যাবেন—যাবেন কেন, তিজু পেরিয়েই যেতে হবে আপনাকে। তিজুর পশ্চিম তীরে দেখবেন সেমা নাগা। ডিকো নদীর কাছে বাস করে আউ নাগা। এদের আবার আটটা শাখা। লংখুম্র, চামী, আলং, পুমন, পাউছেন, লুংচা, উনামফু এবং লুমতো। মুখের গড়ন চীনেদের মত। পুরুষরা ভারী শক্ত। নেংটি পরে ঘুরে বেড়ায়। আর কোমরে 'দা'।

কিফরের দিকে যেতে যেতে সেই ভদ্রলোকের কথাই মনে পড়ছিল বারবার। জেসামিতে যাদের দেখলাম তারা তো পরিবর্তিত সংস্করণ।

শহরের পরিবেশে তারা তো কৃত্রিম।

কিফ্‌রেতে গিয়ে পৌঁছলাম সন্ধের কিছু আগে। ছোট্ট শহর। আমরা এখন তুয়েংসাং জেলায়। এখানে বসেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ছাউনি। সীমান্তরক্ষীরাই এখানকার জনতা। আর আছে সেণ্ট্রাল পি ডব্লু ডি। ওরা চুটিয়ে রাস্তা তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আছে স্কুল। দোকান পাট। সবকারী আবাস। গত কয়েক বছরে এখানে নানা রকম সরকারী অফিসও গড়ে উঠেছে।

ডঃ শ্রীবাস্তব বললেন, আমরা সি পি ডব্লু ডি-র ইনসপেকশন বাংলোতে থাকবো। দেখি, আমাদের অ্যাডভান্স পার্টি কি বন্দোবস্ত করেছে।

সুন্দর আবহাওয়া। জায়গাটা প্রায় হাজার চারফুট উঁচু। সন্ধের দিকে বেশ শীত করছিল।

বাংলোয় পৌঁছতেই ফ্যাসাদ। কোথায় অ্যাডভান্স পার্টি? কারোর টিকিটির দেখা নেই।

কী ব্যাপার, ডঃ শ্রীবাস্তব? ভৌমিক কোথায়? দে হ্যাভ নো ট্রেস। বললেন শম্ভুবাবু।

ডঃ শ্রীবাস্তব তো থ। তাই তো, তাই তো—আমাদের অনেক আগে আসার কথা ছিল ওদের। ডঃ শ্রীবাস্তব আমতা আমতা করতে লাগলেন।

বলতে বলতেই জীপ আর ল্যাণ্ড রোভারের শব্দ। আর তার পর মুহূর্তেই অসিত ভৌমিকের জীপ এসে দাঁড়ালো ক্যাঁচ করে ব্রেক কষল আমাদের পাশে।

জীপ থেকে লাফিয়ে নামলেন মিঃ ভৌমিক।

আমি রসিকতার লোভ সামলাতে না পেরে বললাম, কী খবর,

ভৌমিক সাহেব ? শেষে অ্যাডভান্স পার্টির অ্যাডভান্স পার্টি হতে হলো আমাদের ?

আর বলবেন না। পথে ল্যাণ্ড রোভারের টায়ার ফুটো। ইঞ্জিনটিও বিগড়ে গিয়েছিল কিছুটা। আবার ঙ্গেসামিতে ফিরে গিয়ে সব সারিয়ে এই আসা।

শম্ভু সেন বললেন, যাক। তবু এসেছো তোমরা। রবিকুমার কোথায় ?

পেছনে ল্যাণ্ড রোভারে আছে।

এরপর শুরু হয়ে গেল লম্বা রুটিন।

রবিকুমার এবং অসিতবাবু দারুণ কাজের মানুষ। আধঘণ্টার মধ্যে রাতেব ব্যবস্থা তাঁরা শেষ করে ফেললেন। চাল, ডাল থেকে শুরু করে চা, বিস্কুট, একেবাবে বেশন। তাঁরা সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলি কিচেনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এই ফাঁকে আমরাও ফ্রেশ হয়ে নিলাম।

এর পর সৌজন্য সাক্ষাৎকার। ডঃ শ্রীবাস্তব হই হই করতে করতে হাজির। সঙ্গে তুজন ভদ্রলোক।

ইনি মিঃ এস লিমা আয়ার। কিফ্রেব অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডেপুটি কমিশনার। আর ইনি মিঃ এন টি লঙ্গকুমার। এখানকার পি ডব্লু ডি-র একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। শম্ভুবাবু এবং আমার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন ডঃ শ্রীবাস্তব।

মিঃ আয়ার বেঁটেখাটো মানুষ। কিছুটা স্থূলকায়। মিঃ লঙ্গকুমার তুলনায় বেশ লম্বা। এদের সঙ্গে আধঘণ্টার মত গল্পগুজবে সময় কাটলো।

মিঃ আয়ার বললেন, কাল সকালে আমরাও আপনাদের সঙ্গে

পুকপুর যাচ্ছি, মিঃ সেন। সেখানে আপনাদের জন্যে একটা কাল-চারাল প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আই হোপ ইউ উইল ফাইনড দ্য পীপল্ ইণ্টারেস্টিং।

অমায়িক ভদ্রলোক। মিঃ আয়ার এবং মিঃ লঙ্কুমার দুজনই। ওঁরা দুজনেই নাগাল্যাণ্ডের অধিবাসী। বয়েস চারের কোটায়। হয়ত পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। দুজনই খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বী।

কথা হলো নাগাল্যাণ্ডের বিভিন্ন এলাকায় মানুষ সম্পর্কে। মিঃ আয়ার বললেন, জানেন তো, আমাদের এদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থাই সব মাটি করেছে। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যাবেন তার রাস্তা নেই। এসব পাহাড়ে অঞ্চল। পথ চলতে গিয়ে পাথরে ঠোক্কর খেয়ে যে কোন সময় মানুষ আহত হতে পারে। কিন্তু তাকে যে তখন ফার্স্ট এইড দেবেন গ্রামাঞ্চলে তেমন ব্যবস্থাই নেই। এমন জায়গা আছে এখানে, যেখানে জীবনের প্রাচীন ধারা আঁকড়ে বেঁচে থাকা ছাড়া কোন পথ নেই। বিশ্বাস? হ্যাঁ, অপরকে তারা চট্ করে বিশ্বাস করতে পারে না। অজ্ঞতাই যার কারণ। দে নিড এডুকেশন, মিঃ কর।

কিন্তু সব চাইতে আগে দরকার চলার পথ। যে পথ ধরে গাড়ি চলতে পারে।

শম্ভুবাবু বললেন, এটাই তো এখনও পর্যন্ত মস্ত বড় সমস্যা। এই যে তুয়েংসাং জেলা, এর সবটাই দাঁড়িয়ে আছে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বিস্তৃত ভারত-বার্মা পার্বত্য অঞ্চলে। উঁচু পর্বতশৃঙ্গ, গভীর গিরিখাত, সঙ্কীর্ণ উপত্যকা এবং ছোট ছোট কয়েকটি মালভূমি এই নিয়ে এই জেলা। পূর্ব দিকে আটত্রিশ শ' মিটার উঁচু সারামাটি গিরিচূড়া। সে জায়গায় যাওয়া আমাদের পক্ষে এখনও সম্ভব হয়নি।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইনডিয়ার পক্ষে সেখানে সম্ভব হয়নি

ঠিকই। কিন্তু সেখানেও তো মানুষ বাস করে। তারা নাগা। তারা আধুনিক সভ্যতার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত।

ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করতে গিয়ে সার্ভের লোকদের মনে হলো পুকপুরের ভূস্তরে লোহা, নিকেল, কোবল্ট এবং প্লাটিনামের চিহ্ন রয়েছে যেন? হ্যাঁ, ড্রিল করতে হবে। দেখতে হবে তাঁদের অনুমান সত্যি কি না।

শক্ত কাজ। ড্রিল করার ভারী যন্ত্রপাতি যে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে, তার রাস্তা কোথায়? শেষ পর্যন্ত হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করা হলো। এ ব্যাপারে তাঁদের সাহায্য করলো ভারতীয় বিমানবাহিনী। হেলিকপ্টারে ভারী ভারী যন্ত্রপাতি নামিয়ে দিলেন পুকপুরে। সেখান থেকে তাদের কুলির মাথায় করে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে সেই মাতুংগসেকিন পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে তবেই ড্রিলিং-এর কাজ শুরু করা হলো। প্রচুর ঝামেলা। প্রচুর ঝক্কি। কাছে-কোলে কোন বাজার হাট নেই। না আছে লোকালয়। কী খাবেন তার না আছে কোন ঠিকানা। এভাবে আর কতটা কাজ এগোবে?

রাত আটটা নাগাদ বিদায় নিলেন মিঃ আয়ার এবং মিঃ লঙ্গ-কুমার। যাওয়ার সময় বলে গেলেন সকাল সাতটার মধ্যে আমরা যেন রওনা দিই। নইলে যেতে যেতে বেলা বেড়ে যাবে।

ডঃ শ্রীবাস্তব ভরসা দিয়ে বললেন, কোন ভাবনা করবেন না। আমরা ঠিক সাড়ে সাতটার মধ্যেই রওনা হবো।

সাড়ে সাতটা নয়, সাতটা। তাঁর ভুল শুধরে দিলেন মিঃ লঙ্গকুমার।

সরি। সাতটা। মনে থাকবে। হাসতে হাসতে জবাব দিলেন ডঃ শ্রীবাস্তব।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউই আমরা কথা রাখতে পারি নি। সারাদিন

পথ চলার ক্লান্তিতে সবাই কুম্ভকর্ণের ঘুম মেরে উঠতে উঠতে পরদিন বেশ কিছুটা দেরি হয়ে গেল। আমরা যখন যাত্রা করলাম, ঘড়িতে তখন আটটা।

রোদ ঝলমলে দিন। স্নিগ্ধ বাতাস। সবাই আমরা গায়ে চামড়ার জ্যাকেট এবং মাথায় টুপি পরে নিয়েছি। উদ্দেশ্য, কিছুটা ঠাণ্ডার হাত থেকে নিজেদের বাঁচানো। এবং তার চেয়েও বেশি, ধুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া। কারণ, যে পথ ধরে এবার আমরা চলেছি, সে পথ কিফ্‌রের পথের মত পীচ ঢালা নয়। একেবারে কাঁচা। একেবারে ধুলোর ঝড় তুলে আমরা পথ চলতে লাগলাম।

কখনও খাড়াই, কখনও উৎরাই। কখনও বাহাত্তর ডিগ্রি কোণ করে উপরে উঠে যাওয়া, কখনও বাহাত্তর ডিগ্রি কোণ করে আবার নেমে আসা। মাঝে মাঝে শম্ভুবাবু ড্রাইভারকে বলে চলেছেন, হুঁশিয়ার ভাই। নো স্পিড। ডান দিকটা সামলে চলুন, ইত্যাদি।

কারণও ছিল। পুরোটাই কাঁচা রাস্তা। সরু। একখানা জীপ কোন রকমে চলতে পারে। একটু বেসামাল হলে এক পাশে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা নইলে আর এক পাশে গভীর গিরিখাতের মধ্যে একেবারে বেপাত্তা। পথে পড়ল জুমকি নদী। ছোট নদী। কিন্তু ভীষণ স্রোত। বছরখানিক আগে রাজ্য সরকার এর ওপর একটি সেতু তৈরি করেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর বয়ে গিয়ে এই নদী টেজু নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কিফ্‌রে থেকে পুকপুরের দূরত্ব প্রায় বাহাত্তর কিলোমিটার। মাঝে পড়ল ছোট্টো একটি শহর। নাম পুঙ্গরো। পুঙ্গরো থেকে পুকপুর পর্যন্ত তেইশ কিলোমিটার পথে কাজ চলছে রাজ্য সরকারের।

পুকপুর থেকে আসলে যেখানে আমাদের যাওয়ার কথা সেটি একটি গ্রাম। নাম জাংগর। সেখানে আমরা গিয়ে পৌছলাম প্রায় সাড়ে এগারোটায়।

অবিশ্বাস্য। এত মানুষ। এত তাদের প্রাণ! মানুষ এত আনন্দও করতে পারে? ছোট্ট একটা উৎরাই পথে আমাদের জীপ যখন উঠতে লাগলো প্রথমেই পড়ল একটি তোরণ। তিনটি গাছের কাণ্ড দিয়ে তৈরি। দুটি খাড়া করে পোঁতা। একটি আড়াআড়িভাবে তাদের মাথায় বেঁধে রাখা হয়েছে। আর সেখানে সাদা কাগজের ফালি কেটে ইংরেজি হরফে লিখে রাখা হয়েছে, অতিথিরা, স্বাগতঃ!

সেই তোরণের ভেতর দিয়ে আমরা হাজির হলাম একটি খুদে মালভূমির ওপর। মনে হলে যেন মস্ত একটি মাঠ। তার মাঝখানে বিচিত্র রঙিন পোশাকে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় সত্তরজন যুবক ফর্সা গা খালি পা। কোমর থেকে যৎসামান্য নিচে যৎসামান্য বাস। তাদের কোমর থেকে পা পর্যন্ত—বিশেষ করে জানু যেন কোন শিল্পী নিখুঁতভাবে তৈরি করে দিয়েছেন। কোমরে ঝোলানো দা। গায়ে নানারকম গহনা। মাথায় পালকের বাহারে টুপি। তারা হাত ধরাধরি করে তালে তালে নেচে চলেছে। আর মুখে শব্দ করছে—হুম্-ইয়া-হা! হুম্-ইয়া-হা।

সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

জিওলজিক্যাল সার্ভের লোকেরা কয়েকটি চেয়ার টেবিল এবং বেঞ্চের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের পেছনে উঁচু র‍্যামপার্টের মত একটি জায়গায় গ্রামের যত ছোট ছোট বাচ্চা ভিড় করে বসে। মাঝে মাঝে উল্লাসে চিৎকার করছে তারা। মাঠের পেছনে একটি টিলা। উপর থেকে ঢালু হয়ে মাঠের দিকে নেমে এসেছে। সেই টিলার ওপর

গ্রাম। কাঠ আর খড়ে ছাওয়া বাড়ি। টিলার ওপর দাঁড়িয়ে মেয়েরা ভিড় করে নাচ দেখছে।

মিঃ আয়ার এবং মিঃ লঙ্গকুমার আমাদের আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মিঃ আয়ার হাসতে হাসতে বললেন, ইউ আর লেট্। দে হ্যাভ স্টার্টেড দেয়ার কালচারাল শো।

এলো গাঁওবুড়া। বছর চল্লিশ বয়েস। নাচের বেশ। গায়ে লাল চাদর। স্থানীয় ভাষায় কি যেন বলল। মিঃ লঙ্গকুমার তার ইংরেজী তর্জমা করলেন, ওরা চায়, আমরাও ওদের নাচে অংশ গ্রহণ করি।

সর্বনেশে কাণ্ড। নাচ। মানে আমাকেও নাচতে হবে ওদের সঙ্গে? যার ডান দিকের ধাপ বাঁয়ে পড়ে, তাকেও নাচতে হবে শেষ পর্যন্ত?

শম্ভুবাবু চোখ মটকালেন।—নো অলটারনেটিভ। ওরা যেহেতু চায়, আমাদের নাচতেই হবে। নইলে মনে ক্ষুণ্ণ হবে ওরা।

ডঃ শ্রীবাস্তব দেখি অনেক স্মার্ট। তিনি ততক্ষণ নাচের আসরে নেমে পড়েছেন।

আমার পাশ থেকে কে যেন মন্তব্য করলেন, বুঝলেন না? ডঃ শ্রীবাস্তব হলেন গিয়ে এ অঞ্চলের জিওলজিক্যাল সার্ভের ডাইরেকটর। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে এভাবে না মিশলে তাঁর এ অঞ্চলের লোকজন কখনও কাজ করতে পারবে?

অগত্যা। নাচের আসরে যোগ দিতে হলো। শম্ভুবাবু, মিঃ লঙ্গকুমার, মিঃ আয়ার অন্যান্য জিওলজিস্ট এবং আমি। নাচের পোশাক না থাক। একটা করে পালকের টুপিই যথেষ্ট। আমাদের প্রত্যেকের মাথায় এক একটি টুপি পরিয়ে দিলো ওরা। তারপর শুরু হলো আর এক প্রস্থ নাচ।

ততক্ষণ অজিতবাবুর মুভি চলতে শুরু করেছে।

নাচ চলল প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ। তারপর সভা। শম্ভুবাবু, ডঃ শ্রীবাস্তব এবং আমাকে ওদের হাতে তৈরি এক একটি লাল বর্ডারের কালো শাল দিয়ে ওরা সংবর্ধনা জানালো। ডঃ শ্রীবাস্তব বললেন, মিঃ কব, এটা বিরাট সম্মান। মানে ওরা আমাদের আপনার করে নিল।

শম্ভুবাবু দিলেন গিফট। নুনের বস্তা, চার্মিনার সিগারেট এবং টফির বাকসো।

কী সরল। কত আনন্দিত তাবা। শিশুর মত মনে ওরা গ্রহণ করল সব। না, এতটুকু চেঁচামেচি নেই। এতটুকু হল্লাও শুনলাম না। না ছিল ওদের মধ্যে একটুকু উঞ্ছবৃত্তির চিহ্ন।

এর পর বক্তৃতার পালা। আপনারা বাইরে থেকে এসেছেন। আপনাদেব কাছ থেকে আমবা কিছু শুনতে চাই। গাঁওবুড়া চেপে ধরলেন আমাদের।

শম্ভুবাবু বক্তৃতা করলেন। ওদের বললেন, আমরা জিওলজিস্টরা সব সময়ই আপনাদের সাহায্য পেয়ে আসছি। আসুন এই পুকপুরে আমরা একসঙ্গে কাজ করি। এখানকার পাথরে চাপা পড়ে আছে মূল্যবান ধাতু। তাদের উদ্ধার করতে পারলে আপনাদেরই লাভ। হিন্দীতে বললেন তিনি। মিঃ লঙ্গকুমার অনুবাদ করে দিলেন।

মিঃ কর, আপনিও কিছু বলুন। মিঃ আয়াবের অনুরোধ।

কিন্তু আমি কি বলব? আমি তো এসেছি দেখতে। শুনতে।

দেখলেন এবং শুনলেনও তো। এবার বলুন, আপনি কী বুঝলেন? ওরা শুনতে চায়। শুনে খুশি হবে।

অতএব বলতে হলো। ওদের সান্নিধ্যে হৃদয়ের যে স্পর্শ পেলাম,

সেটাই প্রকাশ করলাম। যে হৃদয়ের মধ্যে দেখেছিলাম শিশুর সারল্য, গভীর মমত্ববোধ, আত্মবিশ্বাস এবং আপন সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠা—তার কথাই বললাম।

একজন বললেন, আপনাকে আমরা নেমন্তন্ন করছি। আজকের দুপুরের খাওয়াটা আমার বাড়িতে খেতে হবে। তিনি নাগা। স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক।

শম্ভুবাবুর আবার চোখ মটকানি।—কি চলবে? দারুণ শক্ত কাজ। বাংলাতেই বললেন।

ডঃ শ্রীবাস্তব চুপ। ভাবছে, আমি কি বলি।

আমি বললাম, কাজটা যদি ওদের কাছে শক্ত না হয়, আমার কাছেও হবে না।

বেশ। গুড লাক্। বলেই ডঃ শ্রীবাস্তব, শম্ভূবাবু, মিঃ আয়ার এবং আর সবাই নিজেদের ক্যাম্পের দিকে পা বাড়ালেন। এবং অজিতবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ লঙ্গকুমার এবং আমি নাগা-বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম।

খড়ে ছাওয়া ঘর। একটিমাত্র দরজা। নিচু হয়ে ঢুকতে হয়। ঘরের মধ্যে এক একটি গাছের গুঁড়ি কেটে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এগুলি বসার জায়গা। সামনে একটি করে তক্তা। মানে টেবিল। আমরা গিয়ে বসলাম।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো গৃহকর্তার ব্যস্ততা। এক একটি কলাই-এর থালা এলো। তার ওপর ভাত। প্রথমে পরিবেশন করা হলো আলুর তরকারি। শুনলাম এটা অতিরিক্ত। শুধু অতিথিদের জন্যে। তারপর মাংস। শুয়োরের মাংস। লঙ্কা, পেঁয়াজ, আদা এবং নুন দিয়ে সেদ্ধ।

এক ঘণ্টা ধরে চলল খাওয়া এবং গল্প।

যে আন্তরিকতা পেলাম, তার যেন তুলনা নেই। দেখলাম, ঘরের মধ্যে একটা ধুনি জ্বলছে। পাশে ছোট্ট একটি ঘর। মাঝে মাঝে তার দরজা দিয়ে দুখানা হাত বেরিয়ে আসছে। সেই হাত থেকে পাত্র করে খাবার এগিয়ে নিচ্ছেন গৃহকর্তা। বুঝলাম, দরজার আড়াল থেকে যে হাত দুটি দেখতে পাচ্ছি, তা গৃহকর্ত্রীর। অবাক লাগলো। এরাও কি তা হলে সংরক্ষণশীল?

খাওয়া দাওয়া সেরে খানিকটা কৌতুক করার জন্যে গৃহকর্তাকে বললাম, সবই তো হলো, শুধু একটি গোলমাল থেকে যাচ্ছে যে।

গৃহকর্তার ভাষা বুঝি না। শুধু এটুকু বুঝলাম, আমার কথা শুনে একটু যেন বিচলিত হলেন তিনি।

বললাম, শুনুন, স্যার। আমাদের পরিবারে একটি নিয়ম আছে। আমরা যখন কারোর অতিথি হই, আতিথ্য পাওয়ার পর তাঁর পরিবারের যিনি কর্ত্রী, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। এখানে সেটি বাদ থেকে যাচ্ছে।

মিঃ লঙ্গকুমার সঙ্গে সঙ্গে আমার বক্তব্য নাগা ভাষায় অনুবাদ করলেন।

পড়ে গেল হাসির রোল। আমাদের স্যারও এবার হাল্কা হলেন যেন। নিজের ভাষায় স্ত্রীকে আহ্বান জানালেন তিনি।

কয়েকটা মুহূর্ত। এটুকু কালক্ষেপণের মূল কারণ হয়ত সঙ্কোচ। তারপর পাশের ঘর থেকে তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কত আর বয়েস? বছর পঁচিশ। পরনে ঈষৎ নীল মেখলা। গায়ে সাদা স্কার্ট ব্লাউজ। চুলে বিনুনী। কোন চাপল্য নেই। স্নিগ্ধ, স্নেহময়ী মূর্তি। যাঁর সান্নিধ্যে মাথা আপনা থেকেই নত হয়।

তাঁর হাত দুটি আমার দুহাতে চেপে ধরলাম। তারপর মাথা

নত করে বললাম, ভগিনী, আপনার সংসারে এসে বড় তৃপ্তি পেলাম।

আমার কথা অনুবাদ করলেন মিঃ লঙ্গকুমার।

তিনি মাথা নত করে আমাকে প্রতি নমস্কার করলেন। তাঁর মুখের ওপর ভেসে উঠল মৃদু হাসির রেখা।

বাইরে বেরোতেই আবার রিসেপসন। দেখি একদল ছেলে এবং মেয়ে পরিচ্ছন্ন পোশাকে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। ছেলেরা ফুলপ্যান্ট এবং জামা পরে। মেয়েদের পরনে মেখলা এবং স্কার্ট। মেয়েদের হাতে ছোট্ট এক একটি ছাপানো বই। দু হাত দিয়ে বইগুলি চোখের সামনে ধরে তারা সুর করে গান করছে। দেখলাম, বইগুলির ভাষা নাগা। হরফ ইংরেজী।

মিঃ লঙ্গকুমার বললেন, আপনাকে এরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে। এখন আপনি এই গ্রামেরই অতিথি। তাই এই বিশেষ অভ্যর্থনা। বলেছিলেন, নাগা গ্রাম দেখবেন। চলুন, গ্রামটা দেখে নিন।

আমাদের সঙ্গে এসে হাজির হলেন এক তরুণ নাগা যুবক। পরিচয় হতেই জানলাম তিনি একজন ডাক্তার। কলকাতা থেকে এম বি বি এস পাশ করে এখন পুঙ্গরোর সরকারী ডেয়ারির মেডিকেল অফিসার। নাম ডঃ মেরেন সাংগতাম। ভদ্রলোক বললেন, কলকাতা থেকে এসে এখানে দেখছেন তো, পার্থক্যটা কোথায়? এখানকার মানুষ বড় গরীব, মিঃ কর।

তাঁর কথায় বললাম, গরীব। টাকা পয়সার দিক দিয়ে গরীব ঠিকই। কিন্তু যে সম্পদ মানুষকে মানুষ করে তোলে, সে দিক দিয়ে এখানকার মানুষ অনেক বেশি ধনী। একেবারে পাথরের মত চিরায়ত।

ইউ আর ইমোশন্যাল। মন্তব্য করলেন ডঃ সাংগতাম।

জানি না, আপনি কি বলতে চাইছেন। তবে আমার মনে হয়, জীবনটা স্থূল যুক্তিতর্কের বিষয় নয়, জীবন বিশ্বাসের সামগ্রী। আর যেখানেই বিশ্বাস, সেখানেই ইমোসন। আপনাদের শহরগুলির কী অবস্থা, আমি জানি না। তবে এই গ্রামে, এদের একান্ত সান্নিধ্যে এসে আমার মনে হয়েছে এখানকার মানুষের আত্মবিশ্বাসের ভিত বড় শক্ত। এদের সংস্কৃতির প্রতি এদের প্রচণ্ড ভালবাসা। হ্যাঁ, সংস্কৃতি। আমার কি মনে হয় জানেন, একটা মানুষের আইডেনটিটি তার নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। আর তা গড়ে তুলতে সময় লাগে বিস্তর। যেভাবেই হোক এটা আপনাদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে, ডঃ সাংগতাম। বিদেশ থেকে আমদানি করা সংস্কৃতি নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। বাঁচতে যে পারে না, সে তো আমাদের বড় বড় শহর দেখলেই বুঝতে পারেন। যাক বক্তৃতা হয়ে গেল। মাফ করবেন। চলুন, গ্রামটা ঘুরে দেখি।

ষোলো

সকালে জনৈক জিওলজিস্টকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেমন লাগছে আপনার এখানে ?

টু ব্যাড। ভদ্রলোকের তাৎক্ষণিক উত্তর।

কেন ? আবার প্রশ্ন করলাম আমি।

ম্যান ক্যাননট লিভ উইথ স্টোন অ্যালোন।

ভদ্রলোকের বয়েস কম। তিরিশের এ পারেই মনে হলো। এসেছেন দক্ষিণ ভারত থেকে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকস ছাত্র।

তা পেশা হিসেবে জিওলজিকে যখন বিষয় করে নিয়েছেন, পাথর নিয়েই তো আপনাকে কারবার করতে হবে। আর সে পাথর তো আপনি আর বাড়ির উঠনে পাবেন না। আমি সে কথা বলছি না। বলছি নাগাদের কথা। এসব দুর্গম জায়গায় ওদের সান্নিধ্যে তো আপনাদের কাজ করতে হয়। বলছিলাম কি, কেমন লাগল ওদের আপনার ?

সামটাইমস্ টু ব্যাড। ইউ নো, দে আর ভেরি ডিমাণ্ডিং পীপল্। ভদ্রলোকের চটপট্ জবাব।

হোঁচট খেলাম আমি। মনে পড়ল শিলঘাটে আসার পথে ফেরির ওপর যে সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর কথা। তিনিও তো তখন এই জিওলজিস্ট ভদ্রলোকটির মতই বলেছিলেন, মশায় ভারী ডিমাণ্ডিং ওই নাগারা। ওদের শুধু —চাই, চাই, আরও চাই। হাজার দিন, মন পাবেন না নাগাদের। ব্যাপারটা কী ? ওরা কিসের ডিমাণ্ড করে এত ?

আপনি ট্যুরিস্টের মত এসেছেন। দু'দিন থেকেই চলে যাবেন। আপনি ওসব বুঝবেন না। থাকুন আমাদের মত জঙ্গলে কিছুদিন। তখন দেখবেন ওদের বায়না কত। ভদ্রলোকের কথায় রীতিমত বিরক্তি।

আমি বললাম, ডিমাণ্ডটা আসলে কী ?

তা হল একটা নমুনা দিই, শুনুন। একদিন মশায়, তখন রাত্তির। সারাদিন সাইটে খেটেখুটে এসে ক্যাম্পে আমরা বিশ্রাম করছি। পাশে রান্নার আয়োজন চলছে। আর আমাদের রান্না মানে তো

বুঝতেই পারছেন। এসব জায়গায় কিছু তো আর পাবেন না। কখনও কুমড়ো, কখনও কিফার অথবা জেসামি থেকে চাল-ডাল নিয়ে আসি। হপ্তায় হপ্তায়। তাই ফুটিয়ে খাওয়া। কিছু সবজি থাকলে তো পেল্লাই কাণ্ড। এখানে মাছ মাংসের কথা ভুলে যান। তা হোক। এখন আমরা অভ্যস্ত। রান্না-বান্না চলছে। হাঁ করে অপেক্ষা করছি, কখন রান্না শেষ হবে। আমরা খেয়ে-দেয়ে ঘুমবো। ঠিক এমন সময় তিন নাগা এসে হাজির। আমরা বললাম, কী ব্যাপার?

ওদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলল, গাড়ি দিতে হবে। আমাদের একজন জখম হয়েছে তাকে পুঙ্গরোর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

দেখুন ব্যাপারখানা। পুঙ্গরো কি এখানে? প্রায় তেইশ কিলো-মিটার দূর। রাস্তা দারুণ খারাপ। দিনে চলতেই আমরা ভরসা পাই না, তো এই রাতে। তা ছাড়া, ওদের বুঝবেন না, মশায়। বলছে, জখম হয়েছে। দেখুন কোন গ্রামে গিয়ে কাকে খুন করে নিজে জখম হয়ে ফিরে এসেছে। দারুণ জটিল ব্যাপার। তেমন হলে একেবারে পুলিসে কেস্। কে জানে, আনডারগ্রাউণ্ড কোন ব্যাপার কী না। আমরা বুঝিয়ে বললাম, দেখুন, সরকারী গাড়ি, অতটা পথ যেতে আসতে তেল তো কম পুড়বে না। আমাদের তেলের স্টকও কম। কিন্তু কে শোনে সে সব কথা? না ভায়লেন্স বলতে যা বোঝায়, তেমন কিছু নয়। তবে ওই আবদার? একেবারে ছেলেমানুষী আবদার, মশাই। কিছুতেই বুঝতে চায় না যে আমাদেরও কোন অসুবিধে থাকতে পারে।

আমি বললাম, দেখুন সত্যিই কেউ ওদের সে রকম যদি জখম হয়ে থাকে, আর এখানে অন্যরকম সাহায্যের কোন উপায় নেই,

তখন এটুকু তো ওরা আশা করতে পারে আপনাদের কাছ থেকে, তাই না?

ভাল কথা। এটা একটা একস্ট্রিম কেস। বলতে পারেন, সরকারী নিয়ম-কানুন যাই থাক, মানবিকতার দিক দিয়েও অন্তত একটা ডিসিশন আমাদের নিতেই হবে। মানে—

এক সেকেণ্ড। আমার আর একটি প্রশ্ন। মাঝপথে তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম, কেসটা কোন আনডারগ্রাউণ্ডের ব্যাপার ছিল? শুনেছি, বিবেলরা নাগাল্যাণ্ডের সব জায়গাতেই ছড়িয়ে আছে। ওপর থেকে বোঝার জো নেই। এ কথাও ঠিক, মুখে যে যাই বলুক না কেন, প্রত্যেক নাগার কাছে ফিজো হচ্ছে ভগবান।

নো কমেণ্ট। এ ব্যাপারে আমরা কিছু বলতে পারি না। বলা ঠিকও নয়।

আচ্ছা থাক। আপনি কি বলছিলেন, বলুন।

হ্যাঁ, ওই আবদার। আপনি হয়ত কাজের পেছনে গাড়ি নিয়ে ছুটছেন। পথে পড়ল এক নাগা। সে হাত উঁচিয়েছে। মানে, গাড়িটা থামান। তারপর সে কী বলবে, তাও জানি। বলবে, আমি অমুক জায়গায় যাবো। হ্যাঁ, তুলে নিতে হবে আপনাকে। সে জায়গা আপনার পথেই পড়ুক, আর পথ থেকে বিশ কিলোমিটার দূরেই হোক। অনেক সময় এমনও হয়েছে, রাতের দিকে এসে হাজির কয়েকজন নাগা। মদে একেবারে চুর। পথ ভুলে এদিকে চলে এসেছে। বরং বলি নেশার ঘোরে। নেশা হালকা হাওয়ার পর বুঝতে পেরেছে, বাড়ি থেকে অনেক দূরে তারা। ব্যস। এবার তাদের বাড়ি পৌঁছে দাও। এ তো গেল এক দিক। তা ছাড়া এটা ওটা গিফট হিসেবে সব সময় ওদের তো আমরা দিয়েই থাকি। ধরুন টফি,

সিগারেট বা অন্য কিছু দিলেন। কিন্তু দেখবেন, আবার কাল পথে দেখা হতেই হাত পাতবে, সিগারেট দাও। আর তা না পেলে বাচ্চা ছেলের মত গজ্‌ গজ্‌ করবে। বলেছি না, সামনাসামনি কোন ভায়ওলেন্স দেখবেন না। মনের মধ্যে গরব গরর। বড চাপা এরা, মশাই, মুখ দেখে বুঝবেন না। আমার তো ভয় হয়—কখন কি করে ফেলে। জানেন তো, এসব গ্রাম এক সময়ে হেডহান্টারদের বাসভূমি ছিল ?

শুনেছি। কিন্তু সে তো অনেক জায়গাতেই ছিল। এরা তবু তো ট্রাইব। বাংলার ডাকাতের কথা শোনেন নি? বড় বড় জমিদার। লেখাপড়া জানা লোক। দিনে তাদের দেখলে বোঝাই যেত না তারা ডাকাত। রাতে মাথার খুলির পেছনে ছুটতো। বেশি দিনের কথা নয়। এই শতাব্দীর গোড়াতেও তারা ছিল। সুন্দরবনের ডাকাতের কথায় অনেকেরই বুক কাঁপতো। এখনও ভয় পায় অনেকে। কিন্তু সত্যিই কি ওই অঞ্চল এখন ভয়ের কারণ? আসলে কি জানেন দেশের প্রত্যেক অঞ্চলেরই কিছু কিছু নিজস্ব ঘটনা থাকে। সেই ঘটনাগুলিই শেষ পর্যন্ত প্রবাদ হয়ে দাঁড়ায়। প্রবাদ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আর সব অঞ্চলে। সময়ের পরিবর্তন হয়। ওই ঘটনাগুলিও সেই সঙ্গে হয়ত আর থাকে না। কিন্তু প্রবাদ থেকে যায়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে অনেকে তাদের সত্যি বলেও গ্রহণ করে।

আপনি দেখছি একজন অপটিমিস্ট। যা বলতে চাই সেটা হয়ত বোঝাতে পারছি না আপনাকে। দেখা যাক, ব্যাপারটা পরিষ্কার করার মত এ যাত্রায় কোন সুযোগ মেলে কী না।

তাঁর কথা সবটা না বুঝলেও কিছুটা অনুমান করতে পারলাম। আগেই শুনেছিলাম, যাঁরা ট্রাইবদের এলাকায় কাজ করতে আসেন

কতকগুলি কথা তাঁদের সব সময় মনে রাখতে হয়। যেমন, এমন কিছু তাঁরা করবেন না, যাতে ট্রাইবরা বিরক্ত হতে পারে। তাদের বিশ্বাসে আঘাত লাগে। প্রতিটি আচরণে বুঝিয়ে দিতে হবে, তাঁরা তাদের বন্ধু। তাদের উপকারের জন্যেই তাঁরা তাদের মধ্যে এসেছেন। এর জন্যে তাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে তাঁদের মিশতে হয়। দৈনন্দিন সমস্যা, যেমন চিকিৎসা, যানবাহন এসব ব্যাপারেও তাদের সাহায্য করতে হয়। আর এ সব করেন বলেই জিওলজিক্যাল সার্ভের কোন কর্মীর পক্ষে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে কাজ করাটা সহজ হয়ে থাকে। শুনলাম, নাগাল্যাণ্ডে প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মীরাও এমনটি করে থাকেন। এবং শুধু নাগাল্যাণ্ড নয়, দেশের সমস্ত আঞ্চলিক অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও একথাটি সত্য।

এতটা করার পরও সমস্যা কিছু থেকেই যায়। যেমন এই নাগাল্যাণ্ডে। ভারতে ট্রাইব আছে বিস্তর। আধুনিক সভ্য মানুষদের কেউ তাদের মধ্যে গিয়ে পড়লে, তাদের অনেকেই মনে করে, যারা এলো তাদের চেয়ে তারা নিম্নশ্রেণীর মানুষ। তাদের সম্পর্ক যেন বাবু-ভৃত্যের। এদিক দিয়ে নাগারা একটা বড় রকমের ব্যতিক্রম। ওদের মধ্যে আছে অদ্ভুত এক স্বাতন্ত্র্যবোধ। প্রচণ্ড ওদের আত্মমর্যাদাজ্ঞান। আসুক না কেউ সাহেবী পোশাক পরে, গাড়ি চড়ে। থাকুক তার টাকা পয়সা। তাই বলে মানুষ হিসেবে নিজেরাই বা তারা কম কী! এই মনোভাবের দরুনই একজন নাগা কোন বিদেশীর সঙ্গে যখন কথা বলে, সে ভয় পায় না। তার আচরণে দেখা যায় না হীনমন্যতা। এটাও এক ধরনের অভিমান। এই অভিমানটি তারা সযত্নে লালন করে থাকে। ওরা মনে করে, যে ভাবে ওরা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করে, অপরেও তেমন ব্যবহারই করবে তাদের সঙ্গে।

শুধু একটা কথা। বিশ্বাস। মন্তব্য করেছিলেন জনৈক সরকারী কর্মী। দশ বছরেরও বেশি নাগাল্যাণ্ডের বিস্তৃত এলাকায় যিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। বাস করেছেন নাগাদের একান্ত সান্নিধ্যে।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, বিশ্বাস। বুঝলেন, মশায়, বিশ্বাস। যাকে ওরা বিশ্বাস করে, তার জন্যে ওরা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। তবে হ্যাঁ ওরাও আশা করে, আপনিও এমন কিছু করবেন না, যাতে সেই বিশ্বাসটি ভেঙ্গে যায়। ওদের কাছে, বিশ্বাস মানেই গ্রহণ করা সর্বান্তকরণে। যেখানে অবিশ্বাস সেখানে এলিমিনেশন। সম্ভব হলে হত্যাও করে তারা। তাদের কাছে সরকারী রীতিনীতি এবং আইন ঝুটা। তাদের আইনের মালিক তাদের নিজেদের বিচার যন্ত্র। এ ব্যাপারে ওরা অপরের ওপর নির্ভর করতে চায় না। যার ওপর তাদের বিশ্বাস, সে তাদের আপনার জন। এসো। আমাদের সরিক হও। আমরা যা দিতে পারি, নিযে নাও। কিন্তু হ্যাঁ, সেই সঙ্গে এটাও মনে থাকে যেন, তোমার পক্ষে যা দেওয়া সম্ভব, তুমিও সে সব আমাদেব দেবে। সেখানে স্থান, কাল, পাত্র বলে কিছু নেই। তাদের বিশ্বাসের এই হলো ব্যাখ্যা। তুমি বড়, আমি ছোট—তা নয়, আমরা মানুষ হিসেবে সব সমান।

ভদ্রলোকের কথা শুনে চমকে উঠেছিলাম। তাই তো? এমন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ক'জন আমরা ওদের কাছে যাই? আমরা তো যাই এক একজন 'সাহেব' হয়ে। ওদের দেখি। আমাদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে এক অদ্ভুত কৌতুক। যেন চিড়িয়াখানার জানোয়ার দেখছি। আর নিজেদের আমরা ভাবি এক একজন যীশু। এতে আর যাই হোক, মানুষের মনে বিশ্বাস জাগানো যায় না। বিশ্বাস যাদের জীবন, সেক্ষেত্রে তারা তো বিদ্রোহী হবেই।

এক সময়ে এরা ছিল হেড হান্টার্স। না, সেই প্রাথমিক শিক্ষকের বাড়িতে দুপুরের খাওয়া খেয়ে যখন জাংগর গ্রাম দেখতে বেরোলাম, এ কথা একবারও মনে হয়নি আমার। পাহাড়ের ওপর এ জায়গাটি একটি উঁচু ভিটের মত। প্রায় গোটা পঞ্চাশেক বাড়ি। কাঠের দেওয়াল। খড়ের চাল। গ্রামের মধ্যে আছে ছোট্ট একটি প্রাথমিক স্কুল। একটি চার্চ। পরিষ্কার, ঝকঝকে। গ্রামের একপাশে উঁচু একটা চালাঘর। খড়ে ছাওয়া। আয়তনে বেশ বড়। ভেতরে নানা রকম মাটির মূর্তি সাজানো। পশুপাখির মাথার খুলি। ভেতরে কয়েকটি শক্ত কাঠের গুঁড়ির ওপর বসানো প্রায় পঁচিশ ফুট একটি গাছের কাণ্ড। শুকনো। যার ব্যাস কম করেও তিন ফুট। কাণ্ডটির ভেতরের অংশ কুরে একটি চোঙের মত তৈরি করা হয়েছে। চোঙের সামনের অংশ থেকে মাঝ বরাবর অর্ধেক অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

বাড়িটির দিকে চেয়ে নাগা শিক্ষক বললেন, চালে ছাওয়া এই যে বিরাট ঘরটা দেখছেন, একে আমরা বলি 'মরম'। পাড়ার অবিবাহিত যে সব ছেলে, রাতে এখানে তারা বাস করে।

শুনলাম, নাগাদের সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে এটা অন্যতম। প্রত্যেক পরিবারের ছেলের বয়েস দশ বারো বছর হলেই এই 'মরমে' এসে তারা রাত কাটায়।

আর ওই কাঠের চোঙটা? ওই কাণ্ডটি যে গাছের সেই গাছটিও তো বড় কম নয়? এত বড় গাছ তো আশেপাশে দেখছি না? আমার প্রশ্ন।

উডেন ড্রাম। অর্থাৎ কাঠের জয়ঢাক। হ্যাঁ, গাছটি খুবই বড়। দূরের জঙ্গল থেকে এই কাণ্ডটি আমরা সংগ্রহ করে এনেছি। দেখছেন

তো। ওই যে—উঁচু পাহাড় দেখছেন, সবচেয়ে উঁচু চূড়া, ওর নাম সারামাটি। ওর ওপারে বার্মা এপারে নাগাল্যাণ্ড। বড় গাছ ওখান-কার জঙ্গলেই পাওয়া যায়। বললেন আমাদের শিক্ষকমশাই।

দুটি ছেলে এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলো বড় বড় দুটি কাঠের দণ্ড এবং তাই দিয়ে চোঙটির মাঝখানে আঘাত করতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে গুরুগম্ভীর শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। গ্রাম পেরিয়ে সে শব্দ আশেপাশের পাহাড়ের গায়ে ঠিকরে পড়ে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করল।

এই যে শব্দ শুনলেন, এই শব্দ শুনে আমাদের গ্রাম এবং আশে-পাশের মানুষ জানবে, আমাদের গ্রামে অতিথি এসেছে। বললেন আর একজন।—বিভিন্ন উৎসবের সময় আমরা এই ড্রাম বাজাই। গ্রামে কেউ মারা গেলে ড্রাম বাজাই, শত্রু আক্রমণ করলে তাদের কথা এই ড্রাম বাজিয়েই আমরা গ্রামবাসীদের জানিয়ে দিই। তবে হ্যাঁ, ঘটনাভেদে শব্দের তাল হয় আলাদা। সেই শুনে লোকে বুঝতে পারে কেউ মরলো কী না, কোন উৎসব হচ্ছে কী না এ সব কথা।

কিছু দূরে হঠাৎ চোখে পড়ল একটি লোক। গায়ের রং কিন্তু তার কালো। সে-ও নাগা। লম্বায় প্রায় ছয় ফুট। প্রায় সত্তরের মত বয়েস। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। গলায় ধাতব মালা। মালার সঙ্গে লাগান শুয়োরের হাড়। মণিবন্ধে এবং বাহুতে ধাতব বলয়। তার পুরুষাঙ্গটি সম্ভবত রূপোর তার পেঁচিয়ে ঢাকা। লোকটি একটি ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের দেখলো। কিছুটা এগিয়েও এলো আমাদের দিকে। ভাবলেশহীন তার মুখ। বৃদ্ধদের মুখ স্বাভাবিক অবস্থায় যেমনটি দেখায় সচরাচর। তারপর হঠাৎ কী ভেবে ত্বরিৎ পদে ফিরে গিয়ে ঢুকে পড়ল তার ঘরে।

প্রাচীন নাগা সম্পর্কে এটাই আমার একমাত্র অভিজ্ঞতা। যারা

বয়সে কম, এবং পুরুষ তাদের কারোর কারোর পরনে হাফ প্যাণ্ট। খালি গা। কারোর গায়ে সাদা বা কালো চাদর। অনেকে প্রচণ্ড স্বল্পবাস। তবে মেয়েদের পোশাক তুলনায় যথেষ্ট শৌখিন। পরনে মেখলা। মেখলাকে কেউ বুকের ওপর পর্যন্ত তুলে পরেছে। বেশ-ভূষায় তারা খুবই শালীন।

দেখলাম ছুটি মেয়ের পিঠের ওপর বাঁশের চোঙ। তা লম্বায় প্রায় ফুট তিনেক হবে। মোটা বাঁশ। ব্যাস ইঞ্চি দশেক। ওরা পাহাড়ের নিচ থেকে ওপরে উঠে আসছে। শান্ত পদে।

এখানে এটাই একটা বড় সমস্যা, মিঃ কর। মন্তব্য করলেন মিঃ লঙ্গকুমার। জল একটা বড় রকমের সমস্যা। এ সব পাহাড়ে জল পাওয়া যায় না। মেয়েদের এই ভাবে জল নিয়ে আসতে হয় দূর থেকে। মাইলের পর মাইল হেঁটে। এর জন্যে কখনও ওঠা নামা করতে হয়। এক হাজার ছু হাজার ফুট। ওই বাঁশের চোঙে করে ওরা জল আনে।

আমরা বাড়ি থেকে ওর বাড়ি যাচ্ছি। আমাদের পেছনে পেছনে গান গেয়ে চলেছে ছেলেমেয়ের দল। যারা গৃহবধূ, দেখলাম খুবই লাজুক তারা।

প্রায় ঘণ্টা ছুয়েক ধরে গ্রাম ঘুরে আবার ফিরে এলাম সেই মাঠে। সেখান থেকে জিওলজিক্যাল সার্ভের ক্যাম্পে। এখানেই সন্ধান পাওয়া গেছে নিকেল, কোবল্ট, ক্রোমিয়াম, লোহা এবং প্ল্যাটিনাম।

ডঃ শ্রীবাস্তবকে জিজ্ঞেস করলাম কেমন বুঝছেন? লাভজনক কিছু হবে?

উই আর কোয়ায়েট হোপফুল। বললেন ডঃ শ্রীবাস্তব। আমরা

এখানে ড্রিলিং চালিয়েছি। ড্রিলিং চলছে এখনও। বেশ বড় রকমের আলট্রামেফিক রকের এখানে আমরা সন্ধান পেয়েছি। একটা তো প্রায় এক কিলোমিটার লম্বা, চওড়ায় তিনশো মিটার এবং পুরু পাঁচ থেকে পনের মিটারের মত। এই ব্লকটির ওজন হবে প্রায় এক কোটি টন। ইতিমধ্যে এর একটি অংশের রাসায়নিক পরীক্ষাও করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে রয়েছে ৬৫·২৫ শতাংশ ফেরিক অকসাইড ৪·২৫ শতাংশ ক্রোমিক অকসাইড ০·৬৩ শতাংশ নিকেল। একটি নমুনার মধ্যে দুই শতাংশ নিকেলও পাওয়া গেছে।

শম্ভুবাবু বললেন, দারুণ দুর্গম জায়গা। পথঘাটের ব্যবস্থা নেই। জিওলজিস্টদের কষ্ট হচ্ছে ঠিকই তবে সুফলও আমরা পেয়েছি, মিঃ কর। আমাদের ধারণা, আমরা দস্তা এবং টিনও পাবো এদিকে। নিকেল, কোবল্ট ক্রোমিয়াম, টিন এসব অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু। এদের উদ্ধার করতে পারলে নাগাল্যাণ্ডের প্রসপেকটের কথা একবার ভাবুন দেখি।

শম্ভু সেন কি স্বপ্ন দেখেন!

নিশ্চয় দেখেন। যে স্বপ্ন না দেখলে বর্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না—সেই স্বপ্নই দেখেন তিনি। নইলে এত জোরের সঙ্গে বলেন কী করে তিনি, এখানকার ভূতাত্ত্বিক সম্পদ নাগাল্যাণ্ডের পক্ষে এত সম্ভাবনাপূর্ণ? সেই সম্পদকে হাতের মুঠোয় পুরতে হবে। তার জন্যে চাই জিওলজিস্টদের চেষ্টা, চাই স্থানীয় নাগা মানুষদের সাহায্য। আছে অজ্ঞতা। আছে ভ্রান্তি। সে সব দূর করার জন্যেই তো তিনি নিজে এসেছেন, এই পরিণত বয়েসেও এই পুকপুরে। নিজের চোখে দেখতে চান তাঁর স্বপ্ন কতখানি বাস্তব। চান, এখানকার মানুষও এই যজ্ঞে হাত লাগাক। এর জন্যেই তো,

তিনি ছুটে এসেছেন এতদূর—এই নাগাপল্লীতে। হাত মেলাতে নাগাদের সঙ্গে। সরকারী চাকুরেদের মধ্যে এত বাস্তব, এত আন্তরিক সংগঠন ক্ষমতা সত্যিই বিরল।

মিঃ কর ? হঠাৎ কানের কাছে ফিস্ ফিস্ শব্দ। চাইতেই দেখি সেই তরুণ ভূতাত্ত্বিক।

কি ব্যাপার ?

আই টোল্ড ইউ, ইউ ডিড নট বিলিভ মি। লুক, হি হ্যাজ কাম।

দেখি, আমার পাশে লাল শালে ঢাকা দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে গাঁওবুড়া। আমার দিকে করুণ চোখে চেয়ে।

অর্থাৎ সেই যে সকালে বলেছিলেন সুযোগের কথা, সেই সুযোগ এখন হাজির।

আমরা তো ছয় বস্তা নুন এনেছিলাম। আজকের নাচের আসরে ছুটি গ্রাম যোগ দিয়েছিল। এই জাংগর আর ওর নিজের গ্রাম। গিফট্ হিসেবে তিন বস্তা নুন জাংগরের গাঁওবুড়াকে আমরা দিয়ে দিয়েছি। এখন ওর গ্রাম এখান থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে। ও বলছে, এতটা পথ তিন বস্তা নুন বয়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত। তোমরা গিফট্ দিয়েছো। অতএব বস্তাগুলি সেই গ্রামে বয়ে দাও। আই টোল্ড ইউ দেন, দে আর টু মাচ ডিমাণ্ডিং। হরিবল্। উই হ্যাভ গিভন্ দেম গিফট্। অ্যাণ্ড নাও দে আর আসকিং আস টু ক্যারি ইট ফর দেম। সি দ্য হসপিট্যালিটি।

বুঝলাম, ছেলেটি ঝামেলা একটু কম পছন্দ করে। কিন্তু এটাও তো ঠিক, তিন বস্তা নুন নিয়ে এই পাহাড়ে পথে কুড়ি কিলোমিটার পথ চলাও তো কম কথা নয়। ওদিকে গাঁওবুড়া যে ভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে, ভেবেছে আমি বুঝি একটা কেউকেটা।

যাক ব্যবস্থা একটা করা গেল। গাড়িতে জায়গা ছিল কম। তবু চালকরা রাজি হলেন। গ্রামটিও আমাদের পথেই পড়বে। কোন অসুবিধে নেই।

আর যায় কোথায়। কয়েকজন নাগা মিলে তিন বস্তা নুন তুলল জীপে। তারপর সামনে থেকে পেছন থেকে, মায় চালকের গায়ের ওপর দিয়ে যত জন পারলো জীপ দখল করে বসলো। নাও, এখন ঠ্যালা সামলাও। বলবেন কাকে? একেবারে বাচ্চার মত চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে।

সি দেয়ার ডিমাণ্ড। তরুণ ভূতাত্ত্বিকের মন্তব্য।

আমি চুপ।

কিফরেতে আমরা ফিরলাম সেদিন সন্ধের মধ্যেই। রাতে মিঃ আয়াবের বাড়ি ডিনার। মিসেস আয়ার অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির মহিলা। খুব যত্ন করে খাওয়ালেন আমাদের।

খাওয়াব পর শম্ভুবাবুকে বললাম, আপনি ববং ইনসপেকশন বাংলোয় গিয়ে বিশ্রাম করুন, আমি আর সমরজিৎ চক্রবর্তী মিঃ লঙ্গকুমারের বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি।

যাও। তবে বেশি রাত করো না। শীত পড়ছে। চোখ মটকালেন শম্ভুদা। এতক্ষণে তিনি আমার দাদা হয়ে গেছেন।

মিঃ লঙ্গকুমারেরই সঙ্গেই আগে কথা বলে নিয়েছিলাম। বলে-ছিলাম, নাগা গ্রাম দেখেছি। শহরে নাগা শ্রমিকরা কেমন থাকেন, দেখাতে হবে।

মিঃ লঙ্গকুমারের বাড়িতে যেতেই, দেখলাম তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। বললেন, রাত বেশি হয়ে গেল। এখন প্রায় সাড়ে আট। চলুন, দেখি ওরা জেগে আছে কী না। এখানে সবাই সকাল

সকাল ঘুমিয়ে পড়ে।

বস্তি এলাকায় গেলাম আমরা। দেখলাম, সত্যিই বেশিরভাগ বাড়ি নিশ্চুপ। কিছুটা ঘোরাঘুরির পর একটি বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল। ভেতর থেকে কথাবার্তার শব্দ আসছে।

মিঃ লঙ্কুমার দরজায় করঘাত করতেই দরজা খুলে গেল। তিনি পরিচয় দিলেন আমাদের। গৃহকর্তা মৃদু হেসে আমাদের অভ্যর্থনা করল।

মজুরের বাড়ি। গ্রামের বাড়িরই শহর সংস্করণ। জন চারেক লোক বসে গল্প করছে। তাদের সামনে জ্বলছে টিমটিমে একটি বাল্‌ব। গৃহকর্ত্রী আমাদের দেখে পাশের ঘরে গা ঢাকা দিলো।

আমরা ঘন্টাখানেক কাটালাম সেখানে। গল্প হলো তাদের সামাজিক ব্যাপার স্যাপার নিয়ে। কোন সংকোচ নেই। ওরা বলে গেলো, বিয়ের ব্যাপারে নাগারা কড়া। ছেলেমেয়েরা মেলামেশা করো আপত্তি নেই। কিন্তু কোন বে-আইনী কিছু চলবে না। কুমারী মেয়ের ছেলেমেয়ে হওয়াটাকে ওরা সমর্থন করে না। বিয়ের বয়েস হলে বাবা মা অথবা ঘটক বিয়ের ব্যাপারে যোগাযোগ করে। কোন পরিবারে সন্তান জন্মালে মা সাত দিন অপরের বাড়িতে খেতে পারবে না। মৃত্যুর পর শুয়োর বা মিথুনের মাংস অতিথিদের খাওয়ায়। এমন নানান কথা। তবে অনেকেই খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী। তারা চার্চে যায়। তারা লেখা পড়া করে। তারা অনেক বেশি আলোকপ্রাপ্ত। বেশ ভাল লাগল ওদের সরল ব্যবহার। নিজেদের বৈষয়িক উন্নতির ব্যাপারে ওরা এখন ভীষণ সজাগ।

বাংলোয় ফিরতে প্রায় দশটা বেজে গেল। মিঃ লঙ্কুমারকে বললাম, বিদায়। আবার হয়ত দেখা হবে।

আবার যাত্রা। ফেরার পালা। সেই কোহিমায়।

কোহিমার 'সেবক' গেস্ট হাউসে পৌঁছলাম সন্ধে সাতটা নাগাদ। পৌঁছতেই দেখি, মিঃ বরুয়া আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

মিঃ সেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একবার আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে চান। আটটার সময় কি একবার তাঁর বাসায় যাওয়া আপনাদের সম্ভব হবে? বললেন তিনি।

শম্ভুদা বললেন, কোন অসুবিধে নেই। আমি এবং মিঃ কর যাবো। আমরা একটু ফ্রেশ হয়ে নিই।

গিয়েছিলাম নাগাল্যাণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ ভিজলের বাড়ি। গিয়ে দেখি, সেখানে মিঃ লেংগা ল্যাঙ্গও উপস্থিত রয়েছেন।

বেশির ভাগ কথা হলো নাগাল্যাণ্ডের ভূতাত্ত্বিক সম্পদের ওপর। ওই একই কথা, যা মিঃ ল্যাঙ্গ এর আগে বলেছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা চান তাৎক্ষণিক একটা কিছু। তাঁরা এই প্রদেশের ভূতাত্ত্বিক সম্পদ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য চান। নাগাল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে তাঁরা ভীষণ উদ্বিগ্ন। তাঁরা এ ব্যাপারে দেরি করতে নারাজ।

কেমন লাগলো আপনার নাগাল্যাণ্ড? মিঃ ভিজল প্রশ্ন করলেন আমাকে।

যদি বলেন মানুষ কেমন? আমি বলবো, তাদের দারুণ ভাল লেগেছে আমার। যদি বলেন, নাগাল্যাণ্ড কেমন লাগলো? আমি বলবো, একেবারে ভার্জিন ল্যাণ্ড। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে যার সম্ভাবনা অনেক। আমার উত্তর।

মৃদু হাসলেন মিঃ ভিজল। ছোটখাটো মানুষ। কিন্তু দেখলেই

বোঝা যায়, তাঁর এক্স-রে চোখে সব কিছুই ধরা পড়ে।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি, শুনলাম, পুকপুরে আপনি বলেছেন, নাগারা যেমন আছে, তেমনই থাক।

সর্বনেশে কাণ্ড। সে আবার কী কথা। এ কথা আবার আমি কখন বললাম ? বুঝেছি। আমার বক্তৃতার ব্যাপারে ইঙ্গিত করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। সে খবর তাঁর কাছে এসে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝলাম গোলমালটা কোথায়। ইনফরমাল মিটিং। অতএব সংকোচের কারণ নেই।

বললাম, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি ক্ষমা করেন, তবে বলবো, মনে হচ্ছে, এ কম্যুনিকেশনের জট। যা প্রায়ই ঘটে থাকে আজকাল। মিঃ ভিজল, আমি বিশ্বাস করি, মানুষের প্রধানতম আইডেনটিটি তার কালচারে। খুব কম সময়ের জন্যে হলেও, নাগাল্যাণ্ডে এসে আমার মনে হয়েছে, এই প্রদেশের মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতির ভিতটি খুবই শক্ত। বিদেশের মেকী কালচার তাকে কলুষিত করতে পারেনি। যা ঘটেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাই বলেছিলাম, কালচারের দিক দিয়ে তাঁরা যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন। নাগারা নিজেদের সংস্কৃতিকে সংরক্ষিত করুন। এ কথা আমি বলিনি, যে বুভুক্ষু বুভুক্ষুই থাক, যার মাথার ওপর ছাদ নেই, সে উন্মুক্ত আকাশের নিচেই বাস করুক।

ইউ আর সিরিয়াস। আমার কথায় হেসে উঠলেন মিঃ ভিজল।

এর পর প্রাণ খুলে কথা হলো মিঃ ভিজল এবং মিঃ ল্যাঙ্গের সঙ্গে। বেশিরভাগ কথাই নাগাল্যাণ্ডের উন্নয়নের প্রসঙ্গে। শম্ভুদা এই ফাঁকে এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক সম্পদের কথা বিশদ বুঝিয়ে বললেন।

আমি মন্তব্য করলাম, সবই ঠিক। সম্পদ না হলে জন-কল্যাণ

হয় না, জানি। তবে একটা কথা বুঝি, তার চেয়েও বেশি যা দরকার সেটা হৃদয়। মানুষের মঙ্গল করার ব্যাপারে মগজের (রাজনীতি) চেয়ে হৃদয়ের ক্ষমতা অনেক বেশি, মিঃ ভিজল। এ ব্যাপারে সারা দেশই এখন প্রচণ্ড এক হতাশায় ভুগছে। আর জানেন তো, হতাশ মানুষের পক্ষে কোন কাজ করা শক্ত।

আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড হোয়াট ইউ মিন। মিঃ ভিজল গম্ভীর হলেন। অন্যমনস্কও কি নয় ?

বিদায় নিলাম আমরা।

পরদিন ঘরে ফেরার পালা। কোহিমা থেকে ডিমাপুর বিমান বন্দর। আমার লোকাল গার্জেন ডঃ সমরজিৎ চক্রবর্তীকে বিদায় দিলাম। বললাম, বেশ কয়েকদিন এক সঙ্গে ছিলাম। এবার একা আপনাকে শিলং ফিরতে হবে।

আমরা জিওলজিস্টরা তো একাই থাকি। বললেন সমরজিৎ চক্রবর্তী।

ভারাক্রান্ত হলো মন।

পেছনে পড়ে রইল পাথরের দেশ। নাগাল্যাণ্ড। মনে হলো, সেখানকার মানুষও কি পাথর নয় ? পাথরের মত কঠিন, সহনশীল এবং অনমনীয় ভাগ্য যাদের এখনও একমাত্র অবলম্বন ?